..en strictly in accordance with the Approved Syllabus of the Board of condary Education, West Bengal, as a Text-Book for classes IX, X ' XI of Higher Secondary & Multipurpose Schools of West Bengal.

Vide Circular No. HS./1/58, dated 7th March, 1958.

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

(কৃষি রসায়ন)

প্রথম ভাগ

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য)

সিরহাট কলেজের ভূতপূর্ব অবৈতনিক অধ্যাপক, ভারতীয় কৃষি মহাবিদ্যালযের ভূতপূর্ব গবেষণা-সহকারী, 'মাটি ও সার' প্রণেতা

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন বিশ্বাস, বি. এস-সি., এম. এ. (ক্যাল.), এম. এস. (আমেরিকা)

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-১২

মূল্য : টাকা ৫·৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
কো-অপারেটিভ প্রেস
১, ছিদাম্ মুদি লেন
কলিকাতা-৬

Syllabus of Agricultural Chemistry & Biology
for
Higher Secondary Examination
Agricultural Chemistry

Class IX

Nitrogen—Occurance, importance in nature, preparation, properties. Compounds of nitrogen—ammonia; sulphate, chlorid and nitrate of ammonia; their preparation, properties and uses.

Manufacture of ammonium sulphate; Sindri Fertilizer Factory.

Class X

Nitrogen in soil—average nitrogen content of Indian soils. Gain of nitrogen in soil—rain water—fixation by azotobacter, algae and legumes, manures and fertilizers. Loss of nitrogen—leaching, bio-chemical changes, removal by crops. Nitrogen cycle. Dicomposition of the added manure—ammonification—nitrification—denitrification. Crop yield by manures. Important nitrogeneous, phosphetic and Potassic Fertilizers and manures—their composition—method of application and effect on crop yield. Utilisation of waste products as manures, compost, sludge, etc. Results of fertilizer experiments in West Bengal (Data to be obtained from the Director of Agriculture).

Class XI

Soil reaction, elementary knowledge of PH. Acid and saline soils, their formation and occurrence in West Bengal. Harmful effect of saline and alkali soils on crop, methods of reclamation—Sonarpur and Arapanch Scheme.

Agricultural Biology

Class IX

1. The life history of a pea and a maize plant from the germination of seeds to the formation of seeds.

2. Morphology of vegetative plant organs ; stem, root and leaf, their modification, function and significance (with perticular emphasis on plants of Agricultural importance).

3. Morphology of flowers, pollination, fertilization, formation of fruits and seeds, dissemination, germination of seeds.

4. Structure of a plant cell.

5. Study of external characters, habits and life histroy of earthworm, cockroach, mosquito and fish.

Class X

1. Water, its importance in plant life, absorption of water and transpiration.

2. Carbon assimilation and respiration.

3. Elementary idea of physiology of growth, elements necessary for plant growth.

4. Study of Botanical characters of a few common field and garden crops belonging to Gramineae (paddy, wheat), Cruciferae (mustard, Radish), Leguminoseae, (gram, arhar), Cucurbitaceae (gourd, cucumber), and Malvaceae (cotton).

5. Study of the external characters, habit, and life history of insects with particular reference to a few comnon ones [housefly, silkworm/butterfly, honey bee/lac insects, paddy stem borer (*schnoebius incertellus*), jute semilooper (*anomis subulifera*) and termite]

Class XI

1. Elementary idea of the structure of nucleus and Chromosomes ; cell-division.

2. Elementary facts of evolution, of heridity and Mendel's Law.

3. Important pests and diseases of paddy, jute, sugarcane and potato—their prevention and control.

Diseases

Paddy—Brownspot (*Helminthosporium oryzae*)
Jute—Stem rot—(*Macrophomina phaseoli*)
Sugarcane—Red rot (*Colletotrichum falcatum*)
Potato—Early Blight (*Alternaria solani*)
—Late Blight (*Phytophthora infestans*)

Pests

Paddy—Stem borer (*Schnaebius incertellus*)
—Hispa (*Hispa armigera*)
Jute—Semilooper (*Anomis sabulifera*)
—Hairy Caterpillar (*Diacrisia obliqua*)
Sugarcane—leaf hopper (*Pyrilla perpusilla*)
—Stem borer (*Argyria tumidicostalis*)
Potato—Cut worm (*Agrotis ypsilon*)
Antilocust and antirat campaigns

4. Van mahotsav (*tree plantation*) and its significance.

মুখবন্ধ

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবার প্রায় তিন মাস পরে প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলো। বইখানি সর্বাঙ্গীণ সুন্দররূপে প্রকাশ করবার জন্যই এই বিলম্ব। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও হযত মাঝে মাঝে কিছু কিছু ত্রুটি রযে গিযেছে। পুস্তকের দ্বিতীয সংস্করণে এই ত্রুটিগুলির সংশোধন করার ইচ্ছা রইলো।

মুখ্যতঃ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও বইখানি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ চাষীদের আংশিক চাহিদা মিটাতে পারবে এই আমার বিশ্বাস। জৈব রসাযন অংশে জীবতত্ত্বের দুরূহ বিষয আলোচনা করতে গিযে অনেক নূতন শব্দেব অবতারণা করতে হযেছে ফলে অনেক জাযগায় ভাষা তার সাবলীল গতি হারিযে ফেলেছে।

যাদের উদ্দেশ্যে বইখানি লিখিত হয়েছে তাদের উপকারে আসলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আর যদি সহৃদয় শিক্ষক ও সুধীজন বইখানির ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে আমাকে দযা করে জানান তবে বিশেষ বাধিত হবো।

পানিতর
১লা জুলাই, ১৯৬০

গ্রন্থকার

বিষয় পরিচিতি

(কৃষি রসায়ন)

প্রথম খণ্ড—নবম শ্রেণী

দ্বিতীয় খণ্ড—দশম শ্রেণী

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ শ্রেণী

(জৈব রসায়ন)

প্রথম খণ্ড—নবম শ্রেণী

তৃতীয় খণ্ড—একাদশ শ্রেণী

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[কৃষি রসায়ন]

প্রথম ভাগ

প্রথম খণ্ড

(নবম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

বায়ু (Atmosphere)

বায়ুর অবস্থান ও উপাদান—পৃথিবীর সর্বত্র বায়ু ছড়িয়ে আছে। সাধাবণভাবে আমবা বুঝতে পারি না যে আমাদের চারিদিকে কি পরিমাণ বায়ু ছড়িয়ে আছে, কিন্তু যখন ঝড় বয় তখন আমরা বেশ বুঝতে পারি। পৃথিবীর উপরিভাগে মাটির উপর থেকে শূন্যে যতদূর আমরা কল্পনা করতে পারি সমুদয় স্থানই ছড়িয়ে বযেছে বায়ু। সাধারণভাবে বায়ুর অবস্থান আমরা না বুঝতে পারলেও যখন আমরা দৌড়াই বা জোরে চলি তখন বেশ বুঝতে পারি সামনের থেকে বায়ু আমাদের বাধা দিচ্ছে।

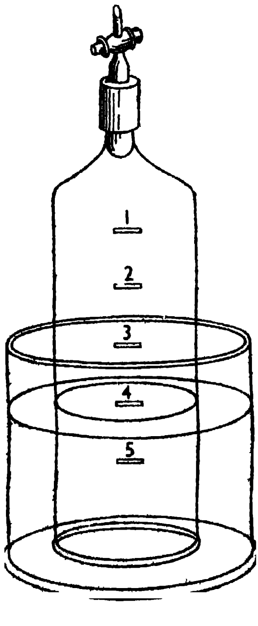
বায়ু না হলে মানুস বাঁচে না। সেই কাবণে বায়ুব অপর নাম জীবন। আমাদের চারিদিকে যে বায়ু ঘিবে আছে সে বায়ু কযেকটি বাষ্পের সমন্বয মাত্র। এর মধ্যে সব থেকে বেশী পবিমাণে আছে নাইট্রোজেন, প্রায ৫ ভাগের ৪ ভাগ। বাকি একভাগ আছে অক্সিজেন। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুর প্রধান দুইটি উপাদান। এ ভিন্ন আবও কযেকটি উপাদান বাষ্পাকারে অবস্থিত থাকে কিন্তু তাদের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম।

যে কোন জাযগার বায়ু হোক না কেন, জলের উপরের বায়ু বা বনের উপরের বায়ু বা অন্য যে কোন জাযগার বায়ুতে N_2 প্রায সব সময়ই সম-পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা ৭৬ ভাগ N_2 থাকে। এ ভিন্ন পৃথিবীর মাটিতেও কিছু পরিমাণ N_2 পাওযা যায। অবশ্য মাটিতে N_2 বাষ্পাকারে থাকে না। অন্য কোন রাসাযনিক পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক মিশ্র পদার্থ আকারে মাটির মধ্যে থাকে। নানাপ্রকার বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা সর্বদা মাটির মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এ ভিন্ন গাছপালা ও পশুপক্ষীর দেহেও N_2 পাওয়া যায়। একমাত্র বায়ু ব্যতিরেকে অন্য কোথাও N_2 মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ অন্য কোন

পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে যৌগিক মিশ্র পদার্থ মাধ্যম ভিন্ন দেখতে পাওয়া যায় না। জীবদেহে N_2 মিশ্র প্রোটিন আকারে থাকে।

আয়তন হিসাবে বায়ুতে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত

নাইট্রোজেন—	৭৭.১৬ (ভাগ)
অক্সিজেন—	২০,৬০ ”
কার্বন ডায়-অক্সাইড—	০.০৪ ”
জলকণা—	১.৪০ ”
নিযণ, আরগণ ইত্যাদি, নিষ্ক্রিয় বাষ্প—	০.৮০ ”
	১০০.০০ (ভাগ)



বায়ুতে নাইট্রোজেন-এর অবস্থিতির প্রমাণ—একটি কানা-উঁচু গোলাকার পাত্রের আধা-আধি পরিমাণ জলে ভর্তি করা হলো। এই পাত্রের জলের উপর ছোট একটি চীনামাটির পাত্রে (বেসিনে) ফস-ফরাস দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। একটি ঢাকনি বা বেলজার দিয়ে জলের উপরের ছোট পাত্রটি ঢাকা দেওয়া গেল। লক্ষ্য করা হলো এই অবস্থায় পাত্রের জল কোথায় এসে দাঁড়ায় এবং কাচধারে সেই জায়গাটি একটি দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হলো। তারপর ঢাকনি বা বেলজার তুলে নিয়ে ফসফরাসটুকুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো এবং পুনরায় বেলজার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। প্রথমে দেখা যাবে জলের রেখা নীচে

নেমে যাচ্ছে, কিন্তু একটু পরেই দেখা যাবে ঐ স্থানের জল ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে। কিছুদূর উঠবার পর জল আর উঠবে না। এখানে একটি দাগ কেটে ফিতা দিয়ে যদি মাপা যায় তবে দেখা যাবে যে বেলজারের প্রায় $\frac{1}{5}$ অংশ জল উপরে উঠেছে। এর কারণ কি? কারণ চীনামাটির বাটিতে যে ফসফরাস ছিল সেটা দিয়াশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেলজারের ভিতরকার বায়ু উত্তপ্ত হয়ে সম্প্রসারিত হয়ে ছিল, ফলে জলের রেখা নেমে এসেছিল কিন্তু ফসফরাস উজ্জ্বলভাবে পুড়তে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে জলের লেভেল উপরে উঠতে থাকে। কারণ বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে সেই অক্সিজেন ফসফরাসের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে P_2O_5 সৃষ্টি করে এবং ভিতরকার শূন্য স্থান ধীরে ধীরে জল অধিকার করে নেয়।

$$4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$

বাতাসে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের পরীক্ষা

অক্সিজেন— (১) যদি একটি জার NO বাষ্পে ভর্তি করে বাতাসে ধরা যায় তবে লাল ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। কারণ অক্সিজেনের সঙ্গে NO বাষ্প মিশ্রিত হয়েছে।

অক্সিজেন বাতাসের মধ্যে থাকার ফলে প্রাণিগণের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। প্রাণীর শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় অক্সিডেশান বা জারক প্রণালী কাজ করার জন্য। দহন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। শরীরের মধ্যকার রক্তকণিকা বিশুদ্ধকরণের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। প্রাণিকুল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেটার সমস্ত প্রয়োজন শরীরের মধ্যকার বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার জন্য।

নাইট্রোজেন—কোন বদ্ধ বেলজারের মধ্যে যদি ফসফরাস পোড়ান যায় তবে দেখা যাবে যে অক্সিজেন ফসফরাসের সঙ্গে ক্রিয়া করেছে

এবং নাইট্রোজেন পড়ে আছে। যদি বাতাসে কেবলমাত্র অক্সিজেন থাকতো তবে প্রাণিদের নিশ্বাসের সঙ্গে সব অক্সিজেন দূরীভূত হতো। নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিশে থাকার ফলে সেরূপ আর হতে পারে না।

কার্বন ডায়-অক্সাইড বাষ্প—যদি পরিষ্কার চূণের জলের মধ্য দিয়ে বাতাস নির্গত করা যায় তবে দেখা যায় যে চূণের জল ঘোলাটে হয়ে গেছে।

$$Ca\,(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O.$$

যখন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তখন সমস্ত ক্রিয়াতে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তাপ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু বাতাসে এরা যে যার সত্তা নিয়ে অবস্থান করে, কোন প্রকার উত্তাপের তারতম্য বা আয়তনে কম বেশী হয় না।

(১) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ সব সময়ই দুই বা ততোধিক রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত। এরা যখন তৈরী হয় তখন সব সময়ই একটা অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু বাতাসে N_2 বা O_2 নিজের ওজনের পরিমাণে নির্ভর করে। (২) বাতাসে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন কোন মতেই তাদের পরমাণু ওজনের বেশী থাকতে পারে না। (৩) রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ থেকে বিভিন্ন উপাদানগুলি সহজে পৃথক করা যায় না কিন্তু বাতাসে অতি সহজে পৃথক করা যায়। এসমস্ত কারণগুলি বিবেচনা করলে বাতাসকে রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ বলা যায় না।

নাইট্রোজেন

পরমাণু ওজন—১৪, সাঙ্কেতিক চিহ্ন—N.

নাইট্রোজেন পাওয়া যায় দুই রকমে।

(১) বাতাস থেকে। সেটা আমরা বাতাস অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

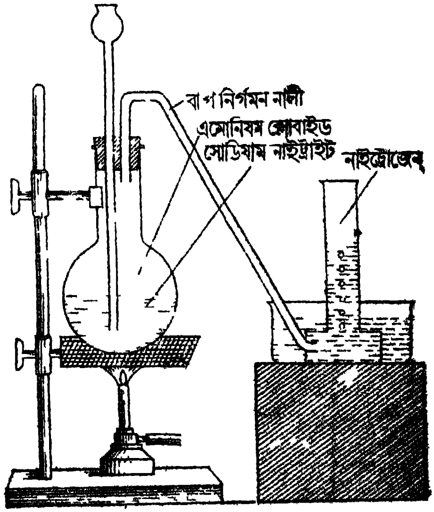
(২) নাইট্রোজেন মিশ্রিত যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ থেকে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে N_2 পাওয়া যায় এমোনিয়া থেকে। ঘন এমোনিয়াকে ক্লোরিণ বা ব্রোমিন সহযোগে একটি ফ্লাস্কের মধ্যে রেখে উত্তপ্ত কবলে N_2 পাওয়া যায়। কিন্তু যদি এমোনিযাব উপর ক্লোরিণ মিশান যায় তবে একটি উদ্গীরণ তৈরী হবে।

$$2NH_3 + 3Cl_2 = N_2 + 6HCl$$
$$6NH_3 + 6HCl = 6NH_4Cl.$$

যোগ কবিযা $8NH_3 + 6HCl + 3Cl_2 = N_2 + 6HCl + 6NH_4Cl$

প্রস্তুত প্রণালী—ঘন হাইড্রোক্লোবিক এসিড ও ম্যাঙ্গানীজ ডায়-অক্সাইড একটি ফ্লাস্কে লওযা গেল। দেখা যাবে যে, এখানে ক্লোবিণ বাষ্প তৈরী হচ্ছে। এবাব একটা জলভর্তি উলফেব বোতলেব মধ্য দিযে এই বাষ্পটি নিযে যাওযা হল। এই বিশুদ্ধ ক্লোবিণ ধীবে ধীবে এমোনিযাব মধ্য দিযে নির্গত কবা হলে N_2 বাষ্প তৈবী হবে। তাবপর কতকগুলি জলপূর্ণ জাব উপুড কবে তাব মধ্যে থেকে জল সবিযে নাইট্রোজেন জমা কবা হয।



(ক) পবীক্ষাগাবে—সোডিযাম বা পটাসিযাম নাইট্রাইট ও এমোনিয়াম ক্লোবাইড একটি থিসিল ফানেলযুক্ত ফ্লাস্কে নেওয়া গেল। থিসিল ফানেলের সরু নলের আগা যেন জলের নীচে থাকে। এইবার ফ্লাস্কটি বার্ণারের উপর

মশাইয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা হতে লাগলো। যতক্ষণ লাল বাষ্প বেরিয়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে উত্তাপ সরিয়ে নিতে হবে। এইবার এই বাষ্প একটা তামার টুকরাপূর্ণ নলের মধ্য দিয়ে চালান হলো, ফলে NO বাষ্প থেকে N_2 উদ্গীর্ণ হবে। এই নাইট্রোজেন বাষ্প অনেকটা পরিমাণে বিশুদ্ধ।

$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$

$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O.$$

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)—নাইট্রোজেন একটি গন্ধহীন, বর্ণহীন, আস্বাদ-বিহীন বাষ্প। খুব অল্প পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশতে পারে। ওজনে বায়ু থেকে একটু হাল্কা। এই বাষ্প বিষাক্ত ও ইহা প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে।

রাসায়নিক—এই বাষ্প অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে সোজাসুজি মিশতে পারে না। সে কারণে অনেক সময় একে অকর্মক আখ্যা দেওয়া হয়। নিজে জলে না বা অন্যকে জলতে সাহায্য করে না। ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে মিশে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইডের সৃষ্টি হয়। যদি নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্যুৎ সহযোগে মেশানো হয় তবে NO বাষ্প তৈরী করে। এই বাষ্পে যদি অক্সিজেন বাষ্প বেশী থাকে তবে NO_2 তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন উচ্চ-চাপের প্রভাবে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে তখন NH_3 (এমোনিয়া) তৈরী করে। নাইট্রোজেন বাষ্প খুব গরম হয়ে বোরণ, সিলিকণ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির সহিত মিশে নাইট্রাইডের সৃষ্টি করে।

$$3Ca + N_2 = Ca_3N_2$$

$$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$$

অবস্থিতির পরীক্ষা—(১) যদি নাইট্রোজেন বাষ্পপূর্ণ কোন পাত্রে একটি জলন্ত বাতি নামিয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে বাতিটি নিভে যাচ্ছে। (২) যদি পরিষ্কার চুণের জলের মধ্য দিয়ে এটাকে চালানো যায় তবে কোন

ময়লা জমবে না বা তলানি পড়বে না। (৩) ভীষণ উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম ও তাম্র যদি এই বাষ্পের সংস্পর্শে আসে তবে নাইট্রাইট তৈরী করবে।

প্রযোজন—নাইট্রোজেনের প্রযোজন যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়ে। ট্রাইনাইট্রো-টলুয়িন ও নাইট্রোগ্লিসারিণ নাইট্রোজেন সহযোগে তৈরী। এদেব দিয়ে বিস্ফোবক তৈবী হয। আমাদেব ঘবে যে বিজলী বাতি জ্বলে অনেক সময় এই বাল্বেব মধ্যে N_2 বাষ্প ব্যবহৃত হয। এমোনিযা তৈরী কবতে এব বিশেষ প্রযোজন আছে। আর এই এমোনিযা থেকে এমোনিযাম সালফেট, তবল এমোনিযা প্রভৃতি সাব তৈবী হয। নাইট্রোজেন দিযে প্রোটিন তৈবী হয আব এই প্রোটিন প্রাণী মাত্রেবই প্রধান খাদ্য।

যখন এই নিষ্ক্রিয বাষ্পেব মধ্য দিযে খুব জোরালো বিদ্যুৎশিখা চালান যায তখন এব মধ্যে একটু পবিবর্তন হয ও নাইট্রোজেন বাষ্প সকর্মক হযে পড়ে।

আজকাল খুব বেশী পরিমাণে N_2 দবকাব হলে বাতাস থেকে N_2 সংগ্রহ কবা হয।

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রিত যৌগিক রাসায়নিক পদার্থসমূহ

(১)

(ক) নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)

(খ) নাইট্রিক অক্সাইড (NO)

(গ) নাইট্রোজেন ট্রাযাক্সাইড (N_2O_3)

(ঘ) নাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইড (NO_2)

(ঙ) নাইট্রোজেন পেণ্টাক্সাইড(N_2O_5)

(২)

(ক) নাইট্রিক এসিড

(খ) নাইট্রাস এসিড

(ঙ) এমোনিয়া ও তার যৌগিক মিশ্র পদার্থগুলি।

অক্সাইড ও ভ্যালেন্সি

(Oxide & Valency)

অক্সাইড—অক্সিজেন যখন সোজাসুজি উত্তাপ সহকারে অম্লজান বা অক্সিজেনের সহযোগে কিংবা বিনা উত্তাপে অম্লজান বা অক্সিজেনের সঙ্গে মেশে তখন তাকে বলা হয় অক্সাইড। যেমন—নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন ডায়-অক্সাইড ইত্যাদি।

কোন ধাতব বা বাষ্পীয় পদার্থের সহিত অক্সিজেন ক্রিয়া করে যে সমস্ত মিশ্র পদার্থ সৃষ্টি করে সেই পদ্ধতিকে বলে অক্সিডেশান বা জারক প্রণালী। কোন মৌলিক ধাতুর সহিত ক্রিয়া করে যখন অক্সাইড তৈরী হয় তাকেও অক্সিডেশান পদ্ধতি বলা যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় অক্সিডেশান পদ্ধতিতে অক্সিজেনের বৃদ্ধি নেই কিন্তু অন্য কোন ধনাত্মক পদার্থ বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা কোন মিশ্র যৌগিক পদার্থ থেকে ধনাত্মক পদার্থ হ্রাস পেয়েছে তা হলে তাকেও অক্সিডেশান ও বিডাকশান পদ্ধতি বলা যায়।

$$2FeCl_3 + Cl_2 = Fe_2Cl_6$$

যে রাসায়নিক পদ্ধতিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে ও ধাতব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে তাকে বলা হয় রিডাকশান পদ্ধতি বা ক্ষরণ।

(১) অক্সিজেনের হ্রাস

(২) হাইড্রোজেন বৃদ্ধি

(৩) ধাতব পদার্থের বৃদ্ধি $FeCl_3 = Fe^{++} + Cl + Cl^-$

$$FeCl_3 = Fe^{+++} + Cl + Cl^- + Cl$$

ভ্যালেন্সি বা একে অন্যের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা—পৃথিবীর যে দিকেই চাই সে দিকেই দেখা যায় মিশ্র পদার্থের সমাবেশ। ধাতব পদার্থ একাকী কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যে সমস্ত ধাতব পদার্থ আমরা খনি থেকে পাই তারা নানাপ্রকার পদার্থের সংমিশ্রণে সেখানে থাকে, সেখান থেকে কোন

আকরিক পদার্থ উপরে নিয়ে এসে তাই থেকে নানা পরিশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিশ্রুত করলে তবে বিশুদ্ধ ধাতব পদার্থ পাওয়া যাবে, পৃথিবীতে কোন রাসায়নিক পদার্থ মৌলিক আকারে থাকে না বা পাওয়া যায় না। মিশ্র অবস্থা থেকে মৌলিক পদার্থকে বার করতে হয়।

একে অন্যের সঙ্গে মিশে থাকে। কেউ একা থাকতে চায় না। তা বাদে প্রাকৃতিক উত্তাপও নানা কারণে বস্তু-জগতে অনবরত পরিবর্তন সাধিত করছে। সাধারণ চোখ দিয়ে এই পরিবর্তন বোঝা যায় না, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে সমুদয় ধাতব ও বাষ্পীয় পদার্থ একে অন্যের সঙ্গে মিশছে তাদের মিশবার ক্ষমতা অনুযায়ী আবার ভাঙ্গছে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

এই যে মিশ্রণ, বস্তু-জগতে এরাও একটা নিয়ম মেনে চলে। কারণ পৃথিবীটা নিয়মের রাজত্ব—বে-নিয়মের ঠাঁই নেই। দেখা যাক এই মিশান জিনিষটা কি? এই যে একে অন্যের সহিত মিশবার ক্ষমতা একে বলা হয় ভ্যালেন্সি আর হাইড্রোজেনকে সর্বনিম্ন ভ্যালেন্সি ধরে নিয়ে তার সঙ্গে অন্যেরা কিভাবে মেশে তার উপর তাদের ভ্যালেন্সি ঠিক করা হয়।

যে সমস্ত মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ একটি মাত্র হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশতে পারে তাদের মনোভ্যালেণ্ট বলা হয়। যেমন—ব্রোমিন, ক্লোরিন, সোডিয়াম। সোডিয়ামের সঙ্গে একটি মাত্র ক্লোরিন পরমাণু ক্রিয়া করে। আবার আমরা জানি ক্লোরিন মনোভ্যালেণ্ট সুতরাং সোডিয়ামও মনোভ্যালেণ্ট।

যে সমস্ত মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত ক্রিয়া করে তাহাদিগকে বাইভ্যালেণ্ট বলা হয়। যেমন—ক্যালসিয়াম, অক্সিজেন। H_2O-তে আমরা দেখতে পাই একটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেনের সহিত ক্রিয়া করছে। সুতরাং অক্সিজেন বাইভ্যালেণ্ট। যে সমস্ত ধাতব পদার্থ তিনটি হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে তাহাদিগকে বলে

ট্রাইভ্যালেণ্ট। টেট্রাভ্যালেণ্ট, পেণ্টাভ্যালেণ্ট হেক্সাভ্যালেণ্ট এমন কি অক্টোভ্যালেণ্ট পদার্থ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

সমভ্যালেন্সি অনেকের থাকতে পারে। যেমন Ca ও O_2 এরা প্রত্যেকে ডাইভ্যালেণ্ট স্নুতরাং এরা যখন মিশবে তখন একটা Ca কেবলমাত্র একটি অক্সিজেনের সহিত মিশবে। যেমন—CaO।

কোন দ্বি বা ত্রি ভ্যালেন্সি-সমন্বিত পদার্থকে এক ভ্যালেণ্ট পদার্থের সঙ্গে মিশতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ দ্বি-ভ্যালেণ্ট ২টি H, ত্রি-ভ্যালেণ্ট তিনটি H-এর সঙ্গে মিশবে। কিন্তু যখন দ্বি-ভ্যালেণ্ট ত্রি-ভ্যালেণ্ট পরস্পরেব সঙ্গে মিশে তখন তারা একটা বিশেষ নিয়ম পালন করে। Al ত্রি-ভ্যালেণ্ট আর O ডাইভ্যালেণ্ট। স্নুতরাং একটা Al দেড় অক্সিজেনের সঙ্গে মিশবে। পরমাণু থেকে ছোট অংশে তো আর ভাঙ্গা যায় না বা পরিবর্তিত করা যায় না। স্নুতরাং বলা যেতে পারে ২টা Al ৩টা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশবে; যেমন, Al_2O_3। সোজাসুজি বলা যায় যে, ভ্যালেন্সি সংখ্যা একটা অন্যেব সঙ্গে বদলিয়ে বসালে ফরমূলা তৈরী হযে যায়। ফরমূলা হবে Al_2O_3।

কখনও কখনও ধাতব পদার্থ বা অন্য বাষ্পীয় পদার্থের ভ্যালেন্সি কম-বেশী হয়। যেমন NH_3, এখানে N ট্রাইভ্যালেণ্ট মাত্র। কিন্তু NH_4Cl এতে N পেণ্টাভ্যালেণ্ট। সে কারণে বলা যায় যে কোন একটি ধাতব পদার্থ ভ্যালেন্সি সংখ্যা বেশী থাকলেও অল্প সংখ্যক মিশবার মত দ্রব্য নিযেও সন্তুষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু সর্বোচ্চ ভ্যালেন্সি সংখ্যা বেশী। সাধারণতঃ মেনডেলিফ পিরিঅডিক সূত্র অনুসাবে যে ধাতু বা বাষ্প যে গ্রুপের অন্তর্গত তাদের ভ্যালেন্সি সেই গ্রুপ সংখ্যার উপর নির্ভর করে। N পঞ্চম গ্রুপের অন্তর্গত। স্নুতরাং সর্বোচ্চ ভ্যালেন্সি সংখ্যা 3। এর মধ্যে অন্য কোন রাসাযনিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করলে যে স্থায়ী পদার্থের সৃষ্টি করবে তা নয়। অনেক সময় অনেক অক্সাইড স্থাযী হয় না।

নাইট্রাস অক্সাইড—ফরমূলা—N_2O, পরমাণু ওজন—৪৪।

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রণালী—একটি ফ্লাস্কে শুষ্ক এমোনিয়াম নাইট্রেট নেওয়া গেল। ফ্লাস্কটি পরে একটি ফুটা কর্ক দিয়ে এঁটে দিযে ঐ ফুটা দিয়ে একটি বহির্নির্গমন নালী দেওয়া গেল। জলের উপরের তলা দিযে জল সরিযে জারের মধ্যে বাষ্পটি ধরা গেল। এই বাষ্পই নাইট্রিক অক্সাইড। ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে বাষ্প প্রস্তুত হবে।

$$NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O$$

ঠাণ্ডা জলে সহজদ্রাব্য। সুতরাং গরম জল সরিযে জারের মধ্যে বাষ্প রক্ষা করা উচিত।

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)—বর্ণহীন বাষ্প। সামান্য একটু গন্ধ আছে। যখন বাতাসের সঙ্গে মিশিযে ঘ্রাণ গ্রহণ করা হয তখন এটা হাসির উদ্রেক করে। ঠাণ্ডা জলে সহজদ্রাব্য।

রাসায়নিক—নিজে জ্বলে না তবে অন্য কোন বাষ্পকে জ্বলতে সাহায্য করে। যদি কোন আগুন নিভিযে দিযে সেই কাঠিটা বাষ্পের মধ্যে ধরা যায তবে ঐ আগুন আবার জ্বলে উঠবে। সোডিয়াম, ম্যাগনেসিযাম, ফসফরাস এই বাষ্পের মধ্যে খুব জোরে জ্বলে।

$$2N_2O + 2Na = Na_2O_2 + 2N_2$$

$$C + 2N_2O = CO_2 + 2N_2$$

উত্তপ্ত হলে নাইট্রাস অক্সাইড থেকে N_2 বার হযে আসে এবং অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়ে, আর এই অক্সিজেনের মধ্যে আগুন জ্বলে।

ব্যবহার—অস্ত্র চিকিৎসার সময়ে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করবার জন্য এর ব্যবহার হয়।

নাইট্রিক অক্সাইড—ফরমুলা—NO, পরমাণু ওজন—৩০।

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রণালী—উলফ বোতলে থিসিল ফোঁদেল ঢুকান হলো। বোতলের মধ্যে তামার পাতের টুকরা দিয়ে খুব ভাল করে

খিসিল কোঁদেল এঁটে দেওয়া হলো যেন কোনমতে কোন বাতাস এর মধ্যে না ঢুকতে পারে। এইবার ঐ খিসিল কোঁদেলের সহযোগে বোতলের মধ্যে ঘন নাইট্রিক এসিড ও জল পরিমাণ মত মিশিযে দেওযা হলো। এই এসিড ও জল তামার টুকরার সংস্পর্শে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প উদ্ভূত হতে থাকে। কিন্তু সমস্ত বোতলটি ধূসর ধোঁযাতে ভর্তি হযে যাবে কারণ নাইট্রিক অক্সাইড ও অক্সিজেন মিশে একটা মিশ্র পদার্থ তৈরী করবে। সেজন্য কিছু সময যতক্ষণ না এই বর্ণীন বাষ্প বোতল থেকে বার হযে না যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাবপরে ঐ বাষ্প জাবের মধ্যে ধরা যেতে পারে।

$$3Cu+8HNO_3=3Cu(NO_3)_2+2NO+4H_2O$$

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)—বর্ণহীন বাষ্প, জলে দ্রব নয; বাতাস থেকে ওজনে একটু ভারী। নিজে পোড়ে না কিংবা ধীরে ধীবে উত্তপ্ত করলে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয না। এক কথায বলা যেতে পাবে সাধারণতঃ NO আগুনকে প্রজ্জ্বলিত হতে সাহায্য করে না। কিন্তু খুব বেশী উত্তপ্ত হলে অবশ্য অন্যকে পুড়তে সাহায্য কবে। যখন খুব জ্বলন্ত একটু ফসফরাস এই বাষ্পের মধ্যে দেওযা যায তখন ফসফরাসটুকু ভীষণভাবে জ্বলতে থাকবে।

$$4P+10NO=2P_2O_5+5N_2$$

তেমনি যদি কোন জ্বলন্ত গন্ধক ঐ বাষ্পের মধ্যে দেওয়া যায় তবে ঐ বাষ্প নিভে যাবে কিন্তু খুব উত্তপ্ত হলে জ্বলতে থাকবে। যখন কোন নাইট্রিক অক্সাইড ও কার্বনডিসালফাইড মিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করা যায় তবে তারা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকবে।

NO-বাষ্পের প্রযোজন দ্বিবিধ—

(১) যখন NO বাষ্প হাইড্রোজেনের সহিত মিশে এবং যদি এই দুই

মিশ্রিত বাষ্প কোন উত্তপ্ত প্লাটিনাইজড এসবেসটসের উপর দিয়ে নির্গত করা যায় তবে ঐ NO বাষ্প NH_3তে পর্যবসিত হয়।

(২) সালফিউরিক এসিড তৈরী করতে NO বাষ্প অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায়।

নাইট্রোজেন ট্রায়াক্সাইড—ফরমূলা—N_2O_3, পরমাণু ওজন—৭৬।

অনেক রাসায়নিক পণ্ডিত মনে করেন এই বাষ্পের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র নাইট্রাস অক্সাইড ও নাইট্রিক অক্সাইডের মিশ্রণে প্রস্তুত কোন রাসাযনিক পদার্থ।

যখন N_2O ও NO বাষ্প একত্রে মিশিযে—৩০° সে. বাষ্প রাখা হয় তখন বাষ্প দুইটির মিশ্রণ হয।

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)—লালচে ধূসব বর্ণ। উত্তাপ বাড়লে দুইটি বিভিন্ন বাষ্পে বিভক্ত হযে পড়ে। এই থেকে নাইট্রাস এসিড পাওয়া যায (HNO_2)। নাইট্রাস এসিড বিশুদ্ধ অবস্থায পাওয়া যায না। এদের স্থায়িত্ব খুব কম। কিন্তু নাইট্রাইট স্থাযিত্ব মাটিতে বহুদিনের। নাইট্রাইট অতি সহজদ্রাব্য।

নাইট্রাস এসিড—সোডিযাম নাইট্রাইট-এর উপর যদি HCl দিয়ে ক্রিয়া করা হয তবে,

(i) $NaNO_2 + HCl = NaCl + HNO_2$

(ii) $Ba(NO_2)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2HNO_2$

গুণ ও ধর্ম—অক্সিজেন বা মিশ্র পদার্থেব ঋণাত্মক হ্রাস করে। একটু অম্ল সোডিযাম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবকে বর্ণহীন করতে পারে। আর ডাইক্রোমেট দ্রবণকে সবুজ রঙে পরিবর্তিত করতে পারে। নাইট্রাস এসিড যখন অন্য কোন মিশ্র পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে তখন নাইট্রাইট তৈরী করে। প্রায় সব নাইট্রাইট জলে সহজদ্রাব্য। সোডিয়াম ও

পটাসিয়ামের সঙ্গে মিশে বা ক্রিয়া করে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রাইট তৈরী করে।

মাটিতে জৈব পদার্থের মাধ্যমে নাইট্রাইট তৈরী হয়। গাছ সোজাসুজি নাইট্রাইট নিতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন নাইট্রেট।

নাইট্রোজেন পেরক্সাইড—ফরমুলা—NO_2, পরমাণু ওজন—৪৬।

সাধারণতঃ কোন ধাতব পদার্থের সহিত তৈরী নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করে নাইট্রোজেন পেরক্সাইড পাওয়া যায়।

একটি শক্ত কাচের পরীক্ষানালীতে (Test tube) কিছু পরিমাণ লেড নাইট্রেট লওয়া হইল। এই পরীক্ষানালীর সহিত একটি U-নালী যোগ করা হলো ও ঐ U-নালীটি বরফের মত ঠাণ্ডা মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হলো। এই বার ধীরে ধীরে পরীক্ষানালীটিকে গরম করা হতে লাগলো। প্রথমে লেড নাইট্রেট গলে যাবে তারপর ধীরে ধীরে N_2O_4 নির্গত হবে।

$$2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 4NO_2 + O_2$$

ধর্মাবলী--নিম্ন উত্তাপ রেখায় নাইট্রোজেন পেরক্সাইড বর্ণহীন, শক্ত পদার্থ। অনেক সময় স্ফটিকাকারে গ্রহণ করে। জলের সহিত মিশে নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড তৈরী করে।

$$N_2O_4 + H_2O = HNO_3 + HNO_2$$

নাইট্রোজেন পেরক্সাইড থেকেও এমোনিয়া তৈরী হয়; যখন N_2O_4 ও H_2 মিশ্র করে স্পঞ্জী প্লাটিনামের উপর দিয়ে চালু করা যায় তখন এমোনিয়া তৈরী করে।

$$N_2O_4 + 7H_2 = 2NH_3 + 4H_2O$$

ভৌত ধর্ম—N_2O_4 ঠিক এই অবস্থায় থাকে না NO_2তে পরিণত হয়। −৯°সে ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে থাকে। উত্তাপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ হলদে হয় তারপর কমলা ও লালচে হয়। ২২°সে ফুটতে থাকে।

−৯°সে		২২°সে		১৪০°সে		৬২০°সে	
N_2O_4	$\rightleftarrows$	N_2O_4	$\rightleftarrows$	N_2O_4	$\rightleftarrows$	$2NO_2$	$\rightleftarrows$ $2NO+O_2$
ঠাণ্ডাশক্ত		তরল		বাষ্প			

রাসায়নিক ধর্ম—সাধারণ উষ্ণতায় জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড তৈরী করে।

$$2NO_2+H_2O=HNO_3+HNO_2$$

কসটিক সোডার সঙ্গে সোডিয়াম নাইট্রেট ও নাইট্রাইট তৈরী করে। সালফিউরিক এসিড এর সঙ্গে এসিড নাইট্রো সালফিউরিক এসিড তৈরী করে।

$$H_2SO_4+N_2O_4=HSO_4(NO)+HNO_3$$

দ্বিতীয় অধ্যায়

এমোনিয়া (Amonia)

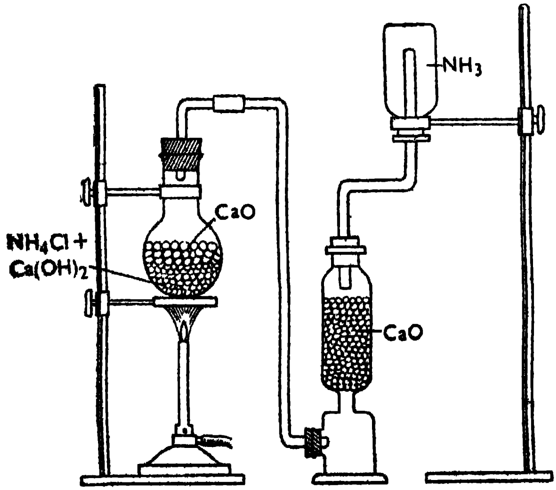
ফরমূলা—NH_3, পরমাণু ওজন—১৭।

প্রাপ্তিস্থান—বাতাসে সামান্য পরিমাণ এমোনিয়া পাওয়া যায়। জৈব পদার্থের পচনের ফলে মাটিতে এমোনিয়ার সৃষ্টি হয়। ঘোড়ার বা গরুর গোয়ালের কাছে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এমোনিয়া থেকে নাইট্রেট তৈরী হয় আর এই নাইট্রেট বিভিন্ন স্থানে জলের সঙ্গে মিশে যাতায়াত করে।

পরীক্ষাগারে প্রস্তুত প্রণালী—যে কোন এমোনিয়াম জাতীয় মিশ্র পদার্থ উত্তপ্ত করে এমোনিয়া পাওয়া যায়।

$$NH_4Cl + CaO = 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$$
$$2NH_4Cl + CaO(H)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$

শুষ্ক এমোনিযাম ক্লোরাইডের সঙ্গে শুষ্ক চুণ মিশান হলো। এই মিশ্রিত পদার্থগুলি একটি শক্ত পরীক্ষা নালীতে পুরে একটি পরীক্ষাগারে খুঁটিতে (stand) আটকান হলো। ঐ পরীক্ষানালীর মুখ ভালকরে ছিপি দিয়ে বন্ধ করা গেল। এবার ছিপিতে একটা ছোট ফুটো করে তা দিয়ে একটা সরু নল বসিয়ে



একটা জারের মধ্য দিয়ে বাতাস সরিয়ে উপুড় করা জারের মধ্যে বাষ্পটি

ধরা গেল। জারের মধ্যে থাকে শক্ত গুঁড়া চুণ। এই গুঁড়া চুণের মধ্য দিয়ে এমোনিয়া নির্গত করালে এমোনিয়া জলশূন্য হয়।

(১) ঘন সালফিউবিক এসিডের সঙ্গে এমোনিয়া ক্রিয়া করে এবং এমোনিয়াম সালফেট তৈরী করে। সুতরাং এদিযে শুকানো যায না।

$$2NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2 SO_4$$

(২) $P_2O_5 + H_2O$ এমোনিযার সঙ্গে মিশে ফসফরাস পেণ্টক্সাইড তৈরী কবে। সুতবাং এ দিযে শুকানোব কাজ হয না।

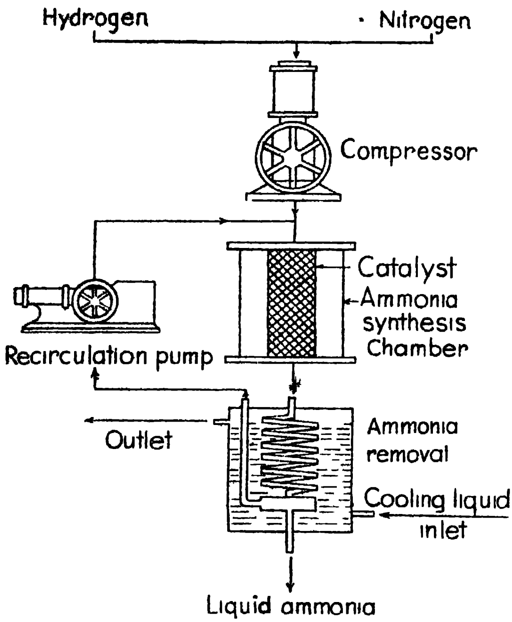
যান্ত্রিক প্রস্তুতকরণ—যখন কযলা থেকে কযলার বাষ্প (coal gas) তৈবী কবা হয তখন উপবি উৎপাদন হিসাবে এমোনিয়া পাওযা যায। অবশ্য এ থেকে প্রথমে পাওযা যায এমোনিয়া জাতীয তরল পদার্থ (liquor amonia)। তবল এমোনিযাকে ঘন চুণেব জলেব সহিত ফোটালে এমোনিয়া বাষ্প পাওযা যায এবং ঐ এমোনিযা (বাষ্প) ববফ মিশ্রিত জলের মধ্য দিযে চালালে বিশুদ্ধ লাইকাব এমোনিযা পাওযা যাবে।

এমোনিযাম জাতীয মিশ্র পদার্থ পেতে হলে জলেব মধ্য দিয়ে না চালিয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিডেব সঙ্গে মিশালে এমোনিযা ক্লোবাইড পাওযা যায। আব সালফিউরিক এসিডেব সঙ্গে মিশালে এমোনিযাম সালফেট পাওয়া যায।

পৃথিবীতে এমোনিযাম ও এমোনিযামজাত মিশ্র পদার্থের প্রযোজন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কারণ এই মিশ্র পদার্থও মাঠে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা বাড়ছে, সুতবাং উৎপাদন বাডানোর প্রযোজন। জমিতে ফসল বাড়াতে প্রাথমিক সারের প্রযোজন। কযেক বৎসর আগে এর প্রয়োজন ছিল খুব কম এখন প্রায় লক্ষ গুণ বেড়ে গিযেছে।

হেবরর্স সংশ্লেষণ—বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন ১ : ৩ এই অনুপাতে মিশিয়ে ২০০° আবহাওয়ার চাপে (atmosphere) টেনে আনা হয়। তার পর ৫০০° সে.—৭০০° সে. উত্তপ্ত একটা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ

করান হয়। এই কক্ষের মধ্যে থাকে লোহার টুকরা ও মলিবডিনাম। এখানে এসে N ও H মিলিত হতে সুরু করে তারপর মিলিত NH_3, হাইড্রোজেন ও অন্যান্য পদার্থ—চাপের সাহায্যে ঠাণ্ডা করা হয়। এই সময়ে NH_3 তরলীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্য হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন বাষ্প তরলীভূত হয় না।



$$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3.$$

গত প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীতে এই পদ্ধতিতে এমোনিয়াম তৈরী হতো। যদি উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে যায় তবে NH_3-এর পরিমাণ কমে যাবে। সুতরাং সব থেকে বেশী এমোনিয়া পেতে গেলে—(১) উপযুক্ত উত্তাপে গরম করতে হবে (Optimum temp.), (২) কোন সহায়কের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করতে হবে (Catalyst), (৩) উচ্চচাপের সহযোগে, (৪) নজর রাখতে হবে যে এমোনিয়া তৈরী হবার পর আবার যেন NH_3 ভেঙ্গে না যায়।

এমোনিয়ার শিল্প উৎপাদন—(১) কয়লা হইতে যখন অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation) দ্বারা কোল গ্যাস প্রস্তুত করা হয়, সেই সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে এমোনিয়া পাওয়া যায়। এই এমোনিয়া তরল

অবস্থায় থাকে এবং ইহাকে বলা হয় তরল এমোনিয়া (liquor amonia)। এর মধ্যে নানাপ্রকার দ্রব্য অনেক সময় মিশে থাকে। NH_4OH এবং $(NH_4)_2SO_4$ অনেক সময় এতে মিশান থাকে। অনেকটা পরিমাণ এমোনিয়া বাষ্পাকারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেটাকে কোন বাষ্পাগারে ধরতে পারলে ওর থেকেও তরল এমোনিয়া পাওয়া যায়।

১ টন কয়লার থেকে বাষ্প তৈরী করতে গেলে প্রায় ১২।১৩ সের এমোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। যে এমোনিয়া বাষ্প পাওয়া যায় তার সঙ্গে শতকরা ৬০% সালফিউরিক অম্ল আছে, এমনি অম্লে মিশিয়ে এমোনিয়াম সালফেট তৈরী করা যায়।

(২) যদি নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন (১ : ৩ আয়তনিক অনুপাতে) মিশান যায় তবে এমোনিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং যথাসম্ভব বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন আকাশ থেকে টেনে নিয়ে এসে এবং জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরী করে অনুপাত মাফিক কোন পাম্প যন্ত্রের সাহায্যে ২০০ বায়ুর চাপে (atmospheric pressure) এই দুইটি বাষ্পকে প্রকোষ্ঠে পাঠান হয়। বিদ্যুৎ সহকারে বা অন্য কোন পন্থায় এই প্রকোষ্ঠের উত্তাপ ৫০০°—৭০০°সে মধ্যে রাখা হয়। আর থাকে এর মধ্যে কোন রাসায়নিক সহায়ক (catalyst)। সাধারণতঃ মলিবডিনাম বা পটাসিয়াম অক্সাইড দেওয়া হয়। এখানেই এমোনিয়া তৈরী হয়। তারপর খুব সরু একটি ছিদ্রপথে এই এমোনিয়া বাষ্প এই প্রকোষ্ঠ থেকে নীচের একটি ফাঁকা বড় প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে এসে হঠাৎ সম্প্রসারিত হয়ে বাষ্পের উত্তাপ কমে যায় এবং এমোনিয়া তরলীকরণ হয়। অন্যান্য যে মিশ্রিত O_2 ও H_2 থাকে তারা বাষ্প থেকে যায় এবং বহির্গমন নালী দিয়ে বার হয়ে যায়।

এইবার নীচের নালী পথে তরল এমোনিয়া একস্থানে রাখা হয়। বহির্পথে যে বাষ্প চলে অবিকল তাকে প্রয়োজনমত আবার কাজে লাগান হয়।

এমোনিয়ার ধর্ম : ভৌত ধর্ম—ইহা বর্ণহীন তীব্র গন্ধযুক্ত বাষ্প। ভীষণ চোখ জ্বালা করে। অতি সহজে জলে দ্রাব্য। সহজে তরলীভূত হতে পারে। তরল এমোনিযাতে ২৬% এমোনিয়া থাকে।

রাসায়নিক—জলের সহিত অতি সহজেই দ্রাব্য ও NH_4OH তৈরী করে।

অনেক মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা NH_4OH এর সহিত ক্রিয়া করে।

$$AlCl_3 + 3NH_4OH = Al(OH)_3 + 3NH_4Cl.$$

পটাসিযাম ও সোডিযামের সঙ্গে ক্রিযা করে amide তৈরী করে

$$NH_3 + 2Na = 2NaNH_2 + H_2.$$

বায়ুতে না পুড়লেও অক্সিজেনের মধ্যে এমোনিয়া জ্বলে

$$4NH_3 + 3O_2 = 2N_2 + 6H_2O.$$

এমোনিযা ক্ষারীয়, অম্লেব সহিত ক্রিযা করে লবণ তৈরী কবে

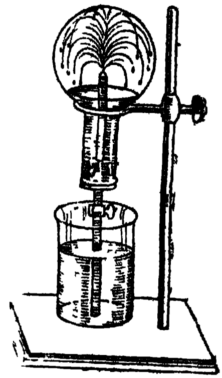
$$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3.$$

বিভিন্ন পরীক্ষা

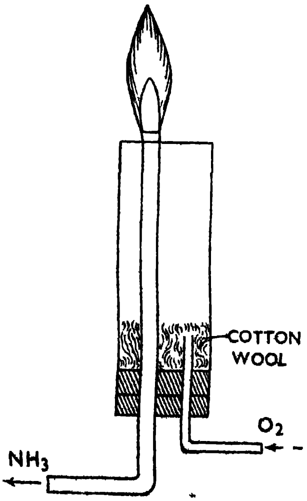
এমোনিয়া বাষ্প বায়ুর চেয়ে হাল্কা—দুটি বাষ্প জার একটিতে বায়ু ভর্তি ও অন্যটিতে এমোনিযা বাষ্প ভর্তি কবে বায়ুপূর্ণ জারটি উপরে এবং তার নীচে এমোনিযাপূর্ণ জার মুখোমুখি কিছুক্ষণ রাখলে দেখা যায যে উপরের জার এমোনিযাতে ভর্তি হযে গেছে আর নীচের জার বায়ুতে পূর্ণ হয়েছে।

যোগ্যতার পরীক্ষা—একটি সরু গলা গোলতলাবিশিষ্ট ফ্লাস্কে এমোনিয়া ভর্তি করা হলো। ফ্লাস্কের সরু মুখ ভাল করে একটি গোলছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়ে এঁটে দিয়ে তার মধ্য দিয়ে নালী চালান হলো। যেন অন্ততঃ ফ্লাস্কের অর্দ্ধেকটা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইবার একটি রঙ্গিন লিটমাস জলপূর্ণ

বিকারে ঐ নালীর আগা ডোবানা হলো এবং ঐ ফ্লাস্কটি উপুড় করে দেওয়া হলো। এরপর ঐ ফ্লাস্কের উপর কিছু ঈথার ঢালা হলো। ঈথার তাড়াতাড়ি উবে যাওয়ার ফলে ঠাণ্ডা হয় এবং ভিতরের এমোনিয়া বাষ্প সঙ্কুচিত হয় ফলে ফ্লাস্কের মধ্যে কিছু শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে কয়েক ফোঁটা রঙ্গীন জল উপরে উঠে এসে দ্রবীভূত করে এবং ফ্লাস্কের মধ্যে চাপ হঠাৎ কমে যায় এবং বিকারের জল ফোয়ারার মত চারিদিকে গোলাকারে পড়তে থাকে। এদিযে এমোনিযার ক্ষারীয ধর্ম প্রমাণিত হচ্ছে।



এমোনিয়া ও অক্সিজেন জ্বলে—একটি কাচের চিমনিমত নেওয়া হলো। তার নীচের মুখ ছিপি দিয়ে এঁটে দিযে দুটি নালী যাওয়ার ছিদ্র করা হলো। এই দুটি নালীর একটিতে O_2 এবং অপরটিতে এমোনিযা চালান হয়। প্রথমে এমোনিযার নলটি ছাড়া হলো পরে অক্সি-জেনের নল খোলা হল এবং জেলে দেওয়া গেল। এমোনিয়া হলদে শিখায় জলবে।



এমোনিয়ার ব্যবহার—(১) বরফ তৈরী করতে ঠাণ্ডার সৃষ্টি করে। (২) জলের সহিত ক্রিয়া করে এবং অনেক সময় ঔষধের মত ব্যবহার হয়। (৩) নানাপ্রকার বিশেষতঃ সোডিয়াম কার্বনেট ও এমোনিয়া লবণ তৈরীতে কাজে লাগে।

বরফকল ও হিমায়ক (Ice machine & Refrigerator)—তরল এমোনিয়া, তরল CO_2 ও তরল সালফার ডায়-অক্সাইডকে বাষ্পীভবন করলে হিমায়ক প্রস্তুত হয়। একে বলা হয় হিমঘর। এতে সব জিনিষ এমন কি পচনশীল খাবার জিনিষ রাখা যায়। ৪৫° ফা. পচনশীল জিনিষ রাখলে কোন বীজাণু বৃদ্ধি হতে পারে না।

গুণ ও ধর্ম (ভৌত)—অত্যন্ত তিক্ত (pungent), অম্লহীন। বাতাস থেকে হাল্কা, খুব তাড়াতাড়ি এই বাষ্পকে তরলীভবন করা যেতে পারে। এতে এমন একটা তীব্র গন্ধ আছে যে অল্পে চোখে জল আসে।

রাসায়নিক ধর্ম—এমোনিয়া নিজে জ্বলে না অন্যকে জ্বলতে সাহায্যও করে না। কিন্তু কেবলমাত্র অক্সিজেনের মধ্যে এমোনিয়া জ্বালিয়ে দিলে জ্বলতে থাকবে।

$$NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O.$$

সাধারণভাবে এমোনিয়া একটা যৌগিক পদার্থ। কিন্তু খুব বেশী উত্তাপে (১০০০° সে.) বিভক্ত হয়ে পড়ে। $2NH_3 = N_2 + 3H_2$.

ক্ষারীয় ধর্ম—এমোনিয়ার মধ্যে ক্ষারের ধর্ম বিদ্যমান আছে যা জলের সহিত মিশে সহজে ক্রিয়া করে থাকে।

$$NH_3 + H_2O = NH_4OH.$$

হাইড্রোজেনের মত CuO এবং PbO থেকে O_2 সরিয়ে নেয় ও মূল ধাতুতে পরিণত করে আবার একে উত্তপ্ত করলে বিভক্ত হযে পড়ে।

$$NH_4OH = NH_3 + H_2O.$$

প্রায় সমুদয় অজৈব এসিডগুলির সহিত ক্রিয়া করে ও ক্ষারজাতীয় লবণ তৈরী করে।

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl.$$

$$2NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2\ SO_4.$$

$$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3.$$

যখন এমোনিয়া, উত্তপ্ত সোডিয়াম ও পটাসিয়াম উপরে যায় তখন,

$$2NH_3 + Na = NaNH_2 + H_2.$$

বিভিন্ন পরীক্ষা—একটি এমোনিয়া ভরা জারের মুখ ঢেকে নিয়ে তার উপর আর একটি জার নিয়ে যাওয়া হলো। এইবার ঐ জারের ঢাকনি ধীরে ধীরে টেনে নিলে ধীরে ধীরে অল্প সময়ের মধ্যে নীচের হাল্কা বায়ু উপরে চলে যাবে এবং বায়ু নীচে চলে আসবে। উপরের জারের মধ্যে একটি লাল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে দিলে—লাল রং নীল হয়ে যাবে।

ঝর্ণাধারায় পরীক্ষা—একটি গোলাকার ফ্লাস্ক ছিপি দিয়ে ভাল করে বন্ধ করা হলো। ঐ বন্ধ ছিপির মধ্যে দিয়ে একটি ছোট ছিদ্র করে একটা সরু কাঁচের নালী ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

এইবার ঐ ফ্লাস্কে এমোনিয়াম ভর্তি করা হলো।

প্রয়োজনীয়তা—(১) বর্তমান জগতে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের প্রয়োজন খুব বেশী আর এই সার পাওয়া যায় এমোনিয়া ও তদীয় বিভিন্ন লবণ থেকে। যেমন এমোনিয়াম সালফেট, এমোনিয়াম নাইট্রেট ও এমোনিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

(২) ডাক্তারখানার ঔষধপত্রে এর প্রয়োজন আছে। স্মেলিং সল্ট এমোনিয়া থেকে তৈরী হয়।

৩) এমোনিয়ার সাহায্যে জল ঠাণ্ডা করে বরফ তৈরী করা হয়।

এমোনিয়ার উপর চাপের প্রভাবে এমোনিয়া তরলীকরণ হয়। আবার এই তরল এমোনিয়া থেকে চাপ সরিয়ে নিলে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হয়। ঠাণ্ডাকরণের ফলে তাপ 0° সে. নীচে চলে যায়। বাষ্পীয়নের সময় যে শীতলতা সৃষ্টি হয় তা দিয়ে জলকে বরফে পরিণত করা হয়।

এমোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4]$—এমোনিয়া নিজে মৃদু ক্ষার হলেও এমোনিয়াম জাতীয় লবণ বিভিন্ন এসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করান হয়।

এমোনিয়া সালফেটের নাম আজ আমাদের দেশে এমন লোক খুব কম

আছে যারা এখনও শোনেনি। কারণ খাদ্যসমস্যাপূর্ণ দেশে খাদ্য-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন—জমিতে সার দিয়ে। এমোনিয়াম সালফেট জমির একটি উৎকৃষ্ট সার। ইহা মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে দিলে ও মাটির ভাল যত্ন নিলে ফসলের পরিমাণ অনেক বাড়ে। দেখতে ঠিক অনেকটা আমাদের খাবার লবণের মত বা চিনির মত। অনেকে সেজন্য একে লবণ সার বলে। সার হিসেবে এর প্রচলন হওয়ায় কৃষক সম্প্রদায়ও এর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়েছে।

FAO-এর তালিকায় দেখা যায় পৃথিবীর ১৫টি দেশে এর তৈরী হচ্ছে। যে দেশে এই সার তৈরীর কারখানা নেই সে দেশের লোকেরা অন্য দেশ থেকে এই সার আমদানী করে। আমরা জানি কয়লা থেকে জ্বালানি বাষ্প তৈরী করার সময় আমরা অতিরিক্ত উপজাত পাওনা হিসেবে তরল এমোনিয়া পাই। এই এমোনিয়া সালফিউরিক এসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করলে এমোনিয়া সালফেট তৈরী করে ও ধীরে ধীরে দানা বেঁধে স্ফটিকাকৃতি গ্রহণ করে।

এমোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)—এমোনিয়াম সালফেটের সহিত সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিয়ার ফলে এমোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরী হয়।

$$2NaCl + (NH_4)_2SO_4 = 2NH_4Cl + Na_2SO_4.$$

ব্যবহার—সার হিসেবে এরও চাহিদা বেড়ে চলেছে। ঝালাই করতে এর প্রয়োজন আছে। ঔষধ ও রসায়নাগারে এর প্রয়োজন আছে। শুকনো ব্যাটারী তৈরী করতে এর প্রয়োজন। টিনের পাত্রের মুখ আঁটতেও ইহা লাগে।

এমোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3)—তরল এমোনিয়ার সহিত নাইট্রিক এসিড ক্রিয়া করে এমোনিয়াম নাইট্রেট তৈরী করা হয়।

$$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3.$$

প্রয়োজনীয়তা—সার হিসেবে এরও ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমোনিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড তৈরী করে।

এমোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট—এমোনিয়াম সালফেট ও এমোনিযাম নাইট্রেট সম পরিমাণে মিশিযে এই পদার্থটি তৈরী করা হয়।

$$(NH_4)_2SO_4 + NH_4NO_3 = (NH_4)_2SO_4NH_4NO_3$$

সার হিসেবে এরও ব্যবহার আমাদের দেশে বাড়ছে। জার্মানীতে এর যথেষ্ট প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও এর চাহিদা বাডছে।

এমোনিয়াম কার্বনেট [$(NH_4)_2CO_3$]

এমোনিযাম সালফেটের সঙ্গে খড়িমাটি মিশালে—

$$(NH_4)_2SO_4 + CaCO_3 = (NH_4)_2CO_3 + CaSO_4$$

বায়ু ও নাইট্রোজেন চক্র—পৃথিবীর উপরিভাগে বাযুতে শতকরা ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন আছে আর পৃথিবীব সকল স্থানেই এর পরিমাণ প্রায ঠিক থাকে। বাতাসে নাইট্রোজেন থাকার ফলে বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে সেই অক্সিজেন সহজে তরল হয না। এতে জীবজন্তুদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা হয।

বাতাসে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে সে পরিমাণ নাইট্রোজেন পৃথিবীর নিজস্ব। কারণ দেখা যায এই বাতাসের নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলের সহিত মিশে মাটিতে এসে পড়ে ও মাটির সহিত মিশে গাছের খাদ্য তৈরী করে। আবার নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আকাশে উঠে যায় ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে N_2-র পরিমাণ সমান থাকে।

আমরা দেখেছি কালবৈশাখীতে ও বর্ষার সমাগমে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের সমারোহ। আর এই বিদ্যুতের প্রভাবে শূণ্যের N_2 ও জলকণার H মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে NH_3। তারপর

বর্ষাধারার সঙ্গে নেমে আসে মাটিতে। অবশ্য এর পরিমাণ খুব কম। কারণ উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক না হলে NH_3 তৈরী হতে পারে না। মাটিতে এসে পড়ে বিভিন্ন বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ NH_3 থেকে নাইট্রেট তৈরী হয়। তখন ঐ নাইট্রেট শিকড়ের মাধ্যমে গাছে প্রবেশ করে। দেহের মধ্যে নানা প্রক্রিয়া চলে এবং শেষ পর্যন্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয়।

প্রোটিন একটা জৈবিক পদার্থ। এর উপর শরীরের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। এই জৈবিক পদার্থের আনুমানিক ফরমূলা বলা যেতে পারে— $NH_2NHCHRO\ (NHCHRO)_nCOOH$.।

গাছের দেহ বা লতাপাতা যখন মাটিতে পড়ে বীজাণু ক্রিযায় পচতে থাকে তখন তৈরী হয় phyto-hormone। আর এরই প্ররোচনায় (strain) গাছ বেড়ে উঠে। ফলে মাটিতে N_2 বৃদ্ধি পায়।

শাকসব্জী ও ঘাসের কিছু প্রোটিন প্রাণীদেহে যায় তাদের খাদ্যের মাধ্যমে। আবার মলমূত্রাকারে বেরিয়েও যায় প্রাণীদেহ থেকে। এব কিছুটা মাটিতে মিশে যায়, বাকী অংশটুকু বাষ্পাকারে আকাশে উঠে যায়।

বিদ্যুৎপ্রবাহ   বৃষ্টি   শিকড

$N_2 + 3H_2$ ———→ $2NH_3$ → এমোনিয়া (মাটিতে)——→ গাছ

করসংশ্লেষণ   বীজাণু ক্রিয়া

————→ প্রোটিন < → নাইট্রোজেন → আবহাওয়া।
খাদ্য → প্রাণিদেহ → আবহাওয়া।

বিদ্যুৎ   বায়ুর

সোজাসুজি $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO. \rightarrow\ O_2 = 2NO_2 + 2H_2O = 2HNO_3$।

পরে মাটিতে পড়ে নাইট্রেট।

এ ভিন্ন কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যারা সরাসরি বাতাস থেকে N_2 টেনে নিয়ে এসে শিকড়ে জমা করে রাখে। অবশ্য এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

লুসার্ণ, কলাই প্রভৃতি লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে একপ্রকার বিশেষ রকমের বীজাণু থাকে। তারা সরাসরি বাতাস থেকে N_2 টেনে নিয়ে এসে শিকড়ে জমা করে রাখে। এরা ফল দিয়ে মরে গেলে এদের শিকড় মাটিতে থেকে যায়। এরা মাটিতে N_2 বৃদ্ধি করে ও মাটিকে অধিকতর উর্বরা· করে তোলে।

বাতাস

প্রাকৃতিক নিয়ম

কৃত্রিম উপায়—
(১) হেবরর্স সংশ্লেষণ
(২) বাকল্যাণ্ড আইড পদ্ধতি
(৩) ছযানামাইড পদ্ধতি।

(১) লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়স্থিত নডুল বীজাণু সরাসরি বাতাস থেকে N_2 টেনে আনে।

বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে আকাশে NH_3 ও কখনও কখনও NO_2 তৈরী হয় ও মাটিতে এসে পড়ে।

এমোনিয়াম সালফেট ও সিন্ধ্রী কারখানা—স্বাধীন ভারতের প্রথম কর্তব্য তার অগণিত জনসাধারণকে খাইযে পরিযে মানুষের মত বাঁচবার সুবিধা করে দেওযা। কিন্তু বাদ সেধেছে প্রথমটিতে। পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর আমরা চোখে দেখেছি। বর্তমানের খাদ্যশস্যের অবস্থা দেখে মনে হয় আজও আমরা তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারি নি। চালের দাম বাড়তে দেখলেই মনে হয় আবার বুঝি পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর এসে যায়।

অগণিত ভারতবাসীকে পেট পুরে খাওয়াতে গেলে প্রয়োজন আশু ফসল বৃদ্ধি অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি। ফসল বেশী ফলাবার নানা পথ আছে তার মধ্যে যেটি প্রধান ও প্রথম সেটি হলো জমিতে সার দেওযা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সার কোথায়? প্রতিটি বিষয যেমন আমরা পরের উপর নির্ভর করে এসেছি সারের ব্যাপারেও তাই। সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হলো সারের কারখানা করে দেশে সারের উৎপাদন করা।

ধানবাদ থেকে মাত্র ১৫ মাইল দক্ষিণে—বর্তমানে সিন্ত্রী। মাত্র ২৫ বৎসর আগে এখানে ছিল আদিবাসিদের বাস আর সারা অংশে ছিল ঝোপ, গাছপালা আর কযেক মাইল দক্ষিণে বযে গেছে দামোদর নদ। সেদিনকাব সে সিন্ত্রী আজ আর অবজ্ঞাত নয। আজ আপামর প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে সিন্ত্রী নাম পরিচিত।

স্বাধীন ভারতে সিন্ত্রীর জন্ম। ১৯৫১ সালেব অক্টোবর মাসে প্রথম কারখানা চালু হয। এই কারখানায প্রতিদিন ১,০০০ টন এমোনিযাম সালফেট তৈরী হয়। এ ছাড়া এর থেকে পাওযা যায নানাপ্রকারের দ্রব্য, উপজাত হিসাবে। ১৯৫৫, '৫৬ ও '৫৭ সালে উৎপাদন আশাতীতভাবে ছাড়িযে গেছে।

সিন্ত্রীর বর্তমান কারখানা তৈরী হতে খরচ হযেছে ২৩ কোটি টাকা। একে আরও বাডানোর চেষ্টা হচ্ছে। ১৩ কোটি টাকা ব্যযে নূতন পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে, তার ফলে দৈনিক ৭০ টন ইউরিয়া ও ৪০০ টন এমোনিযাম সালফেট-নাইট্রেট এই কারখানায় তৈরী হবে।

জিপসাম পদ্ধতিতে সিন্ত্রীতে এমোনিযাম সালফেট তৈরী করা হয়। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন। হেবরর্স পদ্ধতিতে এখানে NH_3 প্রস্তুত হয়। তারপর NH_3 সঙ্গে CO_2 বাষ্প ক্রিয়া করে $(NH_4)_2CO_3$ তৈরী করে। এর সঙ্গে খুব ভাল করে গুঁড়া করে জিপসাম $(CaSO)_4$

এমোনিয়াম কার্বনেট-এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে এমোনিয়াম সালফেট তৈরী করা হয় ও উপজাত দ্রব্য হিসাবে ক্যালসিযাম কার্বনেট পাওয়া যায়।

এখানে এই সার প্রস্তুত প্রণালীর জন্য যে কোক চুল্লী আছে সেখানে দৈনিক ৬০০ টন কোক তৈরী হয় এবং অন্যান্য অনেক উপজাত মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়। এখানকার গ্যাস প্ল্যাণ্ট থেকে দৈনিক ৩৩ মিলিযন ঘন ফুট কাঁচা গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাসকে Cl_2 মুক্ত করে $N+H$ কে উচ্চ চাপের প্রভাবে কোন একটি সহায়কের উপস্থিতিতে এমোনিয়া তৈরী করা হয। দৈনিক ২৭০ টন এমোনিয়া তৈরী হয। উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে ক্যালসিযাম কার্বনেট পাওয়া যায তা দিয়ে সিমেণ্ট তৈরী হয়। তার ফলে নিকটেই একটা সিমেণ্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। এই ক্যালসিযাম কার্বনেট মাঠে ছড়িয়ে মাঠের অম্লতা নিরপেক্ষ করবার চেষ্টা করা হয।

সিন্ধ্রী কারখানার জন্য দৈনিক ১,৬০০ টন জিপসাম ও ১৮০০ টন কয়লা প্রয়োজন।

ভারতের মাটির নাইট্রোজেন চাহিদার সঙ্গে একা সিন্ধ্রী পেরে উঠছে না। এর জন্য ভারত সরকার সিন্ধ্রীর মত আরও দুইটি সার তৈরীর কারখানা স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন। ভাখরানাঙ্গাল অঞ্চলে এর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। আর একটা কারখানা স্থাপিত হবে বিহারের বোকারোর সন্নিকটে। জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে পৃথিবীর ক্ষযিষ্ণু মাটি তার সন্তানদের খাবার জোগাতে সম্পূর্ণ অপারক। তার উপর আছে জনসাধারণের ঘনত্ব ও ভৌগোলিক সীমানির্দেশ। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের নরনারীর মধ্যে ৫০% লোক পেট পুরে খেতে পায় না, কিংবা একবেলা খেয়ে বাঁচে। এদের খিদেতে পেটে অন্ন দিতে গেলে আমাদের ফসলের উৎপাদন বাড়াতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? প্রথম ও প্রধান পন্থা উপযুক্ত পরিমাণে মাঠে সার দিয়ে।

প্রতিদিন কৃষকের নাইট্রোজেন চাহিদা বাড়ছে। চাহিদা বাড়ায় ও আমাদের দেশের জমিতে খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য আরও বেশী নাইট্রোজেন জাতীয় সারের প্রযোজন। সেজন্য ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও তিনটি সারের কারখানা স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন ও তার কাজ সুরু হয়ে গেছে। সে দুটি কারখানার প্রস্তুতি সমাপ্তির পথে। শীঘ্রই এর উৎপাদন সুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এতেও আমাদের জমি পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন পাবে না। সেজন্য ভারত সরকার ঠিক করেছেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতি রাজ্যে একটি করে সারের কারখানা গড়ে তুলবেন যাতে ভারতীয় চাষী সহজেই তার জমিতে সার যোগাতে পারেন।

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[কৃষি রসায়ন]

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড

(দশম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

নাইট্রোজেন (Nitrogen)

গাছ ও গাছের খাদ্য—পাবিপার্শ্বিক আবহাওযায গাছ বেড়ে উঠলেও গাছেব সম্যক বৃদ্ধিব জন্য প্রযোজন প্রচুব আলো ও বাতাস। সূর্যেব আলোকে গাছ খাদ্য তৈবী কবে। মাটিব নীচে যে বাতাস থাকে সেগুলি শূন্য কবে মাটি জল আটকে বাখে। প্রকৃতি সদয হলে এব অভাব হয না আব অসদয হলে সেখানে কোন গাছ জন্মাতে পাবে না। সূর্যেব আলোব অভাবে ও তাব উত্তাপেব তাবতম্য প্রভাবে মাটিতে সব সময অক্সিডেশান পদ্ধতি কাজ কবে চলেছে। তাব ফলে মাটিতে যে সমস্ত বাসাযনিক সাব বা পদার্থ আছে সেগুলি গাছেব গ্রহণীয হযে পড়ে।

তিনটি জিনিষেব মাধ্যমে গাছ খাদ্য আহবণ কবে। বাতাস, জল আর মাটি। মাটি ও বায়ু উপাদান জোগায আব জলেব মাধ্যমে এবা পাতায় আসে। বায়ু থেকে গাছ সংগ্রহ কবে কার্বন ডাই-অক্সাইড আব মাটি থেকে সংগ্রহ কবে অন্যান্য খাদ্য। এগুলি গাছ জলেব সঙ্গে শিকড দিযে টেনে নিযে আসে। মাটি থেকে জল নিযে আসাব সাথে সাথে আবও কযেকটি বাসাযনিক পদার্থ টেনে নিযে আসে। এদেব মধ্যে ১২টি পদার্থ প্রধান যথা অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিযাম, ক্যালসিযাম, ম্যাগনেসিযাম, সালফাব, লোহা ইত্যাদি। এইগুলিব মধ্যে আবাব নাইট্রোজেন, ফসফবাস ও পটাস বিশেষ প্রযোজন। এ বাদে আরও বাসাযনিক পদার্থ আছে যাবা মুখ্যভাবে বা গৌণভাবে গাছকে বেড়ে উঠতে সাহায্য কবে। তার মধ্যে বোবণ, ম্যাঙ্গানীজ, কপার, মলিবডিনাম, জিঙ্ক প্রধান। কিন্তু মাটিতে এগুলি খুব কম পবিমাণ থাকে। ১,০০০,০০০

ভাগে একভাগ কি দুইভাগ আছে। অর্থাৎ এক একর জমিতে ১ পাউণ্ড কি ২ পাউণ্ড মাত্র। গাছের দেহ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে প্রায় ৬০টি রাসায়নিক মূল পদার্থ পাওয়া যায়। এর সবগুলিই আসে মাটি থেকে। তবে সব গাছে সব রাসায়নিক পদার্থ সমভাবে থাকে না বা অনেক সময় হয়ত পাওযাই যায় না।

সার ও তার ক্ষয়—মাটিতে সার জাতীয় পদার্থের ক্ষয় হয দু'রকমে। প্রথমতঃ, বৃষ্টি ও উত্তাপের ফলে। দ্বিতীযতঃ, ক্ষেতের ফসলের মাধ্যমে। আগেই বলেছি উত্তাপের ফলে মাটিতে অক্সিডেশান চলছে। এই অক্সিডেশানের ফলে মাটিতে লিগনাটিক প্রোটিন বা প্রোটিন থেকে এমোনিযা তৈবী হয। এর উপর বৃষ্টির জল পড়লে জলেব সঙ্গে বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন মাঠ থেকে চলে যায। এ ভিন্ন আরও একটি কারণ থাকতে পারে যে এই সার জাতীয় পদার্থগুলি অগ্রহণীয অবস্থায থাকে। কারণ দেখা যায কম বা বেশী গাছের তাপ বৃদ্ধির জন্য এইগুলিকে প্রযোজন হয। এদের মধ্যে তিনটি আছে অতি আবশ্যকীয়; যথা, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস। এই তিনটি মাত্র রাসায়নিক পদার্থ, মাঠে পরিমাণ মত ছড়ালে গাছ ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে। আর যে সমস্ত আবশ্যকীয কিন্তু অল্প পরিমাণে স্থিত ধাতব পদার্থের কথা বলা হলো সেগুলি অতি অল্প পরিমাণে মাটিতে থাকে এবং সেগুলি মাঠেতে প্রায়ই গাছ প্রযোজন মত পেযে থাকে। এই পদার্থগুলি মাঠেতে না থেকে মাঠের ফসল কমাতে পারে বা গাছ নানা রোগে আক্রান্ত হয।

সয়েল ব্যাঙ্ক—পৃথিবীতে এমন খুব কম মাটি আছে যেখানে এই তিনটি মৌলিক রাসাযনিক পদার্থ গাছের প্রযোজনানুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণীয় অবস্থায় আছে। কারণ মানুষ যে দিন থেকে চাষবাস সুরু করে মাঠে ফসল ফলাতে শিখেছে সেই দিন থেকে মাটি থেকে সার পদাথ বেশী ক্ষয়ে যাচ্ছে। যদিও কয়েকটি নৈসর্গিক উপাযে এই ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা ক্ষতির পরিমাণ পূরণের পরিমাণ থেকে সব সময়ই বেশী। "সযেল ব্যাঙ্ক" খালি হতে হতে

আজ প্রায় শূন্য হতে চলেছে। ইংলণ্ডে রদামষ্টেড গবেষণাগারের নিকটে মাটিতে শতকবা ২ভাগ নাইট্রোজেন আছে আমাদেব দেশে শতকরা ০·০৪ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু ইংলণ্ডে উল্লিখিত মাটিতে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণীয় অবস্থায় পাওযা যায কিন্তু আমাদের দেশের মাটিতে শতকরা ৫০ ভাগেব বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণীয অবস্থায় থাকে। তার ফলে আমাদের মাটিতে খুব কম নাইট্রোজেন থাকলেও সাধারণতঃ এর কোন অভাব হ্য না। কাবণ এই নাইট্রোজেন গাছেব গ্রহণযোগ্য অবস্থায থাকে। গাছ মাটি থেকে নাইট্রেট নাইট্রোজেন বা এমোনিযা নাইট্রোজেন টানতে পাবে। খুব সম্ভবতঃ ক্যালসিযাম নাইট্রেট গাছ সহজেই মাটি থেকে টেনে নেয।

গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন টানে আব এই নাইট্রোজেন মাটিতে কার্বনজাতীয বা জৈব পদার্থের সহিত মিশে থাকে। অনেক সময মাটিতে এই কার্বনজাতীয পদার্থ বা কোন বাসাযনিক সাব যোগ কবলে মাটিতে বিভিন্ন রাসাযনিক ক্রিযাব মাধ্যমে এই কার্বনজাতীয পদার্থের সহিত মিশে গাছেব গ্রহণযোগ্য পদার্থেব স্বষ্টি করে। মাটিতে কার্বনজাতীয যে পদার্থ থাকে বা যদি কোন জৈব পদার্থ যোগ কবা হয তাতে নানাপ্রকার বীজাণু ক্রিয়া চলে। ফলে গাছেব পাতায ও দেহেতে যে প্রোটিন থাকে সেগুলি উপযুক্ত পাবিপার্শ্বিক আবহাওযায অক্সিজেন সহকারে ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রোটিন—এমাইনো এসিড—এমোনিযা—নাইট্রাইট—নাইট্রেট-র স্বষ্টি করে। সামান্য পরিমাণ জল ও উত্তাপের সহযোগে মাটিতে প্রোটিন সহজেই এমোনিযা তৈরী করে। মাটিতে যদি চাষ দেওযা থাকে তবে এই অম্লেতে অতি সহজেই নাইট্রেট তৈবী হয। মাটী অম্লপূর্ণ হলে বা মাটিতে অম্লতার ভাগ বেশী হলে নাইট্রেট তৈরী হতে পারে না। গাছের শিকড় যখন মাটিতে চলতে চলতে এমোনিয়ার সন্ধান পায় তখন গাছ মাটি থেকে অনেক সময এমোনিয়াও শিকড় দিয়ে টেনে নেয়। মাটি থেকে গাছ এইভাবে দুইটি পদার্থ থেকে

অজৈব নাইট্রোজেন টেনে নেয়, ফলে গাছের আর জৈব নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় না বা টেনে নিলেও তার পরিমাণ খুব কম।

লতাপাতা পচন—মাটিতে জৈব পদার্থের সহিত যে নাইট্রোজেন মিশে থাকে তার পরিমাণ খুব কম। কেবলমাত্র বিভিন্ন পর্যায়ে যখন রসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে তখন কিছু পরিমাণে যে শক্তি (energy) সৃষ্টি করে সেটি নষ্ট হয়ে যায় ও জলসেচনের ফলে মাটি থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন নষ্ট হয়। এর সংরক্ষণ না করলে অনেক সময় কিছু পবিমাণে নাইট্রোজেন নষ্ট হয়ে যায়। বালু মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে না কারণ এই মাটিতে জৈব পদার্থ খুব কম। আবার কালো লতাপাতা পচা মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী কারণ ঐ মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকে। কার্বন ও নাইট্রোজেন সব সময়ই মাটিতে নিজেদের পরিমাণের একটি অনুপাত রক্ষা করে। ১০ : ১ থেকে ২০ : ১ মধ্যে থাকে। সাধাবণতঃ সকল মাটিতে এর পরিমাণ থাকে ১০ : ১। কেবল উষ্ণ অঞ্চলের মাটিতে এর একটু তারতম্য হয়ে থাকে। গাছের লতাপাতা পচে যে হিউমিক (humic) এসিডের সৃষ্টি করে তা মাটির নীচে চুঁইয়ে গেলেও মাটির উপরিস্তরে ০-৮″ মধ্যেই থাকে।

যে মাটিতে শতকরা ২ভাগ কার্বনজাতীয় পদার্থ আছে সে মাটিতে অন্ততঃ শতকরা ০·১০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। যদি এক একর জমিতে লাঙ্গলের ফলা যতদুর যেতে পারে সেই পরিমাণ মাটির ওজন ২,০০০,০০০ পাউণ্ড হয় তবে সেই মাটিতে ৪০,০০০ পাউণ্ড জৈব পদার্থ আছে এবং ২,০০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আছে। যখন মাটিতে চাষ করা হয় তখন মাটিতে নানা প্রকার ক্রিয়ার মাধ্যমে এই নাইট্রোজেন জৈব পদার্থ থেকে নির্গত হয় ও গাছের গ্রহণোপযোগী মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে। এর জন্য প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন সূর্যের আলো। ডাঃ ধর দেখিয়েছেন উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কর্ষিত মাঠে বেশী অক্সিডেশান হয়। তার ফলে গ্রীষ্মকালে মাঠে বেশী অক্সিডেশান হয়।

কেবলমাত্র জৈব পদার্থ থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন আসে না অন্য ভাবেও নাইট্রোজেন মাঠেতে আসতে পারে। কিন্তু সেগুলি গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় না এলে গাছের গ্রহণোপযোগী হয় না। সুতরাং তারা প্রায়ই গাছের অগ্রহণীয় থেকে যায়। জৈব পদার্থ থেকে যে নাইট্রোজেন তৈরী হয় তার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র গাছের গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

অজৈব নাইট্রোজেন—গাছের যে সমস্ত শিকড় মাটিতে থাকে তাতে নানা প্রকার বীজাণু থাকে। এই বীজাণু থেকে অনেক সময় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে এজোটা ব্যাকটার, এরা মাটির মধ্যে যে সমস্ত জৈব পদার্থ থাকে তাদের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। তার ফলে কিছু নাইট্রোজেন গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। বিশেষতঃ যদি কোন মাটিতে এই জাতীয় জৈব সার দেওয়া যায় সেই মাটিতে এর বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সুতরাং মাটিতে পচা খড়কুটা, ফসল জাতীয় গাছের ডাঁটা ইত্যাদি যদি ভাল ভাবে মাটির তলে দিয়ে পচান যায় তবে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। মাটিতে যদি ঝোলা গুড় বা গুড়ের ও চিনির গাদ মিশান যায় তবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মাঠের ফসল দেড়গুণ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। মাটিতে গুড়ের গাদ মিশানার ফলে বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি হবে ও গাছের গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন জাতীয় সার তৈরী করবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে নাই-ট্রোজেনকে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা এদের বেশী। কারণ এরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মিশ্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করবার সময় বহু পরিমাণে শক্তি বার করে দেয়। সেগুলির দ্বারাই এটা সম্ভব হয়। মাটিতে ফসল বাড়াবার জন্য যে সারই যোগ করা হোক না কেন সবগুলি মাটি লাঙ্গল দিয়ে চষার সময় দিলে মাটিকে বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে ফসলোৎ-পাদনের উপযুক্ত করতে সাহায্য করবে। সে কারণ অন্ততঃ ১ মাস আগে মাটিতে গুড় জাতীয় সার যোগ করা উচিত।

নডুল বীজাণু—নডুল জাতীয় ব্যাকটেরিযার দ্বারা আমরা বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন পেতে পারি। এই জাতীয় বীজাণু কেবলমাত্র লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে বেশী থাকে। সুসার্ণ ('আলফালফা') ক্লোভার জাতীয় গাছ, মটর, বীন, শিম জাতীয় গাছ, চীনাবাদাম, ক্রোটা লারিয়া, কটোপাইন গাছের শিকডগুলি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায যে গাছের শিকড় মাঝে মাঝে ফুলে উঠেছে। এরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে এনে শিকড়ে জমা করে। এই অংশে শতকরা ২'৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। যদি ধরা যায যে সুসার্ণ একরে ৪ টন উৎপন্ন হয তবে-এদের শিকড় থেকে ২০০ পাউণ্ড বা তার বেশী নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে। গাছ এই নাইট্রোজেনের সবটা বাতাস থেকে সংগ্রহ করেনি। এর কিছুটা গাছ মাটি থেকেও সংগ্রহ করে। কিন্তু তার পরিমাণ খুব কম। লেগুমিনাস জাতীয় গাছ ছাড়া অন্য গাছের শিকড বা দেহ থেকে এত বেশী নাইট্রোজেন পাওযা যায না। বারসীম লেগুমিনাস জাতীয় গাছ নয়। বারসীম গাছ থেকে একরে মাত্র ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে নডুল বীজাণু মাটি থেকে শতকরা ২৫ ভাগ নাইট্রোজেন এভাবে সৃষ্টি করে। তা হলে লুসার্ণ গাছ যে ২০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সৃষ্টি করে তার ১৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আসে বায়ু থেকে।



এ ভিন্ন মাটিতে আর একরকম নাইট্রোজেন জাতীয় সার বৃদ্ধি করা যায়,

যেমন যথেষ্ট পরিমাণ আবর্জনা সার যোগ করে। মাঠ থেকে যখন আমরা ফসল কেটে নিয়ে আসি তখন গাছের মাধ্যমে ও শস্তের মাধ্যমে মাঠ থেকে বহু পরিমাণ নাইট্রোজেন চলে আসে। কিন্তু মাঠে যদি গৃহপালিত পশুর জন্ম কোন ঘাস জাতীয় ফসল করা যায় তবে সেগুলি খেয়ে গৃহপালিত পশু, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর ইত্যাদি ভালভাবে বাড়বে। আর যে পরিমাণ সার মাঠ থেকে চলে গেছে তার শতকরা ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন সার এদের মলমূত্র ও গোয়ালে বিছানো খড়কুটা থেকে পূরণ করা যেতে পারে। এর ফলে দেখা যায় যে জমির উৎপাদিকা শক্তি একটুও কমে নি। বরং উত্তরোত্তর উর্বরতা বেড়ে যাবে—কৃষকও পশু বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ করবে কিংবা গাইয়ের দুধ বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সা পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে এভাবে চাষবাস হয় না কারণ ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও উপযুক্ত গোচারণ ভূমির অভাব। এই কারণে আমাদের দেশের কৃষকের সব সময় নজর থাকে কি করে কোন অর্থকরী ফসল বা খাদ্য জাতীয় ফসল মাঠে তৈরী করতে পাবে। ফলে বৎসরের পর বৎসর মাঠেতে একই ফসল তৈরী করে চলে। এতে বছরের পর বছর একই ফসল করার ফলে মাঠ থেকে একই জাতীয় সার হ্রাস পাচ্ছে। তার পূরণের আর কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। ফলে জমি আজ রিক্ত হয়ে আসছে।

ফসল ও সার—আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ মাঠে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে দুইটি ফসল করে—ধান ও গম। মাঠ থেকে যখন এই ফসল কেটে আনে তখন গাছের দেহের ও শস্যের মাধ্যমে মাঠ থেকে নাইট্রোজেন উঠে আসে। তারপর যখন ঐ শস্য বা খড়কুটা বিক্রী করে তখন পরোক্ষভাবে মূল্যবান নাইট্রোজেন বিক্রীত হয়ে চলে যায়। এর ফলে মাঠের যে ক্ষতি হলো তার কোন পূরণ হয় না। কেবলমাত্র মাটিতে গাছের যে গোড়া থাকে সেগুলি মাটির সহিত মিশে ও পচে কিছু পরিমাণ মাটিতে সার যোগ করে মাত্র। এই কারণে কৃষককে দুইটি পথ অবলম্বন করা উচিত—যথা, কৃষক পরিবারে উপযুক্ত পরিমাণ পশু

পালন করা এবং তাদের মলমূত্রাদি ভালভাবে রক্ষা করে এ থেকে আবর্জনা সার করা ও মাঠেতে উপযুক্ত সময় ছড়িয়ে দেওয়া। (২) অন্ততঃ চার বৎসরে একবার লেগুমিনাস জাতীয় সবুজ সার যোগ করা। কিন্তু আমাদের সমস্যা অনেক, পশুর গোবর জ্বালানি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হয় ফলে এটা নষ্ট হয়ে যায়। আর পশু মাঠে চরবার সময় যে সমস্ত মলমূত্র ত্যাগ করে সেগুলি ইতস্ততঃ পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকের উচিত এগুলিকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা। মাঠেতে ইতস্ততঃ পড়ে মূত্রগুলি নষ্ট হয়ে যাবে অথচ মলগুলি এক স্থানে সংগ্রহ করে আবর্জনা সার তৈরী করা কষ্টকর নয়।

আমাদের দেশের কৃষকের জমির পরিমাণ খুব কম। অনেকের কোন জমিই নাই। তারা অন্যের জমি ভাগে চাষ করে কিংবা অন্যের জমিতে মুনিষ খাটে। যাদের নিজস্ব জমি আছে তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত খাদ্য জাতীয় ফসল তৈরী করা। তার ফলে কৃষক প্রয়োজন মত ধান উৎপাদন করে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে পাট উৎপন্ন করে। সুতরাং তার পক্ষে একটি ফসল নষ্ট করে গৃহপালিত পশুর জন্য কোন ফসল করা বা মাটিতে সবুজ সার যোগ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া যেখানে কৃষক ভাগচাষী সেখানে মনিবের নির্দেশানুসারে কোন খাদ্য জাতীয় ফসল বা অর্থকরী ফসল করা ছাড়া উপায় থাকে না। এর একমাত্র উপায় যখন মাঠে খাদ্য জাতীয় অর্থকরী কোন ফসল রোপণ করা হয় তখন সেই মাটিতে সবুজ সারের বীজ কৃষকের রোপণ করা উচিত। তারপর উপযুক্ত ভাবে বেড়ে উঠলে ওটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

ধরা যাক একজন কৃষক ঠিক করলো যে একটি জমি থেকে ধান ও পাট উৎপন্ন করবে। সুতরাং সেই কৃষক জমিতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাট বীজ ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই কিছু শানহেম্প বা ধনচার বীজ ছড়িয়ে দেবে। এরা এক সঙ্গে বেড়ে উঠবে তারপর বর্ষার সময় হলে ধনচার গাছগুলি তুলে নরম মাটিতে পা দিয়ে চেপে দেবে। পরে যখন এই ক্ষেতে ধান হবে

তখন তার পরিমাণ যে বেশী হবে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। যদি মিশ্র ফসল করার অসুবিধা হয় তবে ক্ষেতের চারিপাশে সামান্য পরিমাণ স্থানে কেবলমাত্র ধনচার বীজ ছড়িয়ে দিলে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে এই গাছ ভালভাবে বেড়ে উঠবে এবং সময় মত মাটির নীচে চাষ দিলে চাষ দেওয়ার অসুবিধা হবে না। এতে মাঠের পরবর্তী ফসল নিশ্চয়ই বাড়বে।

দ্বিবিধ উপায়—যে কৃষক উপযুক্তভাবে পশুপালন ও উপযুক্তভাবে পশুর মলমূত্রাদি রক্ষা করেন তাকে মাঠের ফসল বাড়াবার জন্য সার কিনতে হয় না। কারণ নিজের প্রয়োজনানুযায়ী শস্য রেখে যদি খড়কুটা, মলমূত্রাদি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেন তবে তাতে যে কেবলমাত্র জমির উর্বরতা বাড়বে তা নয় তার আয়েরও পথ সুগম হবে। আমাদের দেশে প্রত্যেক কৃষক পরিবার গরু বা অন্য কোন পশু দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে মাটি চষে। কিন্তু দিন দিন ট্রাকটরের চাহিদা বাড়ছে। এই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আরও একটা উপায়ে মাটিতে কিছু নাইট্রোজেন যোগ হয়। বাতাসে শতকরা ৭৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। বর্ষার আগে কিংবা বর্ষা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ শিখা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময় আকাশে প্রচুর জলকণা থাকে। জল মধ্যকার হাইড্রোজেন (কারণ জল হলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ) ও বাতাসের মধ্যস্থিত নাইট্রোজেন এই বিদ্যুতের প্রভাবে মিলিত হয়ে এমোনিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথমে বাষ্প আকারে থাকে তারপর বৃষ্টির জলকণার সহিত মিশে মাটিতে পড়ে। এই নৈসর্গিক উপায়ে মাঠেতে কিছু এমোনিয়া যোগ হয়।

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব দেশে জমিতে রসায়নিক সার যোগ করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। কেবলমাত্র একক কোন রাসায়নিক সার মাঠেতে যোগ করা হয় না। অনেক কৃষক নিজেদের জমির মাটির সম্পূর্ণ

রসায়নিক বিশ্লেষণ করাণ ও জমিতে যে ফসল করবেন তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রাসায়নিক সার মিশ্রিত করে কিম্বা একের পরে আর একটি সময়ানুযায়ী সার যোগ করে থাকেন। এ ভিন্ন বাজারেও মিশ্র রাসায়নিক সার পাওয়া যায়। এই সমস্ত নাইট্রোজেন জাতীয় রাসায়নিক সারগুলিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) নাইট্রেট। অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত মিশে নাইট্রিক এসিড যে মিশ্র যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। যেমন, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি। (২) এমোনিয়া ও এমোনিয়ার সহিত প্রস্তুত মিশ্র পদার্থসমূহ। এগুলি আমাদের দেশে খুবই চল্‌তি। এদের মধ্যে প্রধান এমোনিয়াম সালফেট বা লবণ সার। একে বলা হয় "যাদুকরের যষ্টি"। (৩) ক্যালসিয়াম সায়নামাইড ও ইউরিয়া। ইউরিয়া অতি সহজেই তরল পদার্থে পরিণত হয়। সুতরাং আমাদের দেশে বর্ষাকালে অনেক সময় দেখা যায় সারের বোরা পড়ে আছে ভিতরে কোন সার নেই। এ ভাবে অতি সহজেই জলে মেশার ফলে মাঠেতে ছড়ালে জলের সঙ্গে বাইরে চলে যেতে পারে। (৪) গাছ ও জৈব সার।

বিভিন্ন সারে নাইট্রোজেনের ও অন্যান্য সারের পরিমাণ

	নাঃ	প্রাঃ ফঃ	পঃ
সোডিয়াম নাইট্রেট	১৬.০	—	—
সোডাপটাশ নাইট্রেট	১৫.০	—	১৫.০
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	১৫.৫	—	—
এমোনিয়াম সালফেট	২০.৫	—	—
তরল এমোনিয়া	২০.৬	—	—
এমোনিয়াম ফসফেট	১১.০	৪৮.০	—
এমোনিয়াম ক্লোরাইড	২৪.০	—	—

	নাঃ%	ফঃ%	পঃ
এমোনিয়াম নাইট্রেট	৩২.৫	—	—
ক্যালসিয়াম ছায়ানামাইড	২১.০	—	—
ইউরিয়া	৪২.০	—	—
এমোনিযাম ফসফেট নাইট্রেট	২৫.০	—	১৭
এমোনিযাম পটাসিয়াম ফসফেট	৫.৫	৫৪০	৩০
তুলা বীজ	৭.০	৩.০	৪.০
রেড়ির বীজ	৫ ৫	১.৫	১.৫
কোকো হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি	২.৫	১.০	২.০
তলানি সার (রসায়ানিক প্রক্রিযায় উদ্ভুত)	৬ ০	৩ ০	০.৫
তলানি সার (মলমূত্রাদি থেকে)	২.০	২.০	০.০
শাকসব্জীর তলানি সার	২.০	১.৪	১.৫
মাছের কাঁটা ও আঁইস	৯.৫	৭.০	০.০
মলমূত্রাদি থেকে প্রস্তুত তলানি সার (শ্লাজ)	২.০	২.০	০.০
পাখির বিষ্ঠা (বাদুড়)	8.৫	৫.০	১.৫
তামাকের ডাটা	২.০	০.৫	৬.০
হাড়ের গুঁড়া	২.৫	২৫.০	—
কালা মাটির উপরের পচাপাতা	২[illegible]	০.০	০.০
শুকনো রক্ত	১৩.০	২.০	[illegible]
গরুর শুষ্ক গোবর	২.০	১.১	২.০
পশমের টুকরো পচানি	৩.৫	০.৫	২.০
চিংড়ী মাছের খোলা পচানি	৭.০	৪.০	১.০
কদম বীজ পচানো	৭.০	১.৫	১.৫

সার ও জলবায়ু—স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর এদের ব্যবহার নিরূপিত হয়। এমোনিয়াম সালফেট আজ প্রায় সর্বদেশেসকল মাটিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছুটা সুবিধার জন্য ও কিছুটা ফলপ্রাপ্তির জন্য সারের মধ্যে এর স্থান সকলের উপরে। একে সারবিদেরা নাম দিয়েছেন "যাদুকরের যষ্টি"। সত্যই প্রায় সকল মাটিতে এদিয়ে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। তবে মাটিতে কিছু পরিমাণ জলকণা না থাকলে এমোনিয়াম সালফেট জলের সহিত মিশে গাছের গ্রহণোপযোগী হতে পারে না। কিন্তু নাইট্রেট জাতীয় সার গাছ খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারে। কারণ গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট আকারে। সুতরাং যদি মাটিতে কোন নাইট্রেট সার যোগ করা যায় তবে খুব সত্বরই সেটা গাছের গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সব থেকে অসুবিধা এই যে সকল নাইট্রেট জাতীয় সারগুলি অতি সহজেই জলের সহিত মিশে যেতে পারে ও মাঠ থেকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং একে মাটিতে ছড়িয়ে আমাদের মত বৃষ্টিবহুল দেশে অনেক সময়ই বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। তবে গাছ যখন বেড়ে ওঠে তখন মাটি খুঁড়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিলে (top dressing) ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় চাষীরা লাইন করে মাটিতে সার দিয়ে থাকেন। তবে যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এই সার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। ইউরিয়া অতি সহজেই জলের সহিত মিশে যায়। এমনি সাধারণ অবস্থায় একে ফেলে রাখলে বর্ষাকালে এর অস্তিত্ব থাকে না, ঠিক লবণের মত গলে যায়। সুতরাং আমাদের দেশের যে অঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এর ব্যবহার করে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। কারণ জলের সঙ্গে মিশে জলস্রোতে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবে।

ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড সবুজ গাছের সঙ্গে মাঠেতে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ এই জিনিষ মাটিতে সবুজ লতাপাতা পচতে সাহায্য করে ও মাটিতে ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করে। সে কারণে যে মাঠে সবুজ

সার করা হয় সেখানে গাছ মাটির তলায় চাপা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এই ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড মাটিতে ছড়ান যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মিশ্র সার—আজ কাল মিশ্র সার মাঠে ছড়ানোর রীতি হয়েছে। কেবল মাত্র কোন একটি সার দেওয়ার চেয়ে দেখা যায় যদি ২।৩টি রাসায়নিক সার মিশ্রিত করে মাটির প্রয়োজনানুযায়ী দেওয়া যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কেবলমাত্র একটি রাসায়নিক সার দিলে তাড়াতাড়ি সেই সার মাটির সহিত মিশে গাছের গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিন্তু যদি ২।৩টি রাসায়নিক সার একত্র মিশ্রিত করে দেওয়া যায় তবে একে অন্যকে খুব তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশতে দেয় না। সেই কারণে যদি কোন মাঠেতে একটিমাত্র নাইট্রোজেন জাতীয় সার যোগ করতে হয় তবে খুব যত্নসহকারে কোন্‌টি যোগ করা উচিত সে সম্বন্ধে মাটির আকৃতি ও প্রকৃতি, সেখানকার বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বিবেচনা করে নিরূপণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে সকল দেশেই প্রচুর গবেষণা চলছে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নাইট্রেট আকারে। অনেক জায়গায় মাঠে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে আবার মাঠে চূণ দিয়ে অম্ল মাটিকে নিরপেক্ষ রেখায় আনার জন্য এর সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট যোগ করে থাকেন। এদের মধ্যে সোডিয়াম নাইট্রেট সারটি খুবই প্রচলিত। সার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে একে কেবলমাত্র সোডিয়াম নাম দিয়ে থাকেন। দক্ষিণ-আমেরিকায় চিলি দেশে আণ্ডিজ পর্বতে প্রচুর সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। পাহাড়ের গা থেকে এই পদার্থগুলি নিয়ে এসে গুঁড়া করে মাঠে যোগ করবার মত অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেক দিন থেকে উত্তর-আমেরিকায় এর গবেষণা চলছে। আমাদের দেশেও এর প্রচলন বাড়ছে, কারণ গাছ একটু বেড়ে উঠবার পর মাটিতে ইহা যোগ করা খুব সহজ।

যে সমস্ত নাইট্রেট জাতীয় সার বাজারে পাওয়া যায় সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কোন মাটিতে অন্য যে কোন জাতীয় নাইট্রেট সার থেকে সোডা নাইট্রেট বেশী কার্যকরী। এর সঙ্গে যদি কোন এমোনিয়াম জাতীয় সার ও একটি জৈব সার মিশিযে দেওযা যায় তবে কেবলমাত্র সোডিযাম নাইট্রেট দিযে যে ফল পাওয়া যায় তার থেকেও বেশী সুফল পাওয়া যেতে পাবে।

সার প্রয়োগ—কিন্তু এটা ভুললে কিছুতেই চলবে না যে, যে কোন নাই-ট্রেট জাতীয সাব অতি সহজেই জলেব সহিত সহজ দ্রাব্য। সোডিয়াম নাইট্রেট মাটিতে ছড়িযে বিশেষ কোন ফল পাওযা যায না। তবে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে মাটিতে কোন অম্লতা নেই (alkaline) সেখানে যদি বছরেব পর বছর এই সার যোগ করা যায তবে জমির সোডিযামেব পরিমাণ বেশী হযে পডবে ও এর ফলে জমিব ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু আজও পর্যন্ত এমন কোন সঠিক ফল পাওযা যায নি। যখন গাছ মাটিতে শিকড় মেলে বেশ কায়েমী হযে বসে, অন্ততঃ অঙ্কুরোদ্গমের ১২।১৪ দিন পবে ও চারা গাছ পুঁতবার ঐ সময পরে, পুনরায অন্ততঃ ১৫ দিন পরে যদি এই সার জমিতে দেওযা যায, তবে অতি সত্বর এই সার গাছের অনুলোমের সংস্পর্শে আসে ও ব্যবহারের উপযোগী হয। অনেক সময এই নাইট্রেট—পটাশ, ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি গাছের খাদ্য জাতীয পদার্থের সহিত মিশে জমিতে পড়ে, এতে জমিতে ঐ সমুদয পদার্থের পরিমাণ একটু বাড়ে।

যখন জমিতে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সার দেওযা হয তখন এই নাইট্রেট সার অধিকাংশ বিষয়ে সোডিযাম নাইট্রেট-এর মত কাজ করে। তা বাদে এই ক্যালসিয়াম অনেক সময গাছের দরকার হয। কিন্তু সোডিয়ামের প্রয়োজন গাছের প্রায নাই বললেই চলে। তবে এই সারের বিশেষ অসুবিধা এই যে, এগুলি বাতাস থেকে খুব বেশী জলকণা আহরণ করে এবং একে জমিতে ছড়াবার সময় বিশেষ বেগ পেতে হয। তবে যদি খুব ভালভাবে একে কাগজের

প্যাকেটে প্যাক করা হয় তবে এইভাবে নষ্ট হওয়ার ভয় কম থাকে। কিন্তু একবার এই প্যাকেট খুললে তাকে আর ফেলে রাখা উচিত নয়।

এমোনিয়াম নাইট্রেটে সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। এতে খুব বেশী নাইট্রোজেন থাকে তার ফলে মাঠে সারের প্রয়োজন অতি অল্প হয়। ফলে খরচও কম পড়ে। এর মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে ৫০%। এমোনিয়া নাইট্রোজেন জলের সহিত মিশে এর বেশী ক্ষতি হতে পারে না। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এতে কোন ধাতব পদার্থ বা ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম থাকে না। তার ফলে একই মাটিতে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে মাটির অম্লতার পরিমাণ একটু বেড়ে যেতে পারে। পরে এই অম্লতা দূর করতে গেলে মাঠে চুণের ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ প্রতি ১০০ পাঃ এমোনিয়াম নাইট্রেটের জন্য ৫০ পাঃ চুণের দরকার।

এমোনিয়া জাতীয় নাইট্রোজেন—এমোনিয়া জাতীয় যত রকমের সার আছে তার মধ্যে প্রধান দুইটি—(১) এমোনিয়াম সালফেট ও (২) এমোনিয়াম ফসফেট। এমোনিয়াম সালফেট সার তৈরী করা হয় এমোনিয়ার সহিত সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে। আর এমোনিয়াম ফসফেট সার তৈরী করা হয় এমোনিয়া বাষ্পের সহিত ফসফরিক এসিড মিশিয়ে। আমাদের দেশে অবশ্য তরল এমোনিয়া মাটিতে ছড়ান হয় না। কিন্তু আমেরিকার কোন কোন অংশে তরল এমোনিয়া ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কোন ঢাকা পাত্রে এই তরল এমোনিয়া মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর কোন নালা দিয়ে বা কোন ফুটা পাত্রে করে (যেমন, বৈশাখ মাসে ঝারি করে অশ্বত্থমূলে জল দেওয়া হয়) ট্রাক্টর সহযোগে লাইনে ছড়ান হয়। মনে রাখতে হবে যে এই সার যদি কোন সবুজ গাছের উপর পড়ে তবে সে গাছ মরে যেতে পারে। মাটির উপরে ছড়াবার ফলে কিছু তরল এমোনিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

এমোনিয়াম জাতীয় বিভিন্ন সারের মধ্যে কোনটিতে কতটা নাইট্রোজেন

থাকে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১নং চার্ট দ্রষ্টব্য)। বাজারে যে সমস্ত সার বিক্রী হয় বা ঐ সমস্ত সার হাজার হাজার মণ তৈরী হয় সে সবগুলিতে ঠিক এই পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে না। কারণ বাজারে সারের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয় সে সবগুলিতে কিছু পরিমাণে ময়লা থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য সব সময়ই দেখা যায় যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সব সময়ই কিছু কম।

এই জাতীয় সারের সুবিধা এই যে, ইহা খুব তাড়াতাড়ি জলের সহিত মিশে মাটির নীচে ঢুকে যেতে পারে না। মাটিতে এমোনিয়াম সালফেট ঢেলে দেবার পর সাধারণতঃ সামান্য মাত্র জলের সহযোগে এমোনিয়াম সালফেট দুইভাগে বিভক্ত হয়। এমোনিয়া (NH_3) এবং (SO_4)। এমোনিয়ার কাজ হয় মাটির মধ্যে যে মিশ্র চুণ জাতীয় পদার্থ আছে তার থেকে ক্যালসিয়াম সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে বসে পড়া। এর ফলে যতদিন না বীজাণু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্র নাইট্রেট জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় ততদিন ইহা গাছের গ্রহণ উপযোগী হয় না। কিংবা জলের সহিত মিশে ধুয়ে যেতে পারে না। এটা নির্ভর করে মাটির নীচে কতটা তলায় সার দেওয়া হলো তার উপরে। আরও কয়েকটি বিষয়ের উপরও এই ক্রিয়া নির্ভর করে ; যেমন, মাটিতে জলকাদার পরিমাণ, জলসেচন, চুণ জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি। কারণ চুণ জাতীয় পদার্থ ইহাকে মাটিতে নাইট্রেট আকারে পরিণত হতে সাহায্য করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি সালফেট অব এমোনিয়া সারকে লাঙ্গলের ফলা যতদূর যায় সেই পরিমাণ মাটির নীচে দেওয়া যায় অর্থাৎ আনুমানিক ৩"—৪"র মধ্যে তবে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং উৎপাদিত শস্যও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

এমোনিয়াম সালফেটের প্রধান অসুবিধা ইহা মাটিকে উত্তরোত্তর অম্লতর করে তোলে অর্থাৎ প্রতি বৎসর যদি একই জমিতে এই সার ব্যবহার করা হয় তবে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রতি ১০০

পাঃ এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করার ফলে মাটিতে যে অম্লতা বৃদ্ধি পায় তার নিরসনের জন্য সেই পরিমাণ জমিতে মাটির অম্লতা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ১১০ পাঃ ক্যালসিয়াম কার্বনেট যোগ করতে হয়। মৃৎ-বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মাটিতে কোনরকমের অম্লতা নিবারক পদার্থ না দিয়ে যদি প্রতি বৎসর এই সার যোগ করা হয় তবে ফসলের পরিমাণ হ্রাস পাবে এমন কি একেবারে অনুর্বর মাটিতে পরিণত হতেও পারে।

এ বিষয়ে একটি জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। আমাদের দেশের কৃষকেরা বলেন যে, যে জমিতে বিলাতী সার (এমোনিয়াম সালফেট) ব্যবহার করা হয় সে জমিতে সে বৎসর ভাল ফসল পাওয়া গেলেও পরে ভাল ফসল হয় না। অনেকে বলেন প্রতি বৎসর ঐ সার না দিলে এবং সারের পরিমাণ না বাড়ালে উৎপাদন কমে যায়, কথাটা একরকম ঠিকই। কারণ আমাদের এই বাংলাদেশের ও ভারতের পূর্বাঞ্চলের মাটির অম্লতার পরিমাণ ৫ থেকে ৬ pH ইউনিটের মধ্যে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই মাটি একটু অম্ল কারণ ৭—৭.৫ ইউনিট হলো নিরপেক্ষ রেখা। আর এক এক ইউনিট ১০ গুণ অম্লতা বৃদ্ধি ও কমতি নির্দেশ করে। তাই যে মাটির pH ইউনিট ৬ সেই মাটিতে ১০ গুণ অম্লতা বেশী। আর যে মাটির অম্লতার পরিমাণ pH ইউনিট ৫ সে মাটির ১০০ গুণ অম্লতা বেশী।

সুতরাং আমাদের এই অঞ্চলের মাটিতে অম্লতার পরিমাণ একটু বেশী। এই অবস্থায় যদি বৎসরের পর বৎসর এমোনিয়াম সালফেট যোগ করা হয় তবে মাটিতে আরও অম্লতা বেড়ে যাবে। এক একটি ফসল এক একটি বিশেষ অম্লযুক্ত মাটিতে ভাল হয়। সুতরাং যে মাটির pH ইউনিট এখন ৫.৬ সেখানে ভাল ধানের ফসল পাওয়া যাচ্ছে। ২।৩ বৎসর পর পর কোন রকম চুণ না ছড়িয়ে সেই মাঠে যদি বেশী মাত্রায় এমোনিয়া সালফেট ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সেই মাটির pH ইউনিট কমে যাবে এবং সেই অম্লতায় ভাল ধান জন্মিবে

না। এর ফলেই কৃষক বলেন যে, প্রথম বৎসর জমিতে ভাল ফসল পাওয়া গেলেও পরে আর ভাল ফসল পাওয়া যাবে না।

এই যে সমস্যা এটা আদৌ দূরপনেয় নয়। পরিমাণমত চুণ মাঠে ছড়ালে ফসলের মাত্রা বেড়ে যাবে। কিন্তু যে মাটিতে অম্লতা কম বা লোনার পরিমাণ বেশী সেখানে এর ব্যবহার ঠিক নহে। সেখানে মাটিতে গন্ধক ছড়াতে হয়। এর ফলে মাঠের লোনা অংশের হ্রাস পায়।

আমাদের প্রথমেই জানা উচিত কোন্ পদার্থের কি দাম? কারণ কৃষক জমিতে সার দিতে গিয়ে প্রথমেই খতিয়ে দেখবে যে কোন্ সারটার কত দাম। এমোনিয়াম সালফেট দামেও সস্তা ও ব্যবহার করাও সুবিধাজনক। তার ফলে কৃষককে মাঠে চুণ দিতে হলেও কৃষক জমিতে এই সারই দিবে।

বাজারে যে সমস্ত এমোনিয়া জাতীয় সার পাওয়া যায় তার মধ্যে সব থেকে কম দাম এমোনিয়ার। কারণ যখন কয়লা থেকে জ্বালানি গ্যাস তৈরী করা হয় তখন বাড়তি পাওনা হিসেবে (by-product) এই তরল এমোনিয়া পাওয়া যায়। তা ছাড়া বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেন যদি বিদ্যুতের সংস্পর্শে পোড়ান যায় তবে তা থেকে এমোনিয়া পাওয়া যেতে পারে। এই এমোনিয়ার সহিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন মিশ্র পদার্থ তৈরী করে মাঠে ছড়ান যায়।

ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড—ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড নামক মিশ্র সারে যে নাইট্রোজেন থাকে সেই নাইট্রোজেন পাওয়া যায় বাতাস থেকে। লাইমষ্টোন (চুণ জাতীয় পদার্থ) ও কয়লা সংমিশ্রণে এটা প্রস্তুত হয়। এই সার জমিতে ছড়ালে প্রথমতঃ ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পাবে, দ্বিতীয়তঃ, ছায়ানোজেন প্রভাবে জমিতে বীজাণুক্রিয়া বেড়ে যাবে। চাষের পূর্বে যখন মাটি খোঁড়া হয় তা ছাড়া যখন জমিতে ঘন ঘাস ইত্যাদি আগাছা থাকে তখন এই সার দিলে মাটির বিশেষ উপকার হয়। ক্যালসিয়াম

প্রভাবে মাটির অম্লতা হ্রাস পাবে তা ছাড়া যে সমস্ত আগাছা জমিতে থাকে কিংবা যে সমস্ত ঘাস লাঙ্গল দেওয়ার ফলে মাটি চাপা পড়ে সে সবগুলি এই রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে মাটির নীচে পচে গিয়ে ভাল সবুজ সারের সৃষ্টি করে। মাটিতে বীজ বপন বা কোন চারাগাছ লাগাবার অন্ততঃ ১০।১২ দিন আগে এটাকে জমিতে ছড়ান উচিত। কারণ যতদিন ছায়নামাইড থেকে ইউরিয়া সৃষ্টি না হয় ততদিন পর্যন্ত ছায়নামাইড ক্ষতি করে। মাঠে যথেষ্ট পরিমাণ রস বা জলকণা বা জল না থাকলে ছায়নামাইড থেকে এমোনিয়া সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যে মাঠে প্রচুর জল নেই সেখানে এই সার দিয়ে যদি বীজ ছড়ান হয় তবে সে বীজ নষ্ট হতে পারে। সে জন্য যখন সবুজ সার তৈরী করতে গিয়ে লেগুমিনাস জাতীয় কোন গাছই হোক বা নন্-লেগুমিনাস জাতীয় গাছই হোক লাঙ্গলের ফলা মুখে যখন মাটির নীচে দেওয়া হয় তখন যদি এই সার প্রচুর পরিমাণে ছড়ান যায় তবে গাছের পচনক্রিয়ায় বিশেষ সহায়তা করে। জমিতে প্রচুর ঘাস থাকলে একবার মাত্র লাঙ্গল দিয়ে যদি এই সার ছড়ান যায় তবে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কারণ এই সার ঘাসগুলিকে মেরে ফেলতে সাহায্য করবে। আগাছা মারবার জন্য এর ব্যবস্থা খুবই চলতি। এতে এদের নাইট্রোজেনের পরিমাণ একটুও কমে না। এই কারণে সকালবেলা যখন মাঠে শিশিরকণা পড়ে তখন এই রাসায়নিক সার ছড়ালে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ইউরিয়া—ইউরিয়া নামক অজৈব বা রাসায়নিক সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুব বেশী। ইহা দেখ্‌তে সাদা। মাটিতে ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় এমোনিয়া, সুতরাং ফল প্রায় এমোনিয়ার অনুরূপ। এ দিয়ে মাটির অম্লতার পরিমাণ একটুও বাড়ে না। কিন্তু সব থেকে বড় কথা এ দিয়ে মাঠে নাইট্রোজেন ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয় না। কতকটা এমোনিয়াম নাইট্রেটের মত। এ থেকে নাইট্রোজেন ভিন্ন আর কিছুই মাঠে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া এটা যখন খোলা বস্তাতে থাকে তখন বাতাস থেকে জলকণার প্রভাবে গলে যায়।

জৈব নাইট্রোজেন—প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ থেকে যে সার পাওয়া যায় সাধারণতঃ তাকে জৈব সার বলা হয় ; এই সারের মধ্যেও নাইট্রোজেন থাকে। এই নাইট্রোজেনকে জৈব নাইট্রোজেন বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রাণীদের মল-মূত্রে ও পশুপাখির বিষ্ঠায় নাইট্রোজেন থাকে। মাছের শক্ত আঁইস, যেখানে পশু ও পাখী কাটা হয় সেখানকার আবর্জনা ও রক্তে, বিভিন্ন তৈলবীজে, যথা, তুলাবীজ, রেড়ির বীজ, সরিষার খইল ও তিসির বীজ প্রভৃতি তৈল জাতীয় বীজ থেকে তৈল পিষে নেওয়ার পর যে সমস্ত খইল জাতীয় পদার্থ থাকে সেই সকল পদার্থেও নাইট্রোজেন থাকে। এর একটা তালিকা পূর্বে দেওয়া হইযাছে। খইলের ব্যবহার আমাদের দেশের চাষীদের কাছে একটুও আধুনিক নয়। কারণ শীতকালে যে সমস্ত শাকসব্জী উৎপন্ন করা হয় সে সমস্ত সব্জী জাতীয় ফসলের জন্য সব সময়ই খইলের ব্যবহার হয়ে আসছে। এদিয়ে জমির কোন ক্ষতি হয় না। তবে এতে নাইট্রোজেন বা ফসফরাস খুব কম মাত্রায় থাকে।

অবশ্য প্রয়োজনীয় অল্পপরিমাণ অবস্থিত সার—কৃষকদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি বেশ দানা বেঁধে আছে যে যদি গাছপালা পচান সার ও প্রাণিদেহ হইতে নির্গত বা জাত সার জমিতে দেওয়া যায় তবে যে কেবলমাত্র জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা নয় ইহার উর্বরতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এতে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ থাকে যাহারা মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গাছকে সাহায্য করে। আর এর মধ্যে কতকগুলি ধাতব পদার্থ থাকে। মাটিতে এদের প্রয়োজন অতি অল্পই এবং অতি অল্প পরিমাণে থাকে। কয়েক পি. পি. এম. অর্থাৎ তার দশলক্ষ ভাগে ১ থেকে ৫ অংশ মাত্র। কিন্তু এদের প্রযোজন আছে, যেমন বোরণ, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার, ক্লোরিণ, মলিবডিনাম ইত্যাদি। পরে এদের বিশদ আলোচনা করা হবে। এই জাতীয় প্রাণিজ সার বা জৈব সার মাটিতে

ছিটিয়ে না দিয়ে যদি লাইন করে দেওয়া যায় তাহলে আরও বেশী ফল পাওয়া যায়।

কৃষককে জমিতে সার দিতে গিয়ে কয়েকটি জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ, নাইট্রোজেনের দাম বেশী হবে না। অনেক সময় সারের দাম কম কিন্তু তাতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তার পরিমাণ কম হওয়ায় জমিতে সারের পরিমাণ বেশী লাগে। ফলে যেমন দাম বেশী পড়ে যায় তেমনি ছড়াতে বা লাইনে সার দিতে খরচ বেশী হয়। অনেক সার আছে দামে বেশী কিন্তু মাটির প্রয়োজন কম হয় কারণ তাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী। এ বিষয়ে সব দেশের কৃষকেরা ওয়াকিবহাল হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, যে সার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে একটু অসাবধান হলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে সে সার কৃষক জমিতে ঢালতে দ্বিধা করে। যেমন ইউরিয়া অতি সাধারণ অবস্থাতে বাতাস থেকে জলকণা টেনে নিয়ে কাদামাটির আকার নেয়। এতে এই সার কোন মাটির সহিত না মিশিয়ে বা জলে না মিশিয়ে ছিটালে এক জায়গায় বেশী পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে ঠিকভাবে সার ছিটান যায় না। তৃতীয়তঃ, মাটিতে সার ছিটানোর সুবিধা। চতুর্থতঃ, ক্ষেতের মাটির আকৃতি, প্রকৃতি, উচ্চতা ইত্যাদি অনুযায়ী মাঠে শস্যোৎপাদন। এই সমস্তগুলি বিশেষ বিবেচনা করে কৃষক মাঠের জন্য সার নির্বাচন করবেন। নাইট্রোজেন জাতীয় সব সারই কোন না কোন দেশে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাটি ও বীজাণু (Soil and Bacteria)

বীজাণু ক্রিয়া—একটি বিশেষ কোন মাটির উৎপাদিকা শক্তি সেই মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থ থাকার উপর নির্ভর করে এটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত বীজাণু মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে তারা এই কার্বন জাতীয় পদার্থ থেকে খুব বেশী খাদ্য পায় ও তাদের বংশ বৃদ্ধি করতে সুবিধা হয়। এই বীজাণুগুলি অতি ক্ষুদ্র যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থগুলি মাটিতে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাত্র ১ গ্রাম মাটিতে কয়েক লক্ষ বীজাণু আছে। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ বীজাণু ব্যাকটিরিয়া, শতকরা ৯ ভাগ একটিনোমাইসিস ও শতকরা ১ ভাগ অন্য কোন জাতীয় বীজাণু।

মৃত্তিকা সংরক্ষণে কার্বন জাতীয় পদার্থ বৃদ্ধি পেলে বীজাণু ক্রিয়া (bacterial activity) বৃদ্ধি পায়। মাটিতে গাছপালা, লতাপাতা পচে ও তাহাতে বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি হয়। এই কারণে কোন জমির শস্যোৎপাদনের প্ল্যান করবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে কি প্রকারে মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থ বৃদ্ধি করা যায়। এর জন্য তিন বৎসরেই হউক, বা চার বৎসরেই হউক, নিশ্চয়ই একবার মাটিতে সবুজ সার বা উদ্ভিজ্জ সার দেওয়া উচিত। এতে কেবলমাত্র মাটিতে বীজাণুর বৃদ্ধি হয় না, সমস্ত গাছের পাতায় ও ডালে যত রাসায়নিক পদার্থ থাকে সেগুলি মাটিতে মিশে যায়।

মাটির নীচেকার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজাণুর চালচলন জানতে গেলে তাদের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা দরকার। এরা এত ছোট যে অনেক সময়

সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই বীজাণু গোষ্ঠীর উপর মাটির উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে। এদের কয়েকটির সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। আরও কয়েকটির সম্বন্ধে আজও ভালভাবে কিছু জানা যায় নি।

ব্যাকটিরিয়া—মাটিতে যে সমস্ত বীজাণু আছে তাদের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া (bactεrια) প্রধান। যদি উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পায় তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি মাত্র বীজাণু কয়েক শত বীজাণু সৃষ্টি করতে পারে। যদি মাটি অম্ল-রসাত্মক (এসিডিক) অর্থাৎ pH ইউনিট ৫ এর নীচে থাকে এবং মাটিতে পরিমাণ ম ত কাবন জাতীয় পদার্থ থাকে তবে সেখানে যে বীজাণু বৃদ্ধি পায় তাকে ফাঙ্গাস (fungus) জাতীয় বীজাণু বলা হয়। যেখানে খুব বেশী জলীয় আবহাওয়া ও মাটিতে প্রচুর জল থাকে না, সেখানে এলগি (algae) বৃদ্ধি পায় না। এদের প্রাদুর্ভাব হয় ছায়াঞ্চলে স্যাঁৎসেঁতে স্থানে।

মাটিতে সার দেওয়ার পর মাটিতে একটিনোমাইসিস্ জাতীয় বীজাণু বৃদ্ধি পেতে পারে। মাইক্রোকক্কাস সাধারণতঃ বেশী থাকে না। এক একটি বীজাণু এক একটি বিশেষ আবহাওয়ায় ভালভাবে বেড়ে উঠে। সেই কারণে নডুল জাতীয় বীজাণুর বৃদ্ধির জন্য সাধারণতঃ পীট জাতীয় মাটির প্রয়োজন। ইহাকে উত্তাপ দিয়ে গরম করবার পর নডুল জাতীয় বীজাণু বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কারণ এই জাতীয় বীজাণুর একটি বিশেষ ধর্ম হলো বাতাস থেকে N_2 সংগ্রহ করা।

প্রোটোজোয়া—এভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন রকমের ক্ষুদ্র কীট থাকে (Protozoa), এগুলিকে প্রাণী বলা যেতে পারে। মাটির মধ্যে যে অনবরত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার একটি কারণ যে মাটিতে অসংখ্য প্রোটোজোয়া (protozoa) আছে। লতাপাতা পচা কোন স্থানে যদি একটি মাত্র প্রোটোজোয়া পড়ে তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইহা এক থেকে একলাখে পরিণত হয়। যদি কোন গোবর সারে এই প্রোটোজোয়া পড়ে তবে অতি সত্বর সেখানকার অন্যান্য বীজাণু খেয়ে ফেলবে ও প্রোটোজোয়ার সংখ্যা কয়েক

মিলিযনে (১০ লাখে এক মিলিযন) পরিণত হবে। যখন প্রোটোজোযার সংখ্যা অনেক বেশী হযে যায ও খাদ্যের অভাব পড়ে তখন প্রোটোজোযারা মরে যায় ও সেই সময়ে বহু একটিনোমাইসিস্ ও অন্যান্য বীজাণু বেড়ে উঠবার সুবিধা পায।

এক গ্রাম (gram) মাটির মধ্যে ১০ লাখের উপর ব্যাকটিরিযা (bacteria) থাকে। এর থেকে কিছু পরিমাণ ফাঙ্গাস (fungus) ও এলগি (algae) এবং ২৫ থেকে ৩০ হাজারেব উপর একটু বড় বকমের প্রোটোজোযা থাকে। এদের মধ্যে যেগুলি একটু বড় ও লম্বা ধরণের তাদেব দেহের পরিমাণ চওড়া ১ মিলি মাইক্রোণ ও লম্বা এর দেড থেকে দুই গুণের মধ্যে। ধরে নেওযা যাক কোন সাধাবণ মাটিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে। অর্থাৎ লাঙ্গলের ফলা মাটির মধ্যে যতটা নীচে যেতে পারে সেই পরিমাণ এক একর জমিতে ৫০ টন জৈব পদার্থ (organic matter) পাওযা যাবে। কারণ ৬ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর এক একর জমির মাটির ওজন ২,০০০,০০০ মিলিযন পাউণ্ড। অনুপাতে হিসাব কবে রাসেল দেখিযেছেন যে, এক গ্রাম পরিমিত মাটিতে ৩০০ কোটির অধিক মৃত কোষ (cell) আছে। জীবন্ত অবস্থায এদের ওজন ৩ মেট্রিক টনের সমান। এদের শুষ্ক অবস্থায ওজন ১৩০০ পাউণ্ড হবে এবং এদের মধ্যস্থিত নাইট্রোজেনের ওজন হবে ১৩০ পাউণ্ড। পবীক্ষা করে আরও দেখা গেছে যে, উপরে যে শুষ্ক দেহের ওজন দেওযা হযেছে অর্থাৎ ১৩০০ পাউণ্ড এর শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বীজাণুদিগের কোষের ওজন।

এই যে সমস্ত বীজাণু গোষ্ঠীর আলোচনা করা গেল এরা মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ভিন্ন হাজারো বকমের বীজাণু মাটিতে পাওয়া যায়। সেগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয নয। যে সমস্ত বীজাণু মাটিকে অনবরত পরিবর্তিত করছে তাদের দেহের রাসাযনিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায যে তাদের দেহের শতকবা ১০ ভাগ N_2, ৪ ভাগের উপর

ফসফরাস (P_2O_5) এবং শতকরা ২ ভাগেরও উপরে থাকে পটাশ (K_2O)। এ ভিন্ন এদের দেহেতে আছে ক্যালসিযাম (Ca), ম্যাগনেসিযাম (Mg), লৌহ (Fe), সোডিয়াম (Na), সালফার ট্রাযক্সাইড (SO_3), এগুলির পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম।

বীজাণুর কাজ—বীজাণুর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, মাটিতে যে সমস্ত জৈব পদার্থ (organic matter) আছে বিশেষতঃ গাছের গোডা বা শিকড, শস্যাদির খড ও পাতা বা যদি মাটিতে কোন সবুজ সার যোগ করা হযে থাকে তবে তাদের পচন ক্রিযার সহাযতা করা। এদের আক্রমণের ফলে মাটিতে যে পচন ক্রিযা সুরু হয সেগুলি বিভিন্ন পর্যাযে চলে। এই সমস্ত পচন ক্রিযা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক আবহাওযার উপর। এর জন্য প্রযোজন প্রথমতঃ জল ও দ্বিতীযতঃ উত্তাপ। জলের সাহায্যে এদের কাজ সুরু হয় তারপর পচন ক্রিযা বৃদ্ধি হয অক্সিজেনের সাহায্যে। এরপরে অক্সিজেনের (O_2) পরিমাণ হ্রাস পায ও সুরু হয অন্য ক্রিযা। সর্বশেষে বায়ু, উত্তাপ ও পরিমাণ মত জলের প্রভাবে মাটিতে নানা ধাতব বা অজৈব পদার্থের অক্সাইড, নাইট্রিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিড সৃষ্টি করে। এই বীজাণু ক্রিযার ফলে মাটিতে যে প্রধান ও অপ্রধান ধাতব পদার্থ আছে তাহারাও পরিবর্তিত হয ও সেই সমস্ত ধাতুর কার্বনেট, বাইকার্বনেট ও সালফেটের সৃষ্টি করে।

এরোবিক ও এনারোবিক বীজাণু—উপরে যে সমস্ত বীজাণুর আলোচনা করা গেল এরা সকলে জল ও বাযুর সাহায্যে বৃদ্ধি পায় ও মাটিতে নানাপ্রকার পরিবর্তন নিযে আসে। এই বীজাণুগুলিকে বলা হয় এরোবিক (aerobic)। এভিন্ন মাটিতে আর এক জাতীয় বীজাণু আছে যারা সেখানে বায়ু না পেয়েও বংশ বৃদ্ধি করে। এইগুলিকে বলে এনারোবিক জাতীয় বীজাণু। যদি মাটিতে দুই পরমাণুর অন্তবর্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও একটু জলকণা

থাকে তবে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা ক্রিয়ার খুবই সহায়তা হয়। আরও এক রকমের বীজাণু আছে যারা মাটির উপরের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন (N_2) টেনে নিয়ে নিজে খায় ও মাটিকে সমৃদ্ধ করে। মাটিতে বীজাণু পরিবর্তন আনে কিন্তু এর জন্য অনুকূল আবহাওয়া দরকার। এক এক রকমের বীজাণু এক একটি বিশেষ আবহাওয়াতে বেড়ে ওঠে বা বংশবিস্তার করে। নৌকা যেমন অনুকূল আবহাওয়ায় ছুটে চলে বীজাণুও তেমনি অনুকূল আবহাওয়ায় লক্ষাধিক বংশ বৃদ্ধি করে। অনুকূল আবহাওয়া বলতে সাধারণতঃ জল, বায়ু ও উত্তাপকে বুঝায়। এদের কম বেশীর উপর বিভিন্ন বীজাণুর ক্রিয়ার পরিমাণ নির্ভর করে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উদ্ভিজ্জ বস্তুর সহিত সক্রিয় বীজাণুর সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এখন আমরা অজৈব বা ধাতব পদার্থের সহিত বীজাণু কিভাবে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি। মৃৎবিজ্ঞানীরা বলেন, অজৈব পদার্থের বহির্দেশে প্রচুর কোষ থাকে। আর এই কোষ থেকে মাঝে মাঝে এনজাইম (enzyme) বেরিয়ে আসে। এই এনজাইম (enzyme) এর সাথে বীজাণু মিশ্রিত হয়ে সেই কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

এই ধাতব কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে, বীজাণু তাকে শক্তি দেয় ও বাড়তে সাহায্য করে। সাধারণতঃ প্রাণীরা যেভাবে খাদ্য হজম করে সেই রকম খাদ্য প্রস্তুতির পর গাছ ও দেহের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয়। তারপর কোন একটি জিনিষের কাজ মিটলে বা বেশী হয়ে গেলে অব্যবহৃত জিনিষ বার করে দেয় আর যে সমস্ত জিনিষ গাছ হজম করতে পারে না সেগুলি লিগনিণ ইত্যাদির আকারে গাছের অংশ হিসাবে রয়ে যায়।

গাছ নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য খেয়ে পুষ্টিলাভ করে। আর গাছ এই নাইট্রোজেন মাটি থেকে সংগ্রহ করে। মাটি সেটা সংগ্রহ করে জৈব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, "গাছে গাছ খায়"। এটা যেন ঠিক মাছে মাছ খাওয়ার মত। সাধারণতঃ গাছের সকল অংশে প্রোটিন

থাকে। এই প্রোটিনের মধ্যে থাকে নাইট্রোজেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় কেমন করে নাইট্রোজেন প্রোটিনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে।

নাইট্রোজেনের রূপান্তর—যখন এই জৈব পদার্থ বা লতাপাতা মাটিতে পচতে থাকে তখন এই থেকে যে নাইট্রোজেন বেরিযে আসে তা দিযে এমোনিযার স্ৃষ্টি হয, প্রোটিন থেকে সোজাসুজি আমরা নাইট্রোজেন পেতে পারি না। প্রোটিন থেকে নাইট্রোজেন বেরিযে আসে তিনটি ধাপে। প্রথমে পচন ক্রিযা সুরু হওয়ার সাথে সাথে নানা বীজাণু (bacteria), একটিনোমাইসিস্ ও ফাঙ্গাস ভীষণভাবে কাজ সুরু করে দেয। এর ফলে জল ও কার্বন ডায-অক্সাইড তৈরী হয। এই জল প্রোটিনের সহিত রাসাযনিক ক্রিযা করে এবং এমাইনো এসিড (Amino Acid) স্ৃষ্টি করে। এই এমাইনো এসিড থেকে তৈরী হয এমোনিযা (NH_3), কার্বন ডায-অক্সাইড (CO_2), জল মিথেন্ (CH_4) ও হাইড্রোজেন সালফাইড। এই ভাবে এই এসিড ও অন্যান্য পদার্থগুলি মাটির সহিত মিশে গাছের পুষ্টিসাধন করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয নাইট্রোজেন গঠন পদ্ধতি (Nitrification)।

মৃৎবিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন, নাইট্রেট আকারে জলের সহযোগে গ্রহণ করে। একটু ঘুরিযে বললে দাঁড়ায় যে গাছ মাটি থেকে কোন ধাতব নাইট্রেট (খুব সম্ভবতঃ ক্যালসিযাম নাইট্রেট) গ্রহণ করে।

দুই বিভিন্ন দলীয বীজাণু (Species) দ্বারা মাটির মধ্যে রাসাযনিক প্রক্রিযা চলে ও মাটির মধ্যকার নাইট্রোজেন এমোনিযাম নাইট্রেট আকারে পরিবর্তিত হয। এদের একটির নাম নাইট্রোসোমোনস (Nitrosomonos), অপরটির নাম নাইট্রোব্যাকটর (Nitrobactor)। বিভিন্ন বীজাণু ক্রিয়ার মধ্য দিযে সর্বশেষে ক্যালসিযাম নাইট্রেট, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থগুলি পাওযা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে

মাটিতে চুণের মধ্য দিয়ে ক্যালসিয়াম যোগ করলে ক্যালসিয়াম অকসাইড তৈরী হয়। যদি মাটিতে চুণ যোগ করা না হয় তবে নাইট্রিক এসিড তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি অতি মন্থর হয়ে পড়ে। এই বীজাণু-ক্রিয়া সুসম্পন্নের জন্য জলবায়ু ও উত্তাপ বিশেষ দরকার। যদি বায়ুর উত্তাপ ৮০° ফা. নীচে নামে তবে এই বীজাণু-ক্রিয়ার গতি কমে গিয়ে অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়। যদি উত্তাপ বেড়ে ৯০° ফা. ওঠে তবে বীজাণু-ক্রিয়ার সামান্য বৃদ্ধি হলেও বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। ধীরে ধীরে ক্রিয়ার গতি কমে আসতে থাকে। এমোনিয়াফিকেশন (এমোনিয়া গঠন প্রণালী) ও নাইট্রিফিকেশন (নাইট্রোজেন গঠন প্রণালী)-র কাজ পুরামাত্রায় চলে যদি মাটির জল-ধারণ করার ক্ষমতার ⅔ অংশ জল সেখানে থাকে। মাটিতে যদি অজৈব পদার্থ বেশী থাকে তবে নাইট্রেট নাইট্রোজেন সৃষ্টির ব্যাঘাত হবে।

আমাদের দেশের নীচু জমিতে ধান হয়। এর উৎপাদনের পরিমাণ একরে ১৩০০ পাঃ থেকে ১৫০০ পাঃ পর্যন্ত। জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে কেবল মাত্র অজৈব সার দিলে ভাল ফসল পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের জমিতে একরে ১০০০ পাঃ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। ক্ষেতের ফসল বাড়াতে গেলে এর থেকে আরও বেশী নাইট্রেট নাইট্রোজেন দরকার। সেখানে মাঠে কোন সবুজ সার দিয়ে যদি ক্ষেতে ৫০ পাঃ নিয়মে মাটিতে অজৈব সার দেওয়া যায়, তবে মাটি থেকে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে। এর জন্য প্রয়োজন মাটিতে সর্ব প্রথমে অজৈব সার দেওয়া। কারণ প্রথমটি না হলে পরবর্তীগুলির কোন কাজ হয় না। প্রথমটির সম্পাদন হলেও দ্বিতীয়টির জন্য জল প্রয়োজন হয় কিংবা মাটি যদি এসিডিক হয় বা pH ইউনিট ৫·০ এর নীচে নামে তবে চুণ দিতে হয়।

এখন দেখা যাক কি প্রকারে গাছের শিকড় বায়ু থেকে N_2 টেনে নিয়ে আসে। দুটি উপায়ে মাটিতে N_2 বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টির জলকণার সহিত আকাশ থেকে এমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়ে মাটিতে পড়ে। দ্বিতীয়টি শস্যোৎপাদনের ফলে গাছের শিকড় ও পাতা ইত্যাদি মাটিতে পচে মাটির N_2 বৃদ্ধি করে। এই যে দুটি উপায়ে মাঠে N_2 বৃদ্ধি হয় এর দ্বারা একরে ২ থেকে ৫ পাউণ্ডের বেশী সার যোগ হয় না। প্রতি বৎসর জমির উপর দিয়ে জল চলাচলের ফলে এবং ক্ষেতে উৎপন্ন মাটি থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় শস্য খাদ্য টেনে নেওয়ার ফলে মাটিতে এই জাতীয় পদার্থের অভাব অনুভূত হয়। বৎসরে যতটা পরিমাণে নাইট্রোজেন মাঠ থেকে চলে যায় ঠিক ততটা পরিমাণ এই জাতীয় সার মাঠে বৎসরে যোগ হয় না। এই সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ হ্রাস পাওয়ার ফলে জমি প্রতি বৎসর উর্বরতা হারিয়ে ফেলছে। যে সমস্ত গাছ লেগুমিনাস জাতীয় তাদের শিকড় মাটিতে বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নেয় এবং শিকড়ে ফুলে ওঠা স্থানে জমা করে রাখে। পরে তাদেরকে কেটে ফেললে, শিকড়গুলি মাটির মধ্যে থেকে যায় ও এর দ্বারা মাঠে নাইট্রোজেন বাড়ে। আরও ভাল হয় যদি এই লেগুমিনাস জাতীয় গাছগুলি পূর্ণতা পাওয়ার আগেই চষে মাটিতে মিশান যায়। কারণ তাতে তাদের দেহে যে নাইট্রোজেন থাকিবে সেগুলিও মাটিতে মিশে যাবে।

এই জাতীয় গাছের শিকড়ে নডুল বীজাণু থাকে, এদের কাজ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে এসে শিকড়ে নানা স্থানে জমা করা। এরা না থাকলে গাছ, যদি কোন জৈব পদার্থ মাটিতে থাকে তবে সেখান থেকে নাইট্রোজেন টেনে বার করে। সুতরাং কোন মাঠের ফসলোৎ-পাদনের প্ল্যান করতে গিয়ে দেখা উচিত কোন জাতীয় বীজাণু মাঠে বেশী আছে। যদি নডুল বীজাণু মাঠেতে না থাকে তবে এই জাতীয় বীজাণু

কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করে তার মধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের সুবিধা করে দিলে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

নডুল জাতীয় বীজাণু শুষ্ক আবহাওয়ায় (Symbiotic) গড়ে উঠে, এতে দুরকমের বীজাণু থাকে 'লেগুম' ও 'নডুল'। লেগুমগুলির দ্বারা শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয় আর নডুল বীজাণুগুলি এগুলি খেয়ে পুষ্টিলাভ করে। এদেরও আবার ভাগ আছে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর লেগুম বীজাণু কেবলমাত্র কোন একটি নডুল বীজাণুর সহযোগে বাড়তে পারে।

নিম্নে একটি লেগুমিনাস জাতীয় গাছের ভাগ দেওয়া গেল।

(১) আলফালফা (লুসার্ণ), মিষ্ট ক্লোভার।

(২) লাল, ফিকে লাল, সাদা ও মামথ ক্লোভার।

(৩) বুনো ও মেঠো মিষ্ট কলাই জাতীয় গাছ।

(৪) নানা রকমের বরবটী জাতীয় গাছ ও ফরাসবিণ।

(৫) কাউপীজ, সিম্, বাদাম, লেসপেডেজা ও ক্রোটালিরিয়া।

ননসিমবায়োটিক পদ্ধতি—আর একটি পদ্ধতি আছে যেটাকে বলে নন্‌সিমবায়োটিক অর্থাৎ জলের সহযোগে যেখানে বীজাণু অতি সত্বর গড়ে উঠে। এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান বীজাণু হলো এজোটোব্যাকটার (Azotobacter) এবং স্পিসিজ—এজোটোব্যাক্টর ক্রো কক্কাস। এদের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এজোব্যাক্টর তিন সপ্তাহের মধ্যে এক একর জমিতে ২০০ পাঃ নাইট্রোজেন সৃষ্টি করতে সক্ষম। এরা বৃদ্ধি পায় শর্করা জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে। প্রাপ্তিযোগ্য ফসফেট ও ৮০°-৯০° ফাঃ উত্তাপ ও মাটিতে তাহার গ্রহণযোগ্য ⅔ অংশ জল থাকলে খুব বেশী বীজাণু বৃদ্ধি হয়।

আর এক রকমের বীজাণু আছে তার নাম ক্লোনটিডিয়াম প্যাসটোরিয়া-নাম। এরা সব থেকে বেশী কাজ করে অম্ল মাটির মাধ্যমে। যে কটা বীজাণু নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এ ছাড়া আরও অনেক বীজাণু

আছে যাদের দিয়ে মাটিতে সহজে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সেগুলি অপ্রধান। দেখা যায় একমাত্র নডুল বীজাণু গাছের জীবন্ত অবস্থায় বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নেয়। এই পদ্ধতিতে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তার পরিমাণ মোটেই কম নয়। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল যে গরমের সময়েও কাজ সমানভাবে চলে।

বীজাণু ক্রিয়া মাটির মধ্যে চক্রাকারে হয়ে চলেছে। এই মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে গাছ বেড়ে উঠে। আবার গাছ ফসল দিয়ে মরে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে মাটিতে সার বৃদ্ধি করে, সেই সার পরবর্তী ফসল এসে টেনে নেয়।

গাছের কোন অংশে যখন পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয় বা তার কোন অংশের উপর বীজাণুগুলি ক্রিয়া আরম্ভ করে তার সম্পূর্ণ পরিণতি হয় সেই অংশে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ আছে তাহাদিগকে মুক্ত করে। অর্থাৎ এই বীজাণু-ক্রিয়ার সমাপ্তি হয় যখন পাতায় অবস্থিত সমুদয় রাসায়নিক পদার্থগুলি পাতা থেকে বেরিয়ে আসে। এই রাসায়নিক পদার্থ মুক্ত করতে গিয়ে গাছের মুখ্য উপাদান জল, ও কার্বন ডায়-অক্সাইড পাতা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে আসে। এ সময়ে গাছের দেহে বা পাতায় যে সমস্ত প্রধান খাদ্যদ্রব্য জমা ছিল যেমন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য অপ্রধান খাদ্যাবলী যেমন নাইট্রেট, কার্বনেট, সালফেট ও ফসফেট প্রভৃতি মিশ্র পদার্থ গাছের দেহ থেকে বার হয়ে আসে। গাছের খাদ্য সম্বন্ধে যে চক্রাকারের কথা উপরে বলা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর— উত্তাপ, বায়ু ও জল—আর এটা সময়-সাপেক্ষ।

যখন মাটিতে এই বীজাণু-ক্রিয়া চলে বা ক্ষয় সাধন হয়, তখন কার্বন, সালফার ও নাইট্রোজেন অম্লতার (এসিডের) আকারে নির্গত হয়। মাটিতে নানা অন্দৈব পদার্থ আছে। তারা এই অম্লগুলির সহিত ক্রিয়া করে, নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। আর্দ্র অঞ্চলে অনেক

সময় এই অজৈব পদার্থগুলি কাজ করতে সমর্থ হয় না। তখন মাটিতে পরিমাণ মত চুণ যোগ করলে পুনরায় তারা সতেজ ও সবল হয়ে উঠে।

বিভিন্ন কীট—এ ভিন্ন মাটিতে নানা আকারের অনেক প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। পতঙ্গ শিশু, বিভিন্ন পিপীলিকা ও নানা জাতীয় কীট। কীটের মধ্যে প্রধান কেঁচো। যে মাটিতে প্রচুর জৈব পদার্থ আছে ও চুণ জাতীয় পদার্থ আছে সেখানে এরা ভীষণভাবে সক্রিয়। এরা মাটিকে খুব উর্বর করতে সাহায্য করে। মৃৎবিজ্ঞানীর মতে এক একর জমিতে প্রায় ১ মিলিয়ন পাউণ্ড কেঁচো থাকতে পারে। এদের কাজ মাটির মধ্যে গর্ত করা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া ও কার্বন জাতীয় পদার্থ খাওয়া। তা বাদে এরা যে মলমূত্রাদি ত্যাগ করে সেগুলি মাটিতে মিশে গিয়ে মাটিকে উর্বর করে, তা বাদে এরা নীচের মাটি উপরে তুলে দেয়। ডারউইন বলেন ৫ বৎসরে এরা এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটি উপরে তুলতে পারে। তাঁর মতে এই পৃথিবীর অনেক সার এই ভাবে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। যখন গরম পড়ে তখন এই কেঁচোগুলো মাটির নীচের দিকে চলে যায়।

মাটিতে নাইট্রোজেন—দুইটি বিশেষ আকারে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন জৈবাকারে গাছের ডালপালা, লতাপাতা ও দেহ ইত্যাদির মাধ্যমে আর অজৈব অবস্থায় মাটিতে পড়ে সারের মাধ্যমে। জৈব দেহে থাকে প্রোটিন আর উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে এই প্রোটিন থেকে N_2 বেরিয়ে আসে ও সেই N_2 থেকে মিশ্র পদার্থ সৃষ্টি হয়। প্রথমে এই প্রোটিন থেকে পেটাটাইড-এর সৃষ্টি হয়, পরে পেটাটাইড থেকে এমাইনো এসিডের সৃষ্টি হয়।

মাটিতে থাকে অসংখ্য বীজাণু। সুতরাং কোন নূতন জিনিষ মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজাণু ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বিভিন্ন ৫টি পদ্ধতিতে প্রোটিন

পরিবর্তিত হতে পারে। প্রায় অধিকাংশ প্রোটিন থাকে মিশ্র আকারে নিউক্লিয়িক এসিডের মধ্যে। নিউক্লিয়িক এসিডে তিনটি জিনিষ থাকে পাইরিডিমাইন, শর্করাজাতীয় পদার্থ ও ফসফরিক এসিড। বিভিন্ন বীজাণু প্রক্রিযার মাধ্যমে নিম্নস্তরেব মেদ জাতীয় এসিড ও এমোনিয়া কিংবা এলকোহাল, CO_2, NH_3 বা কোন এলডিহাইড, নিম্নস্তরের এসিড ও এমোনিষা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বীজাণুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ক্রিযা হলেও শেষ পর্যন্ত একই মিশ্র পদার্থ পাওযা যায। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওযা বিভিন্ন হলে তাব ফল বিভিন্ন হযে পড়ে।

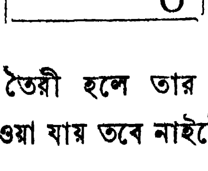
প্রোটিন ও এমাইনো এসিডেব সহিত নানা প্রকার বীজাণু-ক্রিযার ফলে নানা প্রকাবেব ইনডল (Indol) পাওযা যায। এব মধ্যকাব ইনডল এসেটিক এসিড বা একজাতীয় হবমন গাছেব বৃদ্ধিতে সহায়তা কবে। সেই কারণে যদি মাটিতে কোন জৈব সার দেওযা যায তবে মাটিতে এই জাতীয় ফাইটো-হোবমোনেব বৃদ্ধিব সম্ভাবনা থাকে ও এরই ফলে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয।

$$C_{36}H_{48}O_{30}N_4P_4 = \text{Nucleic acid.}$$

$$COOH.CH_2.CH_2.CH.NH_2.COOH + O_2$$
$$= COOH.CH_2.CH_2.COOH + NH_3 + CO_2$$

ইউরিযা থেকে অতি সহজে এমোনিযা হতে পাবে।

$$CO<^{NH_2}_{NH_2} + 2H_2O = (NH_4)_2CO_3 = CO_2 + NH_3 + H_2O.$$



এমোনিয়া তৈরী হলে তার থেকে নাইট্রেট তৈরী সুরু হয়। যদি মাঠে ছায়নামাইড দেওয়া যায় তবে নাইট্রেট সৃষ্টি ধীরে ধীরে হয়।

এমোনিয়া-করণ বা Ammoniafication—প্রোটিন থেকে সত্বর এমোনিয়া তৈরী কেবলমাত্র ব্যাকটেরিয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, প্রোটিনের বিভিন্নতার উপরও নির্ভর করে। ফাঙ্গাস-এর সাহায্যে প্রোটিন থেকে খুব তাড়াতাড়ি এমোনিয়া সৃষ্টি হতে পারে। জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশ্র যে কোন মিশ্র আকারে N_2 থাকুক না কেন—শেষ পর্যন্ত বীজাণু-ক্রিয়ার মাধ্যমে NH_3 তৈরী হয়ে যায়। ফাঙ্গাস সহযোগ তাড়াতাড়ি N_2 সৃষ্টি হয়। এটা তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—(১) প্রোটিনের প্রকারভেদ, (২) ক্রিয়া মাধ্যম, (৩) মাটিতে সব্জীজাতীয় পদার্থ। প্রোটিনের সঙ্গে ফাঙ্গাসের ক্রিয়া চলার সময় মধ্য পথে অনেক N_2 নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন কার্বোহাইড্রেট থেকে এমাইনো এসিড ও সিট্রিক এসিড তৈরী হয়। কিন্তু চুণের সহযোগে অম্লতার প্রকোপ প্রশমিত হলে (Neutralise) এমাইনো এসিড জমা হয়। যদি কোন প্রকারে কার্বোহাইড্রেড বেশী থাকে তবে প্রোটিন কম মাত্রায় এমোনিয়া তৈরী করবে। কারণ ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রোটিনের চেয়েও শর্করাজাতীয় পদার্থ ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ যে সামান্য এমোনিয়া উদ্ভব হয় সেটা শর্করাজাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিশে যায়।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে পদ্ধতিতে সহজে ও সত্বর কোন পদার্থ থেকে বীজাণু প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয় তাকে বলা যেতে পারে এমোনিয়া-করণ।

প্রোটিন থেকে এমোনিয়া তৈরী হলে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়াতে এমোনিয়া থেকে অক্সিডেশান পদ্ধতিতে নাইট্রাইট তৈরী হয়, পরে নাইট্রেট সৃষ্টি হয়। যদি মাটিতে অম্লতা খুব বেশী হয় তবে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট হয় না, মাটিতে এমোনিয়া জড়ো হয়।

মাটিতে এমোনিয়া থেকে তিনরকমে নাইট্রেট তৈরী হয়।

(১) রাসায়নিক পদ্ধতি (২) পদার্থ—রসায়ন পদ্ধতিতে (৩) সবার উপরে—বীজাণু প্রক্রিয়ায়।

(১) সোজা কোন সহায়ক (Catalyst) যোগে এমোনিয়া থেকে নাইট্রেট

হতে পারে। যদি বাতাসে প্রচুর এমোনিয়া থাকে তবে আলট্রাভায়লেট বিকিরণ প্রভাবে এমোনিয়া থেকে নাইট্রাইট তৈরী হয়।

$$(NH_3)_2+4O_3\rightarrow NH_4NO_2+H_2O_2+4O_2.$$

$$NH_4NO_2+H_2O_2=NH_4NO_3+H_2O.$$

(২) সূর্যের কিরণে এমোনিয়া থেকে নাইট্রাইট তৈরী হয়। ডাঃ ধর দেখিয়েছেন ভারতের মত উষ্ণমণ্ডলের মাটিতে যে সমস্ত তাপ সহায়ক (Photo Catalyst) থাকে তাদের সহযোগে অক্সিডেশান পদ্ধতি চলে ও নাইট্রাইট তৈরী হয়।

(৩) মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রাইট সৃষ্টিকারক বীজাণু থাকে তাদের প্রভাবে এমোনিয়া থেকে নাইট্রাইট তৈরী হয়।

$$2NH_3+3O_2=2HNO_2+2H_2O$$

$$2NH_3+3O_2\rightarrow N_2O_3+3H_2O$$

মাটিতে অক্সিজেন বার হওয়ার ফলে বিডাকশান পদ্ধতি কাজ করে চলে। এরজন্য মাটিতে যে বিশেষ জলের প্রয়োজন তা নয়—এর ফলে নাইট্রেট মাটি থেকে অন্য আকার নেয়।

(১) সোজাসুজি যাদের N_2 দরকার নিজের শক্তির জোরে তারা নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে নেয়।

(২) নাইট্রেট অক্সিজেন হারিয়ে নাইট্রাইটে পরিণত হয়।

(৩) কিংবা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে। এই পন্থাটিকে আখ্যা দেওয়া যায়—বিনাইট্রোজেন-করণ।

বাতাসে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। আমরা জানি বাতাসে শতকরা ৭৬ ভাগ N_2 থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে যখন আকাশ মেঘে ছেয়ে যায় তখন বাতাসে বিন্দু বিন্দু জলকণাও পাওয়া যায়। এই সময়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়ে $N_2+3H_2=2NH_3$ তৈরী হয় ও বৃষ্টির জলেতে মিশে মাটিতে পড়ে। এইভাবে যে পরিমাণ এমোনিয়া মাটিতে আসে তার পরিমাণ খুবই কম।

কিন্তু বেশী এমোনিয়া আমরা পাই মাটিতে আকাশ থেকে দুইটি বিশেষ বীজাণুর প্রভাবে। নীল সবুজ এলগি (algae) বায়ু থেকে N_2 টেনে আনতে সাহায্য করে। বীজাণু ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন জৈব মাধ্যম। সেখান থেকে তারা শক্তি আহরণ করে।

এজোটোব্যাকটার—এরোবিক বীজাণু বাতাস থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন টেনে আনে। এজোটোব্যাকটার বীজাণু বাতাস থেকে N_2 টেনে আনে। এজোটোব্যাকটার একটি বিশেষ অবস্থায় নাইট্রোজেনাস সোজাসুজি N_2-র সঙ্গে মিশতে পারে। অবশ্য প্রক্রিযার মধ্যে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। যখন বীজাণুদের খাদ্য উপযোগী জৈব পদার্থ ফুরিয়ে যায় তখন N 3 H মিশে NH_3 এমোনিয়ার সৃষ্টি করে। এক একটি জিনিষের সহ-যোগে বেশী নাইট্রোজেন ধরতে পারে। এদের মধ্যে গ্লুকোজই প্রধান। এদের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। খুব বেশী কাদামাটি পূর্ণ মাটিতে এজোটো ব্যাকটোরিয়া থাকে না। মাটিতে খুব বেশী জৈব পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থের ঘন সন্নিবেশ বিশেষতঃ ফস্ফেটের অন্যের সঙ্গে রেষারেষি প্রভৃতির ফলে এই বীজাণুর কম বেশী হয়ে থাকে। অম্লতা pH ৬ ইউনিটের কম হলে এজোটোব্যাকটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে না। যদি কোন মাটির pH চুণ সহকারে ৬ ইউনিটে নিয়ে আসা হয় তবে তখনই এজোটোব্যাকটার ক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ সত্বর বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করবে। সার প্রয়োগে এই বীজাণুর সংখ্যা কম বেশী হয়ে থাকে।

এলগির সঙ্গে এজোটো ব্যাকটার বাঁচতে পারে। এবং দেখা যায়—এদের সংখ্যা একই সময়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়—নসটক এনা বায়েনা প্রভৃতির বীজাণুর সঙ্গে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রিজোরিয়াম লেগুমিনাসম এর সঙ্গে দেখা যায় কেবলমাত্র এজোটো ব্যাকটিয়ার বৃদ্ধি হয়েছে।

এলগি—এই বীজাণু তিন রকমের—(১) ঘাসসবুজ ক্লোরোফাইসিয়া

(২) সাইনোফাইসিয়া (৩) ডাই. এটোমাসিয়া। এদের প্রয়োজন হয়—কোন জৈব পদার্থের সাহায্য বিনা সবুজ কণা তৈরী করতে। সাধারণতঃ মাটির উপরি স্তরে এলগি থাকে। সার দিলে ৩"—৪" তলায় যায় কিন্তু বেশী তলায় এলগি যায় না। সার দিলে এলগি জাতের একটি বিশেষ অংশ বৃদ্ধি পাওযার ফলে মাটিতে ফসল বেশী হয।

মাটিতে যদিও উপরি স্তবে ও জলশূন্য স্থানে এলগির প্রাদুর্ভাব দেখা যায তবুও অন্যান্য স্তরে ও শুষ্ক জাযগায়ও এদেব পাওয়া যায। কারণ সূর্যের কিরণে এদের বৃদ্ধি হয। সুতবাং যারা মাটির তলায় থাকে হয তারা মৃত থাকে নয ত heterotropid অবস্থায থাকে। এলগি তিন বকমের দেখা যায—(১) নীল সবুজ, (২) ঘাসেব মত সবুজ, (৩) ডাইএটোম। এদের মধ্যে নীল সবুজ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে।

নীল সবুজ এলগির এলাবাযেনা ও নসটক বাতাস থেকে N_2 টেনে নিযে এসে নিজেদের দেহেতে জমা কবে। তাবপর যখন সেই দেহ মাটিতে মেশে তখন এমোনিযার কাজ করে।

পদ্ধতি—বিভিন্ন বীজাণু-ক্রিযায যে নাইট্রোজেন মাটিকে উর্বরা করে তার জন্য প্রয়োজন শক্তিব (energy) আধার। এই শক্তি কখনও কম দরকার কখনও বেশী দরকার। গ্লুকোজ শক্তির আধার। এরই মাধ্যমে বীজাণু সেলগুলিতে শতকরা ৩০ ভাগ প্রোটিন বহন করে। এজোটোব্যাকটার বীজাণু প্রভাবের থেকে মুক্ত N_2 থেকে প্রথমে NH_3 তৈরী হয়।

এজোটোব্যাকটার পদ্ধতিতে H 3 CO নাইট্রোজেন থেকে এমোনিয়া তৈরী করতে সাহায্য করে। ফলে Aspartic acid সম্ভবতঃ হাইড্রক্সালা-মাইন তৈরী হয। মলিবডিনাম সহাযকের কাজ করে। এজোটোব্যাকটার বীজাণু হাইড্রোজেনাসের সৃষ্টি করে আর এই হাইড্রোজেনাস, নাইট্রোজেন সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। যখন এজোটো ব্যাকটার সক্রিয়ভাবে সেল বৃদ্ধি করতে থাকে তখনই N_2 টেনে নেয ও সেল তৈরী করতে সাহায্য করে।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াতে গাছ বেড়ে উঠলেও গাছের সম্যক্ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন প্রচুর আলো আর বাতাস। সূর্যের আলোকে গাছ খাদ্য তৈরী করে জলের সহযোগে। জল জমা থাকে মাটিতে অণু মধ্যবর্তী স্থানে। প্রকৃতি সদয় হলে কোনদিন এর অভাব হয় না আর নির্দয় হলে গাছ মরে যাবে। সূর্যের আলোর প্রভাবে ও উত্তাপের তারতম্যে মাটিতে অক্সিজেন বৃদ্ধি-পদ্ধতি কাজ করে চলেছে। এরই ফলে মাটিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ বা সার আছে সেগুলি গাছের গ্রহণীয় হয়ে পড়ে।

নডুল বীজাণু—লেগুমিনাস জাতীয় গাছ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং এমোনিয়া সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ সবুজ সার গাছ দিয়ে করা হয়। এই জাতীয় গাছের শিকড়ে নডুল নামক একজাতীয় বীজাণু থাকে তারা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

(১) কতকগুলি নডুল বীজাণু আছে যারা—আশ্রয়দাতা গাছের সহযোগে অল্প নাইট্রোজেন ধরে আর কতকগুলি আছে যারা অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন ধরতে পারে।

(২) যারা অল্প পরিমাণ N_2 টানে সেই নডুলগুলি ছোট, গোল এবং সাদা। সারা শিকড় ব্যপে গজায়—এবং সংখ্যাতেও অনেক। কিন্তু যেগুলি আকারে বড়, সেগুলি প্রধান শিকড়ের গায় গজায়, ঈষৎ রক্তিমাভ রং, একটু লম্বাটে ধরণের অবশ্য সব গাছের এই রকম হয় না।

(৩) যে গাছের শিকড়ের গায় বীজাণু গজাবে তাদের বিশেষ জাতের উপর ভাল ও মন্দ নডুল গজান নিভর করে। মাটি চষার ফলেও ভাল বা মন্দ নডুল গজাতে পারে। এদেরই ফলে ভাল নডুল কাজ নাও করতে পারে।

(৪) যে পারিপার্শ্বিকে তারা থাকে তার প্রভাব এদের কাজে সাহায্য করে। এরা প্রায়ই মন্দ অবস্থায় থাকে।

(৫) একই গাছের শিকড়ে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নডুল থাকলে অন্যটি কাজ করে না।

গাছের শিকড় প্রথমে শিকডস্থিত বীজাণুর উপর একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া করে তার ফলে বীজাণুগুলি শিকডের চারিদিকে জমা হয়। এখন বীজাণুগুলি auxsin-এর মত একরকম লালা বার করে, এর ফলে অনুলোমগুলি বেঁকে যায়। প্রথম অবস্থায় এই বীজাণু অনুলোমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরভোজী হয়ে বাস করে তারপর ধীরে ধীরে গাছের প্রত্যেক সেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে এইরকমে তারা সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই সময় প্রান্তস্থিত বাকলে এই ভাবে নূতন নডুল-সৃষ্টি হয় এবং শিকড প্রান্তের বাকল স্ফীত হয়ে পড়ে। এইভাবে নূতন নডুল সৃষ্টি হয়। কতকগুলি গাছে আবার শিকড়ের চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে একটি—লম্বায় লাঠিরমত আকার নিয়ে শিকডের মধ্যে বাড়তে থাকে।

নডুল বীজাণু নিম্নলিখিত পর্যায়ে বাড়তে থাকে—

(১) ছোট ছোট নূতন নডুল অনেক থাকে।

(২) আকারে বাড়ে। শর্করাজাতীয় (Carbohydrate) ও ফসফেটের উপস্থিতিতে আকারে বাড়ে।

(৩) আস্তে আস্তে লম্বা হয়ে লম্বা গোলাকার লাঠির আকার নেয়।

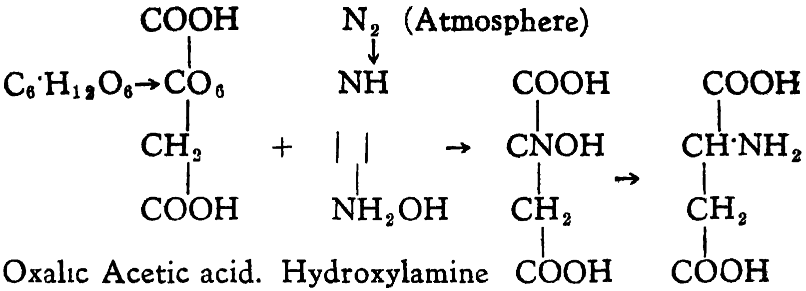
(৪) শর্করাজাতীয় পদার্থ হীন হলে অনেকটা লাঠির আকার নেয়। এইগুলি পরে লম্বা লাঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই যে নডুল ব্যাকটেরিয়া এরা মূলতঃ একজাতীয় হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে—(১) আলফালফা জাতীয় (২) ক্লোভার জাতীয় (৩) মটর জাতীয় (৪) বীন জাতীয় (৫) লুপিনি জাতীয় (৬) সয়াবীন জাতীয় (৭) কাউপীজ জাতীয়। এদের প্রত্যেকের আশ্রয়দাতা গাছের শিকড়ের সহযোগে N_2 টেনে আনার ক্ষমতা বিভিন্ন পরিমাণের। কতকগুলি গাছ আছে যারা নানারকমে নডুলের ক্রিয়া চালাতে পারে। বিভিন্ন গাছের মধ্যে পরাগযোগ হলে বীজাণুর সংখ্যা বেশী হয়।

রিজোরিয়াম—রিজোরিয়াম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন pH ৫.৫—৭.০ ইউনিট। নডুল বীজাণু অম্লতা সহ্যকারী ও ক্ষয় সহ্যকারী বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আলফালফা অম্লতা সহ্য করতে পারে না কিন্তু লুপিনি খুব বেশী অম্লতা সহ্য করতে পারে। ০°—৫০° সে. বেশী বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ৬০°—৬২° সেঃ তার মৃত্যু হয় (Normal death)। সব থেকে বেশী পাওয়া যায় ১৮°—২০° সেঃ। সোজাসুজি সূর্যের কিরণ সহ্য করতে পারে। মাটি শুকিয়ে গেলে ক্ষতি হয় কিন্তু এদের ধ্বংস হয় না। কোন সারের মধ্যে রিজোরিযাম থাকে না। মাটিতে খুব মন্থর গতিতে চলে। আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহ যোগে এদের বিস্তৃতি হয়।

সূর্যের আলোর অভাবে যখন আলোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) বন্ধ হয়ে যায় তখন N_2 টেনে আনাও বন্ধ হয় আর তখন এই বীজাণু আশ্রয়-দাতা গাছের পরভোজী হয়ে বাস করে। যখন মাঝামাঝি আলোক সাহায্যে গাছের রান্না হয় তখন সব থেকে বেশী N_2 টেনে নিয়ে আসে। সব থেকে বেশী N_2 টেনে আনা নির্ভর করে N_2-র পরিমাণ ও শর্করাজাতীয় পদার্থের পরিমাণের উপর। N_2 টেনে আনায় নাইট্রেট দ্বিবিধ কাজ করে (১) শিকড়ের অনুলোমগুলি যাতে না বেঁকে যায় তার জন্য গাছকে সাহায্য করে, (২) যে সমস্ত তাজা নডুল তৈরী হয়েছে তাহাদিগকে সকর্মক রাখে। সাধারণতঃ নন লেগুমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ে নডুল বীজাণু থাকে না। ফলে N_2 আহরণ তাদের বেশী হয় না। কিন্তু কতকগুলি গাছ আছে যেমন রেডযেট, সিলভার বেরী, অলডার ইত্যাদি তারাও নডুল বীজাণু নষ্ট করে।

লেগুমিনাস জাতীয় গাছ শিকড়স্থিত নডুল বীজাণুর দ্বারা বাতাস থেকে N_2 টেনে আনে। তাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্ত N_2 গাছের উপরের দিকে চলে যায়। গাছ যখন ছোট থাকে তখন তারা N_2 বেশি টেনে আনতে পারে।



Oxalıc Acetic acid. Hydroxylamine

গাছের ınoculation করলে ফসলের বৃদ্ধি না হলেও প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে। যে সমস্ত গাছ তাদের নাইট্রোজেনের জন্য বীজাণুর উপর নির্ভর করে—তাদের মধ্যে বেশী alkalid থাকে। মলিবডিনাম সহযোগে লেগু-মিনাস জাতীয গাছের N_2 টেনে আনা বৃদ্ধি পায়। ১ অংশ মলিবডিনাম সহযোগে ৩৭,০০০ অংশ N_2 বৃদ্ধি পেতে পারে।

রিজোস্ফিয়ার—ক্ষুদ্র বীজাণুগুলি মাটির মধ্যেই হোক বা শিকড়ের মধ্যেই হোক সতত ক্রিয়া করে চলেছে। আমৃত্যু এর বিরতি নেই। প্রশ্ন উঠে যে শিকড় বা মাটির সর্বত্র তারা ক্রিয়া করে থাকে কিনা? গাছের যেমন প্রযোজন বীজাণুগুলিকে তেমনি বীজাণুরও প্রযোজন গাছের শিকড়ের। গাছ দেয বীজাণুকে তাদেব খাবার ও পরিত্যাজ্য সকল পদার্থ, তাদের বৃদ্ধি পাওযার জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক ও স্থান। কিন্তু গাছের দূষিত ত্যজ্য পদার্থ অনেক সময বীজাণুদের পক্ষে অপকারী হয। আর বীজাণু গাছের খাদ্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে। কার্বন ডায়-অকসাইড, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ইত্যাদি। গাছের বৃদ্ধির জন্য অক্সিন ও ফাইটো হরমন সৃষ্টি করে, অনেক গাছে বীজাণু সহযোগে, অক্সিজেন ব্যতিরেকে খাবার নিতে পারে। অনেকগুলি বীজাণু আছে যারা বড় গাছের সঙ্গে তাদের খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগায় এবং কতকগুলি বীজাণু আছে যারা গাছের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী।

গাছের বৃদ্ধিতে বীজাণুর প্রভাব—বীজাণুর প্রধান কাজ মাটিতে যে সমস্ত পচা লতাপাতা, শিকড, ডাল থাকে বা অন্য গাছ ও প্রাণীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে তার থেকে N_2 বার করে দেওয়া। তারপরে সেই N_2 নানাবিধ প্রক্রিযার মাধ্যমে গাছের গ্রহণযোগ্য করা। ঐ সমযে কিছু CO_2 নির্গত হয ও এই CO_2 গাছেব বিশেষ প্রযোজন হয। বীজাণু মাটি থেকে রাসাযনিক পদার্থগুলিকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। গন্ধক বা এমোনিযাম সালফেট প্রভৃতি যে সমস্ত সার মাটিতে দেওযা হয গাছকে সেগুলি নিতে সাহায্য করে। অনেক সময অনেক জিনিষ একে অন্যে মিলিত হযে সিনথেসিস করতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে নাইট্রেট বা সালফেট থেকে O_2 নির্গত হতে সাহায্য করে। লেগুমিনাস জাতীয গাছ নিজে N_2 টেনে আনলেও সে নাইট্রোজেন তার নিজের গ্রহণোপযোগী থাকে না। তাকে খাদ্য জোগান দেয বীজাণুরা। কতকগুলি বীজাণু আছে যেমন একটিনোমাইসিস ও ফাঙ্গাস গাছের শিকড ভেদ করে ভিতরে যেতে পারে এবং সেখানে বৃদ্ধি পায ও সেখানে রিজোস্ফিয়ার বা বৃদ্ধিস্থান তৈরী করে। সবার উপরে প্রমাণিত হযেছে বীজাণুকুল বীজকে অতি তাডাতাডি অঙ্কুরিত করতে সাহায্য করে।

মাটির বন্ধ্যা হবার কারণ নির্ণয করতে গিযে—প্রথমেই বলা যেতে পারে যে এতে এমন কতকগুলি বীজাণু থাকে যারা গাছ উৎপাদনের সহাযক নয। এগুলি সৃষ্টি হয কতকগুলি বীজাণুর প্রভাবে। তিনটি উপাযে এর বন্ধ্যাত্বের রোধ করা যেতে পারে (১) উত্তাপ দিযে (২) তরল বিশুদ্ধকরণ পদার্থ যোগ করে (৩) মাটিতে চূণ যোগ করে। সবার উপর বলা যায বীজাণু মাটিতে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে বৃদ্ধি পেযে শিকড়কে উত্তেজনা দেয় যার ফলে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয। অনেক সময বীজাণু প্রভাবে অক্সিজেন বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। সেই সময় গাছ ফাইটো হরমোন যোগে গাছের খাদ্য গ্রহণ করে।

বীজাণুর উপরে গাছের প্রভাব—গাছের দেহ থেকে এক প্রকার

রস নির্গত হয়। তাতে থাকে ফরমিক এসিড, অক্সালিক এসিড, ম্যালিক এসিড এবং কতকগুলি অক্সিজেন বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহায়ক, শর্করাজাতীয় পদার্থ ও নানাবিধ নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ বীজাণুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(১) বীজাণুকে শক্তি দেয়।

(২) মাটি থেকে গাছ খাদ্য টেনে নেওয়ার সাথে সাথে রাসায়নিক পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে থাকে। তার ফলে বীজাণুদের বৃদ্ধি পেতে সুবিধা হয়।

(৩) মাটি থেকে গাছ জল টেনে নেয় তাতে অনেক সময় বীজাণু বৃদ্ধিতে ক্ষতি হয়।

(৪) গাছ মাটিতে CO_2 ছেড়ে দেয় এর ফলে হাইড্রোকার্বণিক এসিড তৈরী হয়। তার ফলে বহু রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ দ্রাব্য হয়ে পড়ে।

(৫) শিকড়ের প্রভাবে মাটির আকারের পরিবর্তন হয়। এতে বীজাণুদের সুবিধা হয়।

(৬) মাটি থেকে গাছ নাইট্রোজেন টেনে নেয়। মাটিতে থেকে যায় অন্যান্য ধাতব পদার্থ।

বীজাণুর কাজ কি ?

(১) বীজাণুর প্রভাবে শিকড়ের নিকটে N_2 জমা হয়।

(২) রোগাক্রমণকারী বীজাণুর কাছ থেকে গাছকে রক্ষা করে।

(৩) বীজাণু গ্যাস বা বাষ্প সৃষ্টি করে।

মাটিতে বিভিন্ন জাতীয় বীজাণু নিজেদের সমতা রেখে বাস করে। সামান্য পরিবর্তনে মাটির পরিবর্তন আনে। এবং যেমন সমতা রেখে বাস করে তেমনি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্যও আনে। একজাতীয় বীজাণু অন্য জাতীয় বীজাণুর ধ্বংস করতে চায়। ফলে একটিনোমইসিস জাতীয় বীজাণু এমন একটা রস বার করে যার দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতি হয়।

গাছের রোগ ও তার প্রতিকার—মাটির মধ্যে থেকে বীজাণু গাছকে রোগাক্রান্ত করে। এই সমস্ত বীজাণুকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাদেরকে—

(১) শস্য-পর্যায়।

(২) বাহ্যিক উপায়ের দ্বারা যেমন মৃত্তিকাকর্ষণ, মাটির অম্লতা কম বেশী করে, কার্বন জাতীয় পদার্থ মাটিতে যোগ করে ও উপযুক্ত সার দিয়ে।

(৩) মাটিকে আংশিক উত্তপ্ত করে (Sterilisation)

(৪) বীজাণু ধ্বংসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ মাঠে ছড়িয়ে।

(৫) কোন এক রোগের বীজাণু ধ্বংস করার জন্য অন্য বীজাণু মাটিতে ছড়িয়ে।

শস্য পর্যায—মাঠে রোগের বীজাণু বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে—সেজন্য অন্ততঃ ৪—৫ বৎসরের শস্য পর্যায় মেনে চাষ করা উচিত।

বাহ্যিক ও রাসায়নিক পদ্ধতি—ইহা সব থেকে প্রকৃষ্ট উপায়। প্রথমে মাটির অম্লতা দেখে নিয়ে তাকে প্রয়োজনানুযায়ী চুণ বা অম্লতা বাড়াবার জন্য গন্ধক মিশাতে হয়। মাটিতে গন্ধক মিশিয়ে অম্লতা বাড়ালে আলুর তিল রোগ (wart disease) কমে যাবে। আলুর ধ্বসা রোগও এই পন্থায় কমবে। মিঠা আলুর ধ্বসা রোগ ও বসন্ত রোগ গন্ধক দিলে কমে যায়। শুকা-রুকার দিনে একটিনোমাইসিস বীজাণু বাড়ে ফলে আলুতে ধ্বসা রোগ দেখা যায়।

উত্তপ্ত (Steam Sterilisation)—আংশিকভাবে মাটিকে উত্তপ্ত করে বীজাণুর হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। পরিপূর্ণরূপে যেমন করা যায় না, তেমন বেশী উত্তপ্ত করাও উচিত নয়। কারণ ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার মাটি বীজাণু আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উত্তপ্ত করতে গেলে অধিক চাপের প্রভাবে ১৫—২০ পাঃ চাপে ২—৩ ঘণ্টা গরম করতে হবে। উত্তপ্ত বায়ু মাটিতে ছেড়ে

দিয়ে ১—২ ঘণ্টা পর পর ৫।৬ দিন করলে পরিপূর্ণভাবে উত্তপ্ত করা যায়। মাটিকে ভাইরাস রোগের বীজাণু শূন্য করতে গেলে ১০ মিনিট ৫০°—৬০° সেঃ মাটিকে উত্তপ্ত করতে হবে। সোজাসুজি মাটিকে উত্তপ্ত করে কিম্বা কোন রোগ প্রতিষেধক পদার্থ উত্তপ্ত করে মাটিতে দিলে কাজ চলতে পারে। যেমন কার্বন ডাই-সালফাইড, টলুয়োল, ফরমালডি-হাইড ইত্যাদি। রোগ-প্রতিষেধক পদার্থগুলি মাটিতে জমা থাকে না। তারা বীজাণু ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। N_2 তৈরী হওয়ায় বীজাণুগুলির উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। কারণ মাটিতে এই উত্তাপে বীজাণুগুলি নষ্ট হয় না তারা একটু ঠাণ্ডা হলেই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে বিশেষতঃ ব্যাকটেরিয়া অতি তাড়াতাড়ি মাটিস্থিত কার্বন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে এবং বহুল পরিমাণে এমোনিয়া নির্গত হয়। সেইজন্য মাটি উত্তপ্ত করলে মাটিতে রাসায়নিক সার দেওয়ার কাজ হয়। জমি উত্তপ্ত করলে ফাঙ্গাস ও অন্যান্য পরভোজী মারা যায়।

রাসায়নিক পদার্থ—ফরমালডিহাইড পদার্থ দিয়ে মাটি উত্তপ্ত করলে ফাঙ্গাস ও নেমাটোড হ্রাস পায়। শর্করা বীট-এর নেমাটোড রোগ ঐভাবে নিবারণ করা যায়। কিন্তু ২০″—২৫″ মাটির নীচে এই তরল পদার্থ যায় না। ফলে সেখানে যে সমস্ত নেমাটোড থাকে তারা মাটির উপরে চলে আসে। পোকামাকড় মারতে মাটির উপরিস্তরে আর্সেনিকের ব্যবহার চীনে অনেকদিন ধরে প্রচলিত আছে। স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে যে ফাঙ্গাস জন্মায় তাকে মারবার জন্য শস্য রোপণের অন্ততঃ ১০ দিন আগে জমিতে ১.২% এসেটিক এসিড ছড়াতে হয়। টলুয়োল কার্বন বাই-সালফাইড দিয়ে অনেক রোগ নিবারণ করা যায় কিন্তু নজর রাখতে হবে এরা যেন সব সময় শস্য রোপণের আগে মাঠে দেওয়া হয় নইলে সমূহ ক্ষতি করতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

জৈব সার (Organic manure)

গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশু যে কারণেই গৃহে পালিত হউক না কেন পরোক্ষভাবে কৃষককে জমিতে সার দিতে সহায়তা করে। লেগুমিনাস জাতীয় ফসল মাটির উৎপাদন বাড়ায় ও অন্যান্য উপায়ে মাটির উৎপাদিকা শক্তি যতই বেশী করা যাকনা কেন—গরুর গোবর থেকে যে সার হয় তার মূল্য অনেক বেশী।

মাটির সব সময়ই ক্ষয় হচ্ছে। একদিকে যেমন ক্ষয় হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি ক্ষয়পূরণের চেষ্টা চলছে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষয়পূরণের পরিমাণ ক্ষয়ের পরিমাণ থেকে অনেক কম যার ফলে মাটি দিন দিন অনুর্বর হয়ে পড়ছে। জমিতে শস্যোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে সার জাতীয় পদার্থ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে। যদি কোন জমিতে গাছ বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য না থাকে তবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পাবে এবং ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে সেই সার জাতীয় পদার্থ গাছের দেহের মাধ্যমে জমি থেকে অপসারিত হবে। পরবৎসর যখন সেই জমিতে কৃষক ফসল ফলাতে যাবে তখন আর আশানুরূপ ফসল পাবে না। কারণ নৈসর্গিক উপায়ে মাটির যতটা ক্ষয় হয়, তার তুলনায়, ক্ষয়পূরণ হয় অনেক কম। এর জন্যই প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণে মাটিতে সার দিয়ে এই ক্ষয়পূরণ করা। বৎসরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাটির যে ক্ষয়সাধন ও ক্ষয়পূরণ হয় তার পরিমাণ জেনে নিয়ে মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিলে প্রয়োজনমত ক্ষয়পূরণ হতে পারে।

মাটিকে সজীব বলা যায় না। কারণ সজীবতার সব লক্ষণগুলি মাটিতে নেই। কিন্তু মাটিতে সর্বদাই ক্ষয়সাধন হচ্ছে। এই ক্ষয় হয় দুইটি পথে—প্রথমটি গাছের মাধ্যমে আর দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিপর্যয়ে। গাছ মাটি থেকে রাসায়নিক পদার্থ টেনে নিয়ে সতেজ ও সবুজ হয়, এর ফলে মাটিতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায় আর মাটিতে বৃষ্টিপাত, কৃত্রিম জলসেচন ইত্যাদির ফলে মাটি থেকে বা জমি থেকে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি চলে যায়। অনেক সময় কেবলমাত্র লেগুমিনাস জাতীয় গাছ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় গাছ সেগুলি সংগ্রহ করে কেবলমাত্র মাটি থেকে। গাছ সোজাসুজি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না বা নাইট্রোজেন যখন বাষ্প আকারে থাকে তখন গাছ তাহা গ্রহণ করতে পারে না। গাছ মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নাইট্রেট আকারে। আর এই নাইট্রেট প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয় নানাবিধ ধাতব পদার্থ। সেগুলি আসে মাটি থেকে। এই নাইট্রেট ও অন্যান্য কতকগুলি সহজ দ্রবণীয় মিশ্রপদার্থ জলের সঙ্গে মিশে জমি থেকে চলে যায়। কেবলমাত্র রাসায়নিক সার দিয়ে সেগুলি পূরণ করা যায় না। জলের সহযোগে মাটি থেকে ক্যালসিয়াম অপসারণের পরিমাণ, জমি থেকে ফসলের মাধ্যমে অপসারিত ক্যালসিয়ামের পরিমাণের চেয়েও বেশী। কিন্তু ফসফরাস সার জলের সঙ্গে মিশে খুব কমই চলে যায়। কারণ সুপারফসফেট জাতীয় সার অনায়াসে জলের সহিত দ্রবণীয় হয় না। কিন্তু বৃষ্টির ধারা যখন মাটিকে স্থানচ্যুত করে তখন অল্প পরিমাণে এই জাতীয় পদার্থ মাটি থেকে চলে যেতে পারে। পটাস জাতীয় সার মাটি থেকে এভাবে চলে যায় সত্য কিন্তু এর বেশী ভাগ নষ্ট হয় পশুর দুধ ও পশমের মধ্য দিয়ে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে মাটির যত্ন না নেওয়া যায় তবে এই জাতীয় সার জলের সহিত মিশে বা অন্য কোন পন্থায় যেমন বৃষ্টির ধারার আঘাতে জমি থেকে চলে যেতে পারে।

মাটি ঠিক ব্যাঙ্কের মত। ব্যাঙ্কে যেমন টাকা গচ্ছিত রাখা যাবে সেই অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যাবে। জমা দেওয়া পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্ক কখনই দেবে না। মাটিও সেই রকম ব্যাঙ্ক। মাটিতে যতটা পরিমাণ সার আছে গাছ তার গ্রহণযোগ্য অংশই গ্রহণ করতে পারে। প্রতি বৎসর গাছ মাটি থেকে তার গ্রহণোপযোগী খাদ্য শস্যকণা ও গাছের দেহের মাধ্যমে মাটি থেকে তুলে আনছে। এ ছাড়া বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ খাদ্য জাতীয় পদার্থগুলি কিছু পরিমাণে মাটি থেকে চলে যায়। তার ফলে মাত্র একশত বৎসর পূর্বে আমাদের পিতামহ বা প্রপিতামহ জমি থেকে যে পরিমাণে ফসল পেতেন আজ আমরা আর সে পরিমাণে ফসল পাই না। ফসল কম পাওয়ার প্রধান ও প্রথম কারণ জমি থেকে সার জাতীয় পদার্থের হ্রাসপ্রাপ্তি। এরই ফলে খেত অবধি ক্রমশঃ অনুর্বর হয়ে পড়ছে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে মৃত্তিকা সংরক্ষণ হয় তাহা হইলে মাটি সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হইত হবে না কিন্তু এটা স্থির নিশ্চিত মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাবে।

এই ফসলের কিছু অংশ যখন আমাদের গৃহপালিত পশুরা ভক্ষণ করে তখন এই ফসলের মধ্যে যে সমস্ত নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও পটাশ ইত্যাদি থাকে সেগুলি এরই মধ্য দিয়ে জীবের দেহে প্রবেশ করে ও ঐগুলির দ্বারা জীবদেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। 'হলষ্টীন' এক-জাতীয় গরু। এই পশুটির দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যদি ইহা ৩৭।।০ পাউণ্ড দুধ দেয় তবে তাতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি থাকে তাহা ঘাস ইত্যাদির দ্বারা যে পরিমাণ খাদ্য হার দেহতে যায় তার পরিমাণের থেকে বেশী।

পশুদেহের প্রতিটি অংশ থেকে আমরা সার পেতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র মূত্র ও গোবর থেকে সার প্রস্তুত হয়। তা বাদে এদের মৃত্যুর পর এদের হাড় থেকে 'হাড্ডিসার' পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন

কাল থেকে গোমূত্র ও গোময, সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গোমূত্র, গোময, গোযাল ঘরেব খড়কুটা এবং এদের আধ খাওযা খড়ের অংশ পচে খুব ভাল সাবের সৃষ্টি কবে। এরা যখন জলে পচে তখন কেবলমাত্র গোমূত্রটুকু জলেব সহিত মিশে মাটি থেকে চলে যাওযার সম্ভাবনা থাকে।

মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ কবে গাছেরা বেড়ে ওঠে। সেই গাছ বা ঘাস যখন কোন পশু খায তখন এদেব মাধ্যমে রাসাযনিক পদার্থগুলি পশুদেহে ঢোকে। তাই যখন কোন একটি পশুকে বিক্রয করা হয় তখন তাব দেহেব মাধ্যমে ঘাস থেকে তুলে নিযে আসা রাসাযনিক পদার্থগুলি মাটি থেকে যেমন চলে যায তেমনি তাদের মলমূত্রাদির দ্বারা যে সার প্রস্তুতির সম্ভাবনা ছিল সেটা দূব হয। পশু গোযাল থেকে বিক্রী করে দিলে ক্ষতি নিশ্চযই হয কিন্তু তার থেকেও বেশী ক্ষতি হয চাষীর —তাদের মলমূত্রেব অভাবে।

মলমূত্র ও খড়কুটা ভালভাবে সংবক্ষণ না করলে বিশেষ ক্ষতি হয়। (১) মলমূত্রাদি তরলীভূত হযে মাটির নীচে চলে যায; (২) ইহাতে যে সমস্ত সহজে দ্রবণীয দ্রব্য থাকে সেগুলিও চুঁইযে যায, এবং (৩) এতে যে এমোনিযা থাকে সেটিও নানাপ্রকার বীজাণুর ক্রিয়ার মাধ্যমে জমি থেকে চলে যেতে পাবে। যদি গোমূত্র কোন বাঁধা জাযগায আটকিযে বাখা না যায তবে কোন ছিদ্রবিহীন পাত্রে রাখাই বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে সেই স্তূপ থেকে এমোনিযা উবে যেতে পারে। এ ভিন্ন এব মধ্যে যে সমস্ত বীজাণু-ক্রিযা সংঘটিত হয তার দ্বাবাও কিছু নাইট্রোজেন উবে যায়। খড়কুটা, গোময, গোমূত্র ও আহার্য দ্রব্যের অধিকাংশ, এর মধ্যে যে সমস্ত মিশ্র পদার্থ থাকে সেগুলি এই বীজাণু ক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক সময় জলেব সহিত দ্রবণীয হইয়া পড়ে।

জৈব সার—জৈবসার প্রস্তুত করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন যথেষ্ট উত্তাপ। এরই ফলে বীজাণুর বংশবৃদ্ধ হয ও মাটিতে বিভিন্ন ক্রিয়া চলে।

সব সময় নজর রাখতে হবে যেন উত্তাপের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে না পড়ে। বাইরের উত্তাপ থেকেও ভিতরে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া চলে তার ফলেও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। ফলে দেখা যায় গোবরের স্তূপ থেকে ধোঁযার আকারে বাষ্প উবে যাচ্ছে। ইহাতে সার পদার্থের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ, গরু, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদির গোবরের স্তূপে এগুলি বেশীরকম দেখা যায। এর হাত এড়ান যায় যদি সমস্ত স্তূপে কোন ফাঁক না থাকে ও উপযুক্তভাবে ইহা ভিজিয়ে রাখা যায।

গোময় ও গোমূত্র রক্ষণবিধি—কৃষকের বাসস্থান থেকে যতটা দূরে এদেরকে রক্ষা করা যায় ততটা গৃহস্থের দিক থেকে ভাল। স্থান নির্বাচনের পর সেই স্থানে গর্ত খুঁডতে হয। গর্তের কোন বিশেষ পরিমাণ দেওযা যায না তবে গরু ইত্যাদির সংখ্যার উপর এর পরিমাণ নির্ভর করে। অবশ্য গর্ত বেশী বড় করাও উচিত নয়। কারণ অনেক সময় লাঠি দিযে এইগুলি নেড়ে চেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। গর্তের আকার বড় হলে কাজের বিশেষ অসুবিধা হয়। গর্তের গভীরতা ৬' ফিটের বেশী করা আদৌ বাঞ্ছনীয নয। সব থেকে ভাল হয় যদি এই খাদের তলা ও পাশ পাকা ইঁট দিযে গেঁথে দেওযা যায। তা হলে মূত্রাদি চুঁইযে যাবার আর ভয থাকে না। আমেরিকায় ও নিউজিলণ্ডে যেখানে গরু ইত্যাদি পশু রাখা হয সেখানে রাতের বেলার জন্য খড়, ঘাস বা শস্য জাতীয় গাছের ডাঁটা মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। এতে গরুর মূত্রাদি একটুও নষ্ট হয় না। খড়ের বা ঘাসের সহিত ইহা মিশে যায এবং পরে যখন ঐগুলি গর্তে ফেলে দেওয়া হয় তখন মলের সহিত ইহা গর্তে চলে যাবে ও পচবে। এগুলি খাদে ফেলবার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন খাদটি যথেষ্ট ছাযাযুক্ত স্থানে হয়। কারণ খাদ ঢাকা না থাকলে সূর্যের কিরণে এগুলি জলকণারূপে দূরীভূত হবে। আরও লক্ষ্য করতে হবে যেন উপর থেকে বা পাশের থেকে কোন বাহিরের জল এসে এগুলি ধুইয়ে না নিয়ে যায়। এর

উপর দিয়ে যদি জলের স্রোত চলে যায় তবে এতে যে দ্রবণীয় পদার্থগুলি থাকবে তারা জলের সহিত মিশে খাদ থেকে বার হয়ে যাবে। সুতরাং খাদের উপরে কাঠ দিয়ে অন্ততঃ সব দিক ঘিরে দেওয়া উচিত। খাদ তৈরীর পর তাতে পশুর মলমূত্রাদি ও খড়কুটা ফেললে ও মাঝে মাঝে নেড়ে দিলে আবর্জনা সার প্রস্তুত হবে। খাদের পাশগুলি এমনভাবে তৈরী হবে যেন ইহার ভিতর বাতাস ভালভাবে চলাচল করতে পারে। মাঝে মাঝে কিছু জল দেওয়ারও প্রয়োজন হয়।

এই পদ্ধতির ফলে কিছু নাইট্রোজেনের ক্ষতি হয়ে থাকে কিন্তু তার পরিমাণ অতি অল্প। সব থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় যদি বিভিন্ন পশুর বিষ্ঠা একই স্থানে পচান যায়। যদি কোন স্তূপের উত্তাপ খুব বেশী হয়ে যায় তবে একটু বেশী করে আবর্জনা মাঝে মাঝে নেড়ে দেওয়া ও জল দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

সাধারণতঃ গোয়ালেতে গোমূত্র ও অন্যান্য পশুর মূত্রাদি রক্ষা করবার ব্যবস্থা থাকে না। তার ফলে মূত্রাদি তরল পদার্থরূপে নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষতঃ যে সমস্ত মেঝে পাকা সেখানটা জল দিয়ে ধুয়ে দিলে সমস্ত মূত্রাদি নষ্ট হয়ে যায়। সব থেকে ভাল হয় যদি এই গোয়াল ধোওয়া জল পাকা ড্রেনের মধ্য দিয়ে কমপোষ্ট স্তূপে আনা যায়। তা হলে স্তূপেও আর জলের প্রয়োজন হবে না। অধিকন্তু এমোনিয়ার ভাগ বেড়ে যাবে। এই ভাবে মূত্রাদি রক্ষা করা যায়। তা বাদে খড়কুটার মিশ্রণেও কাজ হয়। সব থেকে ভাল হয় যদি মূত্রাদি ছিদ্র বিহীন ঢাকা পাত্রে জমা করা যায় এবং যদি ইহা মশা মাছির সংস্পর্শে না আসে। এদের পচতে ৪।৬ মাস সময় লাগে।

যখন এই সার জমিতে যোগ করা যায় তখন নাইট্রোজেন এমোনিয়া হয়ে উবে যায়। খুব বৃষ্টির সময় মাটিতে সার দিলে জমি থেকে সার চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ যে জমিতে কিছু ঢাল আছে সেখানে এভাবে সার নষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু একবার এই সার মাটির সহিত মিশে

গেলে সে ভয় আর থাকে না। তখন জলের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে এমোনিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ঐ এমোনিয়া মাটির সহিত মিশে যেতে পারে। কিম্বা অন্য কোন ধাতব পদার্থের সহযোগে নাইট্রেট সৃষ্টি করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেন এমোনিয়া আকারে থাকে ততক্ষণ জলের সহিত মিশে ও বাষ্পীভবন হয়ে নষ্ট হওয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এদের নষ্ট হয় না। মাটিতে প্রচুর উত্তাপ থাকলে তাড়াতাড়ি এই নাইট্রেট নষ্ট নাও হতে পারে তবে তাহা জলের সহিত মিশে চুঁইয়ে যাবে। ফলে গাছের নাইট্রোজেন জাতীয় সারের অভাব হয়।

আবর্জনা সার বা কমপোষ্ট সার বা জৈব সার তৈরী করতে গিয়ে আমাদের ভালভাবে মনে রাখতে হবে যেন নাইট্রোজেন স্তূপ থেকে না চলে যায়। অনেক সময় অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থও যোগ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় এই আবর্জনা স্তূপে ক্যালসিয়াম সালফেট, জিপসাম, সুপার ফসফেট, মনোক্যালসিয়াম ফসফেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় যে ভাবে আবর্জনা সার তৈরী করতে হবে সেই অনুযায়ী দুটি বা তিনটি রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ক্যালসিয়াম এমোনিয়ার সহিত ক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত করে এবং ইহাতে যার ফলে দুর্গন্ধ না হয় তার চেষ্টা করে। এই আবর্জনা সারে ফসফরাস খুবই কম থাকে। তার ফলে এই আবর্জনা সারেতে অন্যান্য সব সারগুলি থাকলেও কেবলমাত্র এই সারটির অভাবে অনেক সময় জমিতে ভাল ফসল হয় না। মাটিতে সোজাসুজি ফসফরাস সার না ছড়িয়ে যদি এই কমপোষ্টের মধ্যে পরিমাণ মত ফসফেট সার মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে খুব ভাল হয়। অনেক সময় মশা, মাছি ইত্যাদি প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে পরিমাণ মত বোরিক এসিড ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। প্রাণীর বিষ্ঠা থেকে সার তৈরী করতে গিয়ে চুণের-গোলা ছড়িয়ে দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কমপোষ্ট সার (বিষ্ঠাদি)—বৃক্ষলতা গুল্মাদি পচে যে সাব তৈরী হয় তাকে বলা যায উদ্ভিজ্জ সাব বা কমপোষ্ট সার। কিন্তু কমপোষ্ট সার বলতে আজকাল সহবের আবর্জনা ও পাযখানাব মযলা পচিযে যে সাব তৈরী করা হয তাকে বোঝায। নানা প্রকাবেব বীজাণু ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'ফাঙ্গাস" জাতীয বীজাণু এই পচন ক্রিযার সাহায্য কবে।

পৃথিবীব নানা দেশে এর ব্যবহার চলে আসছে অতি প্রাচীন কাল থেকে। চীন দেশে, আজ থেকে প্রায ৪০০০ পূর্বে চীনদেশে এব প্রচলন দেখতে পাওযা যায। আমাদের দেশে এব ব্যবহাব খুব বেশি দিনেব নয়। যারা ধাপাব কপি সম্বন্ধে খবব বাখেন তাঁবা জানেন শীতকালের কপি উৎপাদনে এই সার আমাদেব দেশে খুব বেশী ব্যবহৃত হয। এ ভিন্ন আজকাল নানা রকম ফসলে এব প্রযোগ দেখা যায। তবে পায়খানার মযলা বলে এ সম্বন্ধে আমাদেব দেশেব লোকেব বেশ গোঁড়ামি ছিল। সেটা আজকাল আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

ধান ও যবেব ক্ষেতে যে সমস্ত খড় ও গোযাল ঘবে যে সমস্ত রাত্রির খড় কুট পাওযা যায সেগুলি কমপোষ্ট তৈরীব জন্য ব্যবহৃত হয। রাসাযনিক পরীক্ষা দ্বাবা দেখা গিযেছে যে ৬০ ভাগ সেলুলোজ ও আধা সেলুলোজ দিয়ে এই জাতীয় পদার্থগুলিব সৃষ্টি। এই সেলুলোজগুলি প্রভূত নাইট্রোজেন ও অন্যান্য ধাতর পদার্থেব সংযোগে পচে যায। কিন্তু লিগনিনে যে নাইট্রোজেন থাকে তা খুব তাডাতাডি পচে না। কিন্তু লতা-গুল্মাদিতে যে সমস্ত অতি সহজ পচ্য পদার্থ আছে সেগুলি সত্বব মাটিতে পচতে থাকে ও সমস্ত প্রোটিন এক জাযগায জমা হয়। বৃক্ষলতাদি পচে যে সার তৈরী হয সেগুলি এই পচা সেলুলোজ ভিন্ন আর কিছুই নয। এই সেলুলোজগুলি অতি সহজে নাইট্রোজেন উৎপন্নকারী বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ফাঙ্গাস জাতীয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য জাতীয় বীজাণু। প্রথমেই এই বীজাণু খড়ের বা লতাপাতার উপর একটি অতি সূক্ষ্ম সেলের দ্বারা আবৃত করে ফেলে। এরই ফলে [illegible]

লতা-পাতার প্রায় এক পঞ্চমাংশ কঠিন জাতীয় পদার্থে পচন ক্রিয়া সুরু হয়। এই কঠিন জাতীয় পদার্থকে অন্য যৌগিক পদার্থে পরিবর্তিত করতে গেলে বহু-পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস জাতীয় সারের প্রয়োজন হয়। কারণ নাইট্রোজেন ও ফসফরাস দিয়ে ক্ষুদ্র নলের মধ্যে প্রোটিন সৃষ্টি হয়, যেহেতু সেলুলোজের পচন ক্রিয়ার উপর কার্বন জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি নির্ভর করে। সেই হেতু সেলুলোজের পরিমাণের উপর নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ভর করে।

যে সমস্ত বৃক্ষ, লতাগুল্মাদির দ্বারা উদ্ভিজ্জ সার বা কমপোষ্ট সার তৈরী হয় তাহাতে বহুল পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে না। সেই কারণে কিছু রাসায়নিক নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। এর ফলে সেই কমপোষ্ট সারে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ও সেলুলোজের পরিমাণ কমে যায়।

কমপোষ্ট সৃষ্টিতে অতি আবশ্যকীয় পদার্থ—(১) বৃক্ষ, লতা-গুল্মাদি জাতীয় পদার্থ ধান, যব, গম, জোয়ার ইত্যাদির খড়। নানা প্রকারের আগাছা, গাছের পাতা, তামাক, সরিষা, রেড়ি ও কার্পাস গাছের ডাঁটা, চায়ের পাতা, কলাগাছের পাতার অংশ, কচুরীপানা ও অন্যান্য পচা দ্রব্যাদি।

(২) প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন, যে পরিমাণে উদ্ভিজ্জ জাতীয় পদার্থ ও মলমূত্রাদি দেওয়া হয় ঠিক তার অর্দ্ধেক পরিমাণ জলের প্রয়োজন। জল বেশী হলে বীজাণু সৃষ্টিতে বাধা পড়ে। উষ্ণমণ্ডলে খুব তাড়াতাড়ি জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে যায়। সুতরাং কিছু বেশী জলের প্রয়োজন হয়।

(৩) এই খাদে রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রয়োজন হয়, যেমন গরুর গোবর ও মলমূত্রাদি কিম্বা ক্যালসিয়াম সিয়ানোমাইড বা এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ।

সাধারণতঃ যব, গম ও ধানের খড়ে শতকরা ০·৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। পচন ক্রিয়ার সুবিধার জন্য আরও ০·৭ ভাগ নাইট্রোজেন যোগ করা উচিত। মলমূত্রাদিতে উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে সুতরাং আর রাসায়নিক

পদার্থের প্রয়োজন হয় না। লতাপাতা ইত্যাদিতে উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে না। সব থেকে ভাল হয় খড়, লতাপাতা ও ঘাসের আবর্জনাগুলি জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া, কারণ এগুলি শুকনা অবস্থার কোন কাজের হয় না।

যাহাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হয তার জন্য প্রয়োজন বায়ুর। সেজন্য যতদূর সম্ভব আবর্জনাগুলি উলটে পালটে দিতে হয়।

রাসায়নিক পদার্থ যোগ করবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত যে কি কি পদার্থ সেই গাথার মধ্যে দেওযা আছে। যদি কোন খাদের মধ্যে কেবলমাত্র আবর্জনা ফেলা হয তবে সেখানে রাসাযনিক পদার্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। যেখানে রাসাযনিক পদার্থের দেওয়ার প্রযোজন নাই যেমন মলমুত্র ইত্যাদিতে, রাসায়নিক সার দিলে পরে কঠিন জাতীয় পদার্থের হ্রাস পাওযার সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন সমযে নাইট্রোজেনও হ্রাস পায়।

কমপোষ্ট প্রস্তুত-পদ্ধতি—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতির প্রচলন আছে। যখন গত মহাযুদ্ধে জাপানের রাসায়নিক সার কম পড়ে গেল তখন সেখানকার মাটিতে কেবল মাত্র কমপোষ্ট সার ঢালা হযেছিল। এর আগে বলেছি চীন দেশে কমপোষ্ট সার জমিতে দেওযার রীতি বহুদিন ধরে চলে আসছে।

সাধারণভাবে ৪০′ উচ্চ স্তূপ তৈরী করা হয়। খড়, লতাপাতা, আখের ছিবড়া আনুমানিক ৪০″ উচ্চ করে রাখা হয। এতে উপযুক্ত পরিমাণে জল দিযে তার উপর ১০″।১২″ চওড়া পাতলা একটি মলমূত্রের স্তর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সারে যদি পরিমাণ মত ফসফরাস জাতীয সার (সুপারফসফেট) এই সমযে এই স্তূপের মধ্যে মিশিযে দেওয়া যায়, তবে খুব ভাল হয়। এ পর্যন্ত করবার পর উপরটা টেবিলের ছাদের মত সমান হয় তবে পাশের দিকে ঢালু হবে টিবির পাশের ঢালের মত।

এইবার ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয় আর যেন সূর্যের উত্তাপে

এগুলি শুকিয়ে না যায়। এক মাসের মধ্যে এই স্তূপে আর হাত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এক মাস পরে এগুলি একটু উলটিয়ে দিলে ভাল হয়। এতে এই স্তূপের সকল অংশে সমান ভাবে পচন ক্রিয়ার সুবিধা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গর্ত খুঁড়বার রীতি হলো—৬মি × ২মিঃ × ২মিঃ (১মিঃ = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি)। এই দেশে মাঝে মাঝে এই আবর্জনা-স্তূপে চুণ দিবার রীতি আছে। বড় জাতের গাছে কমপোষ্ট সার ২ মাসের মধ্যে তৈরী হয়। কিন্তু জমির ব্যবহার উপযোগী সার তৈরী করতে অন্ততঃ ৪ মাস সময় লাগে। রাশিয়ায় স্তূপের উপর যে ঢাকনি দেওয়া থাকে সেটা মাসে একবার করে বদলিয়ে দেওয়া হয় আর গোবর জাতীয় অংশের সহিত কিছু ফসফেট মিশিয়ে দেওয়া হয়।

ADCO পদ্ধতি—একটি বৃটিশ কোম্পানী এই জিনিষটির প্রচলন করেছেন। এর কার্যকারিতা ও পচনক্রিযার গতি নির্ভর করে ADCO পাউডার ছড়ানোর পরিমাণের উপর। ঠিক কি দিযে ADCO পাউডার তৈরী তা জানা যায়নি—কারণ এটা হলো তাদের ব্যবসাযিক গোপনতা। তবে দেখা যায় যে এর মধ্যে আছে এমোনিযাম সালফেট, সিয়ানামাইড ও ইউরিয়া —এই তিন প্রকার পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত কোন পদার্থ।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে ১২" একটি খড়ের স্তর স্থাপন করা হয। পরে উপযুক্ত পরিমাণ জলসিঞ্চন করে, উপযুক্ত পরিমাণে ADCO পাউডার যোগ করা হয়। এই রকম উপর্যুপরি ৬টি স্তর স্থাপন করা ভাল। ১ টন শুষ্ক উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে দেড় হন্দর ADCO পাউডার যোগ করা উচিত। ১৫' × ৬' × ৬' খাদের আযতন।

জমির কাজ শেষ হযে যাওয়ার পরে অনেক আবর্জনা জমির মধ্যে পড়ে থাকে। চাষী সেগুলি সংগ্রহ করে এবং খড়, কাঠ, লতাগুল্ম, আগাছা ও ঘাস প্রভৃতির সহিত এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রাখে। অবসর সময়ে বড় বড়

লতা কাঠ, খড় ইত্যাদি ছোট করে টুকরা করে। তার পর সেগুলিকে ভাল করে মিশিয়ে ৬'×৪'×২' আয়তক্ষেত্রে স্থাপন করে।

আনুমানিক ১ মণ কাঁচা গোবর নিয়ে সমপরিমাণ জলের সহিত মিশিয়ে নেওয়া হয। তার পর ঐ মিশ্রিত গোবর জল ঐ স্তূপের উপর ঢেলে দেওয়া হয ও স্তূপটিকে ভিজিযে রাখা হয। যতদিন না স্তূপের উত্তাপ বৃদ্ধি পায তত দিন বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। উত্তাপ বাড়বার কয়েক দিন পরেই উষ্ণতা কমে যায, এই পদ্ধতিতে দেখা যায যে গোমূত্র বিশেষ উপকারী কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে এই গোচোনা পাওযা যায না। এটা শেষ হলে নূতন একটি স্তূপ আরম্ভ করা উচিত।

ডাঃ আচার্য একটি নূতন পদ্ধতির চলন করেন। ভারতে সাধারণতঃ আবর্জনা ও মলমূত্র দিযে কমপোষ্ট তৈরী করা হয। খাদের মাঝখানে গাড়ী যেতে পারে এমন উপযুক্ত পরিমাণ জাযগা রাখা হয। অন্ততঃ প্রযোজন মত খাদ লম্বালম্বি তৈরী করা হয়।

লোকসংখ্যা—

১০,০০০ হাজারের কম	২০'×৬'×৩'
১০,০০০ থেকে ২০,০০০	২৫'×৭'×৪

খাদের আযতন যত চওড়া থাকবে ততই ভাল। গ্রামে খানা প্রস্তুত করে প্রথমে নীচের অংশে ৯"।১০" পরিমিত স্থানে সহবের আবর্জনা খড়-কুটা ইত্যাদি দিতে হয। ইহার উপরে ৩" পুরু করে মলমূত্রাদি ঢেলে দিতে হয। এর উপর আবার ১০" আবর্জ্জনা সার দিযে পয়ে আবার মলমূত্রাদি। এমনি করে তিনটি স্তর হবে। (১ কিউবিক ফিট আবর্জনার ওজন ২০ পাউণ্ড। ২০'+৫'×৪/১২=১৮০০ পাঃ আনুমানিক ১ মেঃ টন) ১ কিঃ মিট মলমূত্র= ৬২.৫ পাঃ ২৯'×৬'×৪/১২=১৮৭৫ পা আনুমানিক ১ মেঃ টন।

সমস্ত মাল মসলা ঢালা হয়ে গেলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

যদি ৫।৭ দিনের মধ্যে কোন খানা ভর্তি না হয় তবে ভাল ঘাসের চাপড়া-দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, কারণ—

(১) ইহা মাছির হাত থেকে মলমূত্রকে রক্ষা করবে।

(২) এমনভাবে সংরক্ষিত হবে যাতে কোথাও জল দূষিত না হয়।

(৩) মলমূত্রাদি খাদে ফেলবার আগে রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে প্যাথোজিনিক বীজাণু নষ্ট করতে হয়।

মশা ও মাছির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ইহা ঢেকে রাখাই ভাল। যে সমস্ত মলমূত্রাদি রক্ষিত হবে সেগুলি ঢেকে রাখা উচিত। যদি ডিম্ব ও অন্যান্য বীজাণু মাটির নীচে থাকে তবে ঘাসগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই বীজাণু সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা উচিত। যদি এই কাঁচা সার জমিতে দিতে হয় তবে জমিতে ফসল বাড়ার পরিমাণ কমে যাবে ও মাটির বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় সেখানে মাটির নীচে খাদ করলে, জলে ডুবে যাবে। জলের মাধ্যমে বহু রাসায়নিক পদার্থ স্তূপ হতে বার হয়ে যাবে। সে জন্য ভূমির উপর বাঁধ দিয়ে, মাটির বা ইঁটের খাদ করা উচিত। তবে যেখানে মাঝারি রকমের বৃষ্টি হয় ও ভূ-নিম্নস্থ জলের স্তর নীচে থাকে সেখানে মাটির নীচে খাদ করলে কোন বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। মাটির উপরে স্তূপ করলে ভাল হয়।

কমপোষ্টের উপকারিতা—(১) সাধারণতঃ মাটির বৈশিষ্ট্যের উন্নতি করে। বালুময় জমিতে দিলে এক একটি বালুকণায় বাঁধন তৈরী করে, আবার কাদা মাটিতে দিলে ঘন সন্নিবিষ্ট একটি কাদামাটির কণাকে অন্যের কাছ থেকে ছিঁড়ে টেনে আনে।

(২) কমপোষ্টের মধ্যে জৈব পদার্থ বা কার্বন জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে। তার ফলে এই সার জমিতে দিলে মাটির এই কার্বন জাতীয় পদার্থ বৃদ্ধি পায়। এ ভিন্ন অন্য রাসায়নিক পদার্থ বৃদ্ধি পাবে। নাইট্রোজেন,

ফসফরাস, পটাস ও ক্যালসিয়াম। ইহা ছাড়া, বৃক্ষাদির কোন অংশ যখন মাটিতে পচে তখন সেখানে কার্বনডায়অক্সাইড বাষ্প (CO_2) তৈরী হয় এবং জলের সহিত মিশে H_2CO_3 তৈরী করে। এর ফলে গাছের খাদ্য-গ্রহণের সুবিধা হয়। (৩) যখন এই সার মাটিতে দেওয়া হয় তখন জমিতে বীজাণুব বংশ-বৃদ্ধি হয়। মাটিতে এই বীজাণুর বৃদ্ধিব ফলেও মাটিতে ফাঙ্গাস জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছের বৃদ্ধিব জন্য মাটির ফসল বাড়ানোর ক্ষমতা বাড়ে।

মানুষের মলমুত্রাদি—মানুষের মলমূত্র দিয়ে সার তৈরী করার রীতি নূতন নয়। আজ থেকে ৪০০০ হাজাব বৎসর পূর্বেও চীন দেশে মানুষের পবিত্যক্ত বিষ্ঠা থেকে সার তৈরীব পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইহার দ্বারা দেশের শতকবা ১০ ভাগ সাবের চাহিদা মেটে। জাপানেও এর চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ১৯৪৫ সালে যত সার জাপানের জমিতে দেওয়া হয়েছিল তাব শতকরা ১১'১ ভাগ এসেছিল এই মানুষের মলমুত্রাদি থেকে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদেব দেশে এর বিশেষ প্রচলন ছিল না। কারণ এ সম্বন্ধে মানুষেব অস্পৃশ্যতা এব জন্য দাযী। আজকাল কৃষকের সে মনোভাব চলে যাচ্ছে। এখন আমাদের দেশের বহু কৃষক আর জমিতে এই সার ছড়াতে গররাজি নয। কারণ তারা দেখেছে এ দিয়ে তারা জমি থেকে ভাল ফসল পেতে পাবে।

চীন দেশে দুইটি বিশেষ অঞ্চলে যেখানে ধান ও গম উৎপাদন হয়, সেই দুটি অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত আছে। সেখানে অবশ্য মানুষের মলমুত্রাদির সহিত অন্যান্য পশুর মলমূত্রাদি মিশিযে দেওযা হয়। মানুষের মলের সহিত অন্যান্য পশুর মল মিশিয়ে ঘুঁটের আকারে ৭।৮ দিন শুকিয়ে নিয়ে অনেক সময় সেটা গুঁড়া করে নিয়ে জমিতে ছড়ান হয। এর মধ্যে থাকে শতকরা ৯ ভাগ জলীয় পদার্থ, ৫৯ ভাগ ছাই, ১।৭ ভাগ নাইট্রোজেন, ১।৯ ভাগ অন্যান্য রাসায়নিক অম্ল পদার্থ ও ১৯ ভাগ জৈব সার বা কার্বণ জাতীয় পদার্থ,

কেবলমাত্র পশুদের বিষ্ঠা থেকে এই পরিমাণ সার পাওয়া যায়, কারণ মূত্রাদি তরল পদার্থ রক্ষণের কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। কিন্তু দক্ষিণ চীনে এই তবল ও শক্ত উভয় জাতীয় পদার্থ থেকে সার তৈরী হয়। কোন খাদের মধ্যে এগুলিকে পচিয়ে নিয়ে কৃষক এগুলিকে জমিতে ছড়ায়। অনেক সময় এর সঙ্গে খড়কুটা ইত্যাদি মিশিয়ে নেয়। এতে খুব সুন্দর কমপোষ্ট সার তৈরী হয়।

আমাদেরে দেশের পল্লীগ্রামে এদেব সংবক্ষণেব কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ সেখানে কোন বিশেষ স্থানে কেহ মলমূত্রাদি ত্যাগ কবে না। অথচ আমাদের দেশের শতকরা ৭০ জন লোকেরও বেশী পল্লী অঞ্চলে বাস কবে। কিন্তু সহরে ও সহরতলীতে একটু চেষ্টা করলেই এগুলি সংবক্ষণ করা যায়। যেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে সেখানে কোন লোহার কড়া, বালতি বা গামলা বসিয়ে বেখে এগুলি সংগ্রহ কবা যায। পবে প্রত্যহ সকালে সেগুলি কোন একটি গাডীব সাহায্যে বড পাত্র দিযে যেখানে খাদ করা থাকে সেখানে এনে ঢেলে দেওযা হয। ৩।৫ সপ্তাহ মাটি চাপা দিযে রাখলে কমপোষ্ট তৈরী হযে যায। অবশ্য জমিতে দিবার মত হতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগে।

মাটিতে কখনই কাঁচা অবস্থায এই সার দেওযা উচিত নয। তাতে উপকাব থেকে অপকারই বেশী হবে। আর এই মলমূত্রাদি জল ঢেলে খুব তরল করে নিতে হয, নতুবা কোন খাদে এগুলি সবিযে নিলে ভাল হয। অন্ততঃ তিন মাস ধরে পচান উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে ৪ মাস মাটির তলায় রাখলে ভাল হয়। কারণ এর মধ্যে যে সমস্ত বায়ু দূষিতকারক বীজাণু থাকে সেগুলি এই সময়ের মধ্যে নষ্ট হযে যেতে পারে। তা বাদে টাটকা মলমূত্র জমিতে জমা করলে অস্বাস্থ্যকর আবহাওযা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

জাপানী কৃষকেরা জমিতে এই সার জমা করবার আগে কোন খাদের মধ্যে এগুলি পুঁতে রাখে। আবার অনেক সময় এর সঙ্গে কেহ ক্যালসিয়াম

সালফেট যোগ করে নেয়। অনেক সময় অনেক যত্ন করে এদের রক্ষণাবেক্ষণ করলেও কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন এর থেকে নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য নাইট্রোজেন ও কার্বন জাতীয় সার ভিন্ন অন্যগুলি অতি সহজে নষ্ট হয় না। প্রথমে মিশ্র নাইট্রোজেন পদার্থগুলি বিভিন্ন বীজাণু প্রক্রিয়ার ফলে মলমূত্রাদি হতে এমোনিয়ার সৃষ্টি করে। পরে সেখান থেকে এমোনিযাম কার্বনেট এবং শেষে নাইট্রেট তৈরী হয। বেশীদিন বায়ুতে এ স্তূপ থাকলে নাইট্রোজেন অর্ধেক চলে যায। চীন দেশে এর পরীক্ষা হযেছে। চীনারা দেখিযেছেন যে ১২ সপ্তাহ স্তূপ করে রাখলে শতকরা ৫০ ভাগ নাইট্রোজেন কমে যাবে আর ভাল ভাবে রাখলে ১৬ সপ্তাহে ১৬% অংশ কমে যাবে। মলমূত্রাদিতে থাকে—

নাইট্রোজেন—০·৫১%
পটাশ— ০·২৩%
ফসফরাস— ০·১০%
কার্বন জাতীয় পদার্থ ১·৪% থেকে ১·৭%।

এই মলমূত্রাদির থেকে সার তৈরী করে চীনারা দেশের মাটির ফসল বাড়িয়েছে, ফলে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে একথা নিশ্চিত, কিন্তু একপক্ষে দেশের ক্ষতি করেছেন। চীন দেশে মৃত্যুর হার খুব বেশী। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এই মলমূত্রাদি যেখানে সেখানে ছড়িয়ে তারা দেশে উৎকট ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়েছেন এবং তাঁরই ফলে চীন দেশে মৃত্যুর হার এত বেশী। তা-বাদে ইহাই চীনাদের শারীরিক অবনতির মূল কারণ বলে অনেকে মনে করেন। মানুষের মলমূত্রের সাহায্যে দেশে কলেরা, টাইফয়েড, প্যারা-টাইফয়েড ও এমোবিক আমাশা প্রভৃতি বহু দুরারোগ্য রোগ দেশের একাংশ থেকে অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। মলমূত্রাদি থেকে তৈরী কমপোষ্ট সার জমিতে দেওয়ার থেকে রাসায়নিক সার জমিতে দেওয়া খুব ভাল। তবে বিশেষভাবে পচিয়ে জমিতে দিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

মনে রাখতে হবে—

(১) যেখানে এই মলমূত্রাদি পচিয়ে জৈব সার বা আবর্জনা সার তৈরী করতে হবে সেটা যেন লোকালয় থেকে বেশ দূরে হয় এবং সেখানে যেন মশা মাছি না থাকে।

(২) এমন ভাবে পচাতে হবে যাতে পচানোর ফলে জল ও বায়ু দূষিত না হয়।

(৩) এই মলমূত্রাদি খাদে বা রক্ষণাগারে ঢালবার পূর্বে এর মধ্যে যে সমস্ত রোগের বীজ ও বীজাণুর ডিম থাকে বা অন্য প্রোটোজোয়া থাকে সেগুলি নষ্ট করে ফেলতে হবে।

আজকাল দিনে দিনে সারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সহরে ও সহরতলীতে গাড়ীতে করে মলমূত্রাদি বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। মাছের আঁশ, কাঁটা ও অন্যান্য আবর্জনা কম ক্ষতিকর। তবুও সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে এরা যেন জনস্বাস্থ্য দূষিত না করে ফেলে এবং যাতে মানুষের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়। মাটির নীচে এগুলি রাখলে প্রোটোজোয়া প্রভৃতি বীজাণু নষ্ট হয়ে যায়।

নগরের আবর্জনা ও মলমূত্রাদি—মানুষের ও পশুর মলমূত্রাদি ও সহরের যে সমস্ত অন্য আবর্জনা জমে সেগুলিকে কিভাবে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বা সহরের নিকটবর্তী নদী বা পুষ্করিণীর জল ইহার দ্বারা দূষিত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যহানি না করে তার জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে বিশেষ অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং সহরের পৌর-বিভাগ ও প্রতিটি দেশের সরকার এ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। এই সহরের ময়লার মধ্যে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিষ নেই। কারণ মানুষের ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত প্রায় লক্ষাধিক দ্রব্য পচে এর সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সকল রকমের পচানি সার বিদ্যমান থাকে। তার মধ্যে কার্বন জাতীয় পদার্থ ও লতাগুল্ম পচানি সার বেশী। এই দুইটি বিভিন্ন পচানি সার তৈরী করতে দুইটি বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এ

বিষযে কাজ করতে গিযে প্রধান লক্ষ্য হবে মানুষের কোন স্বাস্থ্যহানি না করে অতি অল্প দামে এই সার কৃষকের মাঠে পৌঁছিযে দেওযা।

কলিকাতার মত বড সহরে মানুষের মলমূত্রাদি জলের সাথে মিশিযে দূরে সরিযে ফেলা হয। এর ফলে এর মধ্যে যে ঈষৎ শক্ত পদার্থ থাকে সেগুলি জলের সাথে মিশে যায। কারণ এর শতকরা ৯৯ ভাগই জল। এর মধ্যে যে সমস্ত অদ্রবণীয পদার্থ থাকে সেগুলি এই মযলা পদার্থ হতে বাইরে আসে এর পরে আবার জলের সাথে মিশে যায। কোন সমুদ্রের বা নদীর জলের সাথে মিশে যাবার আগে এর সাথে প্রচুর ক্লোরিণ্‌ মিশিযে দেওযা উচিত।

যে সমস্ত শক্ত অদ্রবণীয পদার্থ জলের সাথে বাহির হযে আসে সেগুলিকে রাসাযনিক পদ্ধতিতে ছাঁকিযা লওযা হইলে (Screening) যাহা পাওয়া যায সেগুলিকে পুড়িযে বা মাটির তলে পুতে এর থেকে সার প্রস্তুত হয। এর মধ্যে যে গুলি খুব শক্ত কণা সেগুলিকে নিযে সালাজ তৈরী হয (Sludge)। এতেও কিছু জল থাকে। সেগুলিকে আরও শুকিযে নিযে একেবারে জলবিহীন করা হয। পরে গুঁড়া করে দেওযা হয। ভিজা স্লাজকে অনেক সময সার হিসাবে ব্যবহার করা হয। এগুলিকে সার হিসাবে মাঠে ছড়ানোর আগে ভাল করে শুকিযে নেওযা উচিত।

এতে ভাল কাজ হয না। কারণ এতে যে নাইট্রোজেন থাকে তার শতকরা ৫০ ভাগ থাকে তরল পদার্থের সহিত মিশে। ফসফরাস ৫০ ভাগ থাকে জলের সহিত মিশে। আর যে পটাস থাকে তার প্রায সবটাই থাকে জলের সহিত মিশে সুতরাং কোন প্রকারে জল মাঠ থেকে চলে গেলে এই সার গুলিও চলে যায। সেইজন্য অনেক দেশে এই জল দিয়ে মাটিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করেন। এর প্রধান অসুবিধা বড বড আকারের কৃষিক্ষেত্রগুলি সহরের নিকটে থাকে না। ফলে দূরে এই সহরের মযলা জল টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়। যে কারণেই হউক যদি এ মযলা জল পাওযা যায় তবে এটা কৃষি ক্ষেত্রের নিকটে হওয়া উচিত। জার্মানীতে শুধু বর্তমান কালে নয় আজ থেকে ১০০০

বৎসর আগেও মাঠে এইভাবে সার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। কৃষি-ক্ষেত্রগুলি সহরের থেকে বেশী দূরে হলে মাঠে এই স্লাজ নিয়ে যাওয়া কষ্টকর, কারণ পথে যেতে বহু স্লাজ নষ্ট হযে যায। যেখান দিযে যাবে সেখানকার চলন্ত বাতাস দূষিত করে ফেলবে। তাই প্যারিস ও বার্লিন সহরের নিকটে যে সমস্ত কৃষিক্ষেত্র আছে সেই মাঠের ফলন বেশী। কারণ সেখানে এই স্লাজ দিয়ে সার দেওযা হয। কেবলমাত্র প্যারিস সহরের নিকট ১৯৩৬ সালে ১,৫০,৮০০ একর জমিতে ও বার্লিনের নিকটে ২৮,০০০ একর জমিতে এইভাবে চাষ করা হয়েছিল। আমাদের দেশেও সচরাচব সহরের আশে পাশে এইভাবে চাষ চলতি আছে। খড়্গপুর সহবে প্রায মাঝখানেই এইভাবে চাষ করে জমির মালিক প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন।

যেখানে বৃষ্টিপাতের পবিমাণ কম, আবহাওযা উষ্ণ যেখানকার মাটি বালুময় সেখানে এই দিযে জল সেচনের কাজ করলে মাটিতে কেবলমাত্র জলের বৃদ্ধি হয না তার সঙ্গে অন্য যে সমস্ত ধাতব ও কার্বন জাতীয সার থাকে, সেগুলি এই মৃত্তিকা কণার ফাঁকে স্থাপিত হযে বন্ধন রজ্জু সৃষ্টি করে। এতে যেমন এগুলি গাছের সহজ লভ্য হয গাছও বাড়ে তেমনি পরোক্ষভাবে মাটিরও উন্নতি বিধান করে। যদিও এই জলেতে প্রচুর পরিমাণে পটাস ও ফসফরাস জাতীয় সার থাকে তবুও সেটা গাছের গ্রহণ-যোগ্য হয় না। কারণ জলের সহিত চুঁইয়ে কিছু পরিমাণ সার মাটির নিম্নস্তরে চলে যায। এইভাবে মাঠে জলসেচন ও সার দিতে গেলে মাটিব দিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ বালুকাময মাটি ভিন্ন অন্য কোন মাটিতে এই জাতীয সার দিলে জল সহজে নীচে চুঁইযে যেতে পারবে না এবং ফলে একটি অপ্রবেশ্য স্তরের সৃষ্টি করবে।

আফ্রিকার জোহান্সবার্গের নিকটে কযেকটি কৃষিক্ষেত্র আছে যেখানে কেবলমাত্র এইভাবেই চাষ করা হয। এইভাবে সার দেওয়া ও জলসেচনের মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে যে বালুকণাপূর্ণ মাটিতে ঐ তলানি সার দুই বালুকণার মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেবে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে মাটিতে এই ভাবে

সার ও জলসেচন করে মাঠের মাটির উন্নতি হয়েছে এবং মাঠে ঘাস জন্মেছে অসম্ভব পরিমাণে। এখানে প্রতি কৃষককে গরু চরানোর জন্য মাথাপিছু দৈনিক ৩ পেনি দিতে হয়।

সাধারণতঃ তিনটি উপায়ে সহরের এই জাতীয় ময়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(১) জলসেচনের ব্যবস্থার সহিত এই ময়লা জল মাঠে কেবলমাত্র যখন ঘাসের চাষ হয় তখন দিয়ে দেওয়া হয়, গরমকালে আমাদের দেশে ঘাসের অভাব হয়। তখন যদি কোন ঘাসেব ক্ষেতে এই জল দেওয়া যায় তবে ঘাসের খুব ভাল বৃদ্ধি হবে। কারণ এই সময়ে ১৮ দিন অন্তর মাটি ভিজিয়ে দিতে পারলে ক্ষেতেব পক্ষে খুবই ভাল হয়। একবার জল সেচন করলে, ৩ দিন থেকে ৫ দিন লাগবে জল শুকাতে। তার পর ১২ দিন পশুতে সব মাঠে ঘাস খাবে। এভাবে ভাল ফল পাওয়া গেছে। শীতের দিনে এর ব্যবস্থা না করাই উচিত।

(২) সহরের ময়লা জলকে একটু পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। এতে একটু তলানি পড়ে যাবে। তারপর ঐ জল ক্ষেতের মধ্যে চালিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) সমস্ত ময়লা জমা করা। জোরালো স্লাজ তৈরী করবার জন্য তলানি পড়িয়ে নেওয়া হয় ও জলটিকে কোথাও জমা করে রাখা হয়। তারপর সময়মত সেখান থেকে সব জল মাঠের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হয়।

এদিয়ে মাঠের প্রচুর উন্নতি হয় ও মাঠে প্রচুর সার যোগ হয়। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল—

	জলসেচনের আগে	জলসেচনের পরে	
	১৯১২	১৯২৪	১৯৩৮
নাইট্রোজেন	০.১৩	০.২৬	০.৫
ফসফরিক এসিড	০.০৫	০.১৭	০.২৫
পটাস	০.১৫	০.৮০	১.৮০
চুণ	০০.৬	০.৩২	৯.৩৯

সহরের এই ময়লা থেকে আরও অন্য রকমের শ্লাজ তৈরী করা যেতে পারে। (১) কেবলমাত্র তলানি সাঁরের কণাগুলি একটু আকারে বড। নইলে যেগুলি জলের সহিত মিশে থাকে সেগুলি অতি ক্ষুদ্র। (২) ঐ তলানি সাব কয়েকদিন কোন বায়ুহীন স্থানে রেখে দিলে যে বীজাণু প্রক্রিয়া ঘটে তাতে এই শ্লাজের উন্নতি হয। (৩) এই ময়লা জলে তবুও বহু পরিমাণে কাদা ও অন্যান্য পদার্থ থাকে এবং তাদের তলানি পড়বার গতি খুব কম হওয়ায (Settling velocity) এদের তলানি পড়তে বহুদিন লাগে। এইজন্য এক জাযগায এটাকে বদ্ধ অবস্থায রাখা হয। তারপর যখন, দেখা যায যে জলটা প্রায স্বচ্ছ হযে এসেছে তখন তলানি পড়া জিনিষ, জল বার করে দিযে, তুলে নিযে বেশ ভাল করে শুকান হয। শুকালে পর একে গুঁড়া করে নেওয়া হয। এগুলিকে বলা হয (Activated sludge) (৪) শ্লাজের এই অংশে কিছু জল দিযে আবার বীজাণুক্রিযা করা হয একে বলে (Digest activated sludge).।

লেগুমিনাস জাতীয গাছের নডুলগুলি (মাটির নীচের ফোলা অংশগুলি) মাটির উপরের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিযার মধ্য দিযে মাটিতে ক্যালসিযাম নাইট্রেট সৃষ্টি করে। গাছ, যতদূর জানা গেছে এই রাসাযনিক পদার্থ গ্রহণ করে বেড়ে উঠে। মাটিতে যে ঘাস জন্মায সেই ঘাস খায আমাদের দেশে যত গৃহপালিত পশু। প্রাণী দেহেতে বিভিন্ন গঠন ও ভাঙ্গন ক্রিযার (Anabolism and catabolism) মধ্য দিযে গাছের দেহ থেকে নাইট্রোজেন বা অন্যান্য দ্রব্যগুলি প্রাণীদের শরীরের বিভিন্ন অংশে মিশে যায ও নানা প্রকার রাসাযনিক পদার্থ প্রস্তুত করে শরীরের উন্নতিসাধন করে। আবার নানা প্রকার জৈবিক ধর্মের মাধ্যমে এগুলি দেহ থেকে বেরিযে আসে। গোবরের মধ্যে যে সার থাকে তার শতকরা ৭৫% নাইট্রোজেন, ৬০% ফসফরাস ও প্রায শতকরা ৮০% পটাস। এই প্রাণীদের মলমূত্রাদি থেকে বেশী পরিমাণে ঘাসের সার জাতীয পদার্থ পাওযা যায। এমন

কি মাটিতে যে সমস্ত অপ্রধান ধাতু যেমন "বোরণ, মালিবডিনাম, ক্লোরিণ ইত্যাদি" থাকে সেগুলিও মলমূত্রের সহিত বাহিরে আসে আবার শাক সব্জী বা কোন গাছের মধ্য দিয়ে জীবদেহে প্রবেশ করে। আবর্জনা সারের স্তূপে কিছু পরিমাণ ফসফরাস যোগ করে এবং মাটির অম্লতা (acidity) বৃদ্ধি পেলে পরিমিত চুণ ছড়িয়ে দিয়ে যদি উপযুক্ত রোঁটেশানে মাঠে ফসলোৎপাদন করা হয় তবে অন্য কোন রাসায়নিক সার না দিয়েও মাঠের উর্বরতা শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং ফসফরাসের বৃদ্ধি করা যায়। সমস্ত বিষয়টি নির্ভর করে আবর্জনা সারের তৈরী করার পদ্ধতির উপর। সুপার ফসফেট মিশ্র সারে বিশেষ কাজ পাওয়া যায় কারণ সুপার ফসফেট কেবলমাত্র মাটিকে ফসফরাসই দেয় না বরং মাটিতে যদি বীজাণু প্রক্রিয়ায় এমোনিয়া সৃষ্টি করে তবে তাকে ধরে নিয়ে নূতন একটি মিশ্র পদার্থ তৈরী করতে সাহায্য করে।

আবর্জনা সার মাঠে ছড়াবার সব থেকে ভাল সময় মাঠে বীজ ছড়াবার বা কোন গর্তে চারা গাছ পুতবার অন্ততঃ ১৫দিন আগে। সব থেকে ভাল হয় যখন চাষের জন্য প্রথমবার মাটি খোঁড়া হয় ঠিক তার পরেই যদি এই সার মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় লাঙ্গল দেওয়া যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সার জমিতে ছড়াবার পরে যেন বৃষ্টিতে জমির সমস্ত সার না ধুয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে কৃষক প্রথম চাষ দেবার পরই জমিতে আবর্জনা সার স্তূপ করে রেখে দিয়েছেন কিন্তু ছড়িয়ে দেননি। এতেও ফল খারাপ হয়, কারণ আবর্জনা সারের জলকণা শুকিয়ে আসে। তার ফলে কতকগুলি বীজাণু অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আবর্জনা সার জমিতে ছড়াবার পর অন্ততঃ ২বার লাঙ্গল দেওয়া উচিত।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে ক্ষেতে শস্য পরিবর্তন করে ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও এ কথা কৃষকদের কাছে অজানা নয়। অনেকেই জানেন পাটের পরে ধান ভাল পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকের

আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও তারা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না। তাই তারা বছরের পর বছর ধানের ক্ষেতে ধান আর পাটের ক্ষেতে পাট চাষ করে চলেছেন।

আজ পৃথিবীর কোন চাষীই অস্বীকার করবেন না যে রোটেশান প্রথায় মাঠের ফসল বাড়ে না। কিন্তু এর থেকেও মাটির ফসল বাড়ান যায় মাঠের উৎপাদিকা শক্তি না কমিয়ে (Animal form Agriculture) পশুপালন কৃষি পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে সয়াবীন, ভুট্টা, গম ও ক্লোভার জাতীয় ফসল মাঠে উৎপাদন করা হয়। এর মধ্যে কেবল গমজাত ফসলের শস্যবীজ নানা কাজে ব্যবহার করা হয় নইলে অন্য সমস্ত ফসলগুলি গরু, ঘোড়া বা শূকর ইত্যাদিকে খাওয়ান হয় ও যত্নসহকারে আবর্জনা সার তৈরী করা হয়। এই সার দিয়ে মাঠে যে ফসল পাওয়া যায় তার পরিমাণ রোটেশান পদ্ধিতে পাওয়া ফসল থেকে অনেক বেশী। অবশ্য মাটির অম্লতা নিবারণ ও সুপারফসফেট মাঠে উভয় কালেই পরিমাণ মত যোগ করা উচিত।

ঘাস, শস্য ও গাছের লতাপাতা পালিত পশুকে খাওয়ান হয় আর ডাঁটা, খড়কুটা ইত্যাদি গোয়ালে পশুদের রাত্রিবাসের জন্য বিছিয়ে দিয়ে প্রতিদিন সকালে পশুদের মলমূত্রাদিসহ আবর্জনাস্তূপে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে সার তৈরী করলে দেখা যায় যে এক একর জমিতে ৪ টন সার উৎপাদিত হয়। শুষ্ক পদার্থের অনুপাত থাকে ১ : ১'৫ থাকে। একটি ১০০০ পাউণ্ড ওজনের পশুর কাছ থেকে দিনে ২৫ পাউণ্ড ওজনের মলমূত্রাদি পাওয়া যায়। অবশ্য সব সময়ে একটি পশুর কাছ থেকে ঐ পরিমাণে মলমূত্র পাওয়া যায় না। তা বাদে মুরগী, শূকর, গরুর থেকে ওজনে অনেক কম। তাদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির যদি কোন গড় নেওয়া যায় তবে ঐ সংখ্যা কার্যকরী হয় না। তা বাদে পশুদেহে সুখ ও অসুখ আছে যার ফলে এদের পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির পরিমাণ কমবেশী হয়। দেখা যায় যে খড়কুটা ও মলমূত্রাদির ওজন আবর্জনাস্তূপে আবর্জনা সারে পরিণত হলে এদের অনুপাত ১ : ১'৪৯ মধ্যে থাকে। ১৩০০ পাউণ্ড

ওজনের একটি হলষ্টীন গরুর কাছ থেকে ২১ টন কমপোষ্ট সার পাওয়া যেতে পারে এদের মলমূত্রের অনুপাত থাকে ৭৫ : ২৫।

যে গরুর দেহ ভাল পুষ্ট নয় ও যাহার খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে এই সমস্ত পদার্থ থাকে না তাদের মলমূত্রেও এই সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থ কম পরিমাণে থাকে আর এই মলমূত্র মাঠের নানা জাতীয় শস্যাদি ডাঁটা দিয়ে শতকরা ৮০ ভাগ পদার্থ আমরা পেতে পারি। ১ টন তুলা বীজে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওযা যায় তাহা ১৫০ পা. সোডিযাম নাইট্রেট-এ যে পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে তার থেকেও বেশী আর এই বীজের মধ্যে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তার পরিমাণ ১ শত পাঃ সুপার ফসফেটে যে পরিমাণ ফসফরাস থাকে তাহার সমান। এ ভিন্ন এই তুলা বীজে অল্প পরিমাণ পটাসিযাম, ম্যাগনেসিযাম ও সালফার থাকে। কিন্তু যতক্ষণ এই সমস্ত ধাতব পদার্থগুলি কোন বীজের মধ্যে থাকে বা পচা বীজে থাকে ততক্ষণ কোন গাছ এইগুলি টানতে পারে না। কিন্তু একবার কোন জীব দেহে ঢুকে তার মলমূত্রের সহিত যদি বাইরে আসে তখন তাহা অনাযাসে গাছ টেনে নিতে পারে।

কোন ক্ষেতে যদি নাইট্রোজেন বেশী পরিমাণে থাকে তবে সেই ক্ষেতের ফসল সেই মাটি থেকে বেশী নাইট্রোজেন টানবে, পুনরায় ঐ গাছের দেহের মাধ্যমে প্রাণীর দেহে যেতে পারে। ক্ষেতে বা তার ফসলে যদি নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকে তবে সেই ক্ষেতে সতর্কতার সহিত আবাদ করতে হয়। কারণ একটু অসাবধান হলে বা ভালরূপে তদারক না করলে মাঠের নাইট্রোজেন স্তূপ থেকে আগে নাইট্রোজেন চলে যাবে।

আমাদের দেশে অনেক কৃষক আছে যারা পশুপালন করতে পারে না। অনেক সময় আবার নিজেদের অসাবধানতা ও নিজেদের কুঁড়েমির জন্য তারা এই মূল্যবান আবর্জনা থেকে সার তৈরী করতে পারে না। পৃথিবীর অন্য সব দেশে, এমনকি ইউরোপ, রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের

মত উন্নত দেশেও কোন কৃষকই কৃত্রিম আবর্জনা সার নষ্ট করে না। চীন দেশের সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আমাদের দেশে যে গোবর পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগ আমরা ব্যবহার করি জ্বালানি হিসাবে। এর ফলে সারের দিক থেকে বিশেষ ক্ষতি হয়। এ ভিন্ন মাঠে চরবার সময় গরু যে সমস্ত মলমূত্র পরিত্যাগ করে সেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। অজৈব সার দিতে কৃষকের উদাসীনতা থাকতে পারে কিন্তু জৈব সার দিযে তো মাঠের কোন ক্ষতি হয না। তবুও এই মূল্যবান সার সংগ্রহের জন্য আমরা একটুও ইচ্ছা প্রকাশ করি না।

সবুজ সার—জলেতে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে গাছ তৈরী করবার পদ্ধতি বার হবার পর দেখা গেছে যে মাটি থেকে গাছ কঠিন জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে না। কেবল মাত্র বালু-রাশিতে রাসায়নিক সাব প্রয়োগ করে এই পরীক্ষার ফল আরও দৃঢ করা হয়েছে। এ থেকে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সোজাসুজি গাছ মাটি থেকে কার্বণ জাতীয় বা জৈব পদার্থ গ্রহণ করে না। যদিও গাছ প্রত্যক্ষ ভাবে এই জিনিষটি মাটি থেকে গ্রহণ করে না তবুও দেখা যায যে এই জৈব পদার্থ বা কার্বন জাতীয় পদার্থ মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ায এবং গাছ যাতে পরোক্ষ ভাবে সতেজ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে তার জন্য মাটিকে সাহায্য করে।

গাছের সবুজ অংশ মাটিতে চাপা দিলে উত্তাপ ও জলের প্রভাবে সেই সবুজ অংশে পচন ক্রিয়া সুরু হয়। এই পচন ক্রিযা শুরু হয নানা ক্ষুদ্র বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হওযার ফলে। প্রধানতঃ তিনটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই পচনক্রিয়া সুরু হয এবং এই পচনের ফলে গাছের সবুজ অংশের প্রোটিন থেকে নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসে। পরে ঐ রিক্ত নাইট্রোজেন আবার মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাথে ক্রিয়া করে মিশ্র নাইট্রেট রূপে গাছের গ্রহণ যোগ্য হয়।

(১) উত্তাপ—লতাপাতা পচনের জন্য প্রথম প্রয়োজন উত্তাপ। অনেক সময় উত্তাপ বেশী পেলে পচন ক্রিযা বৃদ্ধি পায না বরং লতাপাতা শুকিযে যায। উত্তাপের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে যে সীমারেখায গাছের লতাপাতা বেশী পচে এবং যার থেকে বেশী উত্তাপ দিলে পচন বেশী হয না। উষ্ণ মণ্ডলে ৩৫ সেঃ পচন খুব বেশী হয—নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে ২৫° সেঃ।

(২) উপযুক্ত পরিমাণে জলের প্রযোজন। জল ব্যতিরেকে গাছ কিছুতেই পচতে পাবে না। গাছের যে অংশ মাটির নীচে দেওযা যাবে সে অংশ জলের চাপে ফুলে উঠবে। তার ফলে গাছের বিভিন্ন অংশ থেকে লিগ্‌নিন বেরিযে আসবে এবং মিশ্র নাইট্রোজেন জাতীয পদার্থ সৃষ্টি করবে। জলেরও একটা পরিমাণ আছে। মাটির জলধারণ ক্ষমতার অংশ জলে ভর্তি থাকলে ভাল কাজ হয। (৩) আলো ও বাতাস। মাটির নীচে পচন ক্রিয়াকে সাহায্য করবার জন্য যথেষ্ট পবিমাণ অক্সিজেনের প্রযোজন আছে। অক্সিজেন ব্যতিরেকে পচন ক্রিযা সুসম্পন্ন হয না।

মাটির নীচে যত বীজাণুর সৃষ্টি হয তারা সব একশ্রেণীর নয। এদের এক একটি শ্রেণী গাছেব বিভিন্ন অংশ থেকে এক একটি খাদ্য গ্রহণ করে। এদেরই এক শ্রেণী, গাছে যে প্রোটিন থাকে তার থেকে নাইট্রোজেন বার করে এনে এমোনিযা তৈরী করে। পরে এর থেকে নাইট্রেট সৃষ্টি হয ও গাছ তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু পবোক্ষভাবে এই জৈব পদার্থ বা কার্বণ জাতীয় পদার্থ গাছকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। যত রকমের বীজাণু নিযে আজ ভেষজ গবেষণাগারে কাজ হয তার প্রায প্রতিটিকে মাটিব মধ্যে পাওযা যায। অবশ্য একই অবস্থায় একই সময়ে সবাইকে পাওয়া যায না সত্য কিন্তু বৎসরান্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক আবহাওযাতে এদের দেখা যায।

ভারতের চাষীদের কাছে মাঠে সবুজ সার দেওযা যে নূতন একথা নিশ্চয় করে বলা চলে না। তবে তাদের কাছে এটাকে নূতন করে বৈজ্ঞানিক প্রথার মাধ্যমে চালু করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের

সবুজ সার ব্যবহার করার রীতি আছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে ধইঞ্চা, সানাই ও নীল প্রভৃতি গাছগুলি মাটির সহিত মিশিযে দিয়ে মাটিতে সার বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। মহীশূর অঞ্চলে বীন দিযে চাষ করা হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের গড়পড়তা একটু বেশী সে সব স্থানে একটু ঝোপ জাতীয় গাছের চাষ করা উচিত। বোম্বাই-এর যে অঞ্চলে ধান হয়, সেখানে ধইঞ্চা দিযে সবুজ সার করার চেষ্টা চলেছে। বারানসী, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম অঞ্চলে ধইঞ্চা দিযে সবুজ সার তৈরীর চেষ্টা চলছে। সানহেম্প গাছ বেশী বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ধইঞ্চা গাছ ৫।৭ ফিট জলের তলায ১৫ দিনও জীবিত থাকতে পারে।

সবুজ সারকে সাধাবণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায। (১) লেগুমিনাস জাতীয গাছ যাদের মাটির মধ্যে শিকড় এর কোন কোন অংশ স্ফীত হযে থাকে। (২) যারা লেগুমিনাস জাতীয নয। লেগুমিনাস জাতীয বহু গাছ আছে। তার মধ্যে আমাদের দেশে ধন্‌চা, সানাই, সীম ও বারসীম বেশ চলতি আছে। কারণ আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওযার পক্ষে এই গাছগুলি খুবই উপকারী। এই লেগুমিনাস জাতীয গাছ দিয়ে সবুজ সার করার বিশেষ পার্থক্য হলো যে এদের শিকড়ে নডুল বীজাণু থাকে এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে শিকড়ে জমা করে রাখে। সুতরাং যখন এই গাছ-গুলিকে মাটির তলায পচিযে নেওয়া হয তখন তাদের দেহের সাথে সাথে এই নাইট্রোজেন ইত্যাদি মাটির সাথে মিশে যায। অন্য জাতীয় গাছে এভাবে জমিতে সার বৃদ্ধির চেষ্টা করে না। সুতরাং যদি জমিতে সবুজ সার দিতে হয তবে কোন লেগুমিনাস জাতীয গাছ মাঠেতে ফসল ফলান উচিত।

ভারতে আজ যে সমস্ত সবুজ সার প্রচলিত হয়েছে তার মধ্যে সানাই সব থেকে ভাল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টির সাথে সাথে জমিতে এই বীজ ছড়িয়ে দিতে হয় এবং ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে এরা পরিপূর্ণতা পায়। অতি অনুর্বর জমিতেও এরা ভাল ভাবে জন্মায। এক একর জমিতে ২১ মণ সবুজ

অংশ ও ৪১ সের নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করতে পারে। এর পরেই ধন্‌চা। এক একর জমিতে ২০০ মণ সবুজ সার দিয়ে ৩২ সের মাত্র পাওয়া যায়। অন্য কোনটি দিয়ে ৩১ সেরের বেশী N_2 যোগ করা যায় না।

মসুর—একরে ৫০ মণ সবুজ অংশ				১৬ সের	নাইট্রোজেন
বারসীম "	১৫৫ "	"	"	২৭ সের	"
খেঁসারি "	১২৩ "	"	"	২৭ "	"

সবুজ সার ও ফসলোৎপাদন—আমাদের দেশের পরীক্ষাগারে ও চাষীর জমিতে সবুজ সার পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই জাতীয় সার দিয়ে মাটি থেকে বেশী ফসল পাওযা যায। আমাদের দেশ উষ্ণ অঞ্চলে, গ্রীষ্ম-কালে সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। প্রখর উত্তাপে মাটির উপরে যে কার্বনজাতীয পদার্থ থাকে সেগুলি পুড়ে নষ্ট হযে যায। ফলে ভারতের দক্ষিণের প্রায় সব জমিতেই কার্বন জাতীয পদার্থ খুব কম। এই পদার্থের কম পড়বার আর একটি কারণ আছে। জমিতে নাইট্রোজেন কম হওযার সাথে কার্বন জাতীয় পদার্থও কমে যায। ফলে সেখানে বেশী বীজাণুক্রিযা হতে পারে না। ফলে নাইট্রোজেন প্রচুর পবিমাণে পাওযা যায না।

সবুজ সার তৈবী করতে সব সময লক্ষ্য রাখতে হয যেন গাছের ডাঁটা শক্ত না হয। কারণ ডাঁটা শক্ত হযে গেলে মাটির সাথে সহজে মিশবে না। আধ পচা হযে মাটির নীচে পড়ে থাকবে ও কতকগুলি বীজাণু সহযোগে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে গাছের শিকড়ের তার মধ্যে ঢোকা একরকম অসম্ভব। এতে গাছের ক্ষতি হয। সে কারণে ঠিক একটু কাঁচা থাকতেই গাছগুলিকে মাটির নীচে দিযে দেওযা উচিত।

জানা ও অজানার মাঝে আমরা জমিতে সবুজ সার দিযে থাকি। আমাদের দেশে যখন ধান গাছগুলি কেটে ফেলা হয় তখন জমিতে ধানের গোড়ার কতকাংশ রয়ে যায় এগুলি জমিতে পচে ভাল সার তৈরী করে।

জমির উপরিভাগে গাছের পাতা ইত্যাদি পচে যে একটি কালো স্তরের সৃষ্টি করে তাকে 'হিউমাস' বলে। এতে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী। কার্বন জাতীয় পদার্থ শতকরা ১০ ভাগেরও বেশী থাকে। কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় যে কযেক বৎসরে এই কালো শুষ্ক পাতা মাটিতে পরিণত হযেছে।

সবুজসারের উপকারিতা কি? (১) গাছের ডাঁটা ও পাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ইহাতে কাবন জাতীয় পদার্থ নাইট্রোজেন ফসফরিক এসিড, পটাস ও ক্যালসিযাম ও অন্যান্য কার্বন উপাদানগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায থাকে। যখন মাটির সহিত গাছের পাতা ও ডাঁটা মিশে যায তখন এই পচা সার মাধ্যমে এই জাতীয পদার্থগুলি মাটিতে গিযে পড়ে। আর কিছুদিন মাটির সহিত রাসাযনিক ক্রিযা করে এই রাসাযনিক পদার্থগুলি গাছের গ্রহণ যোগ্য হয।

(২) গাছ, কার্বনডাযঅক্সাইড বাষ্প ও অক্সিজেন বাতাস থেকে সংগ্রহ করে। সুতরাং গাছের শক্তিদাযক বাষ্পীয পদার্থগুলি গাছের ডাঁটা ও পাতার মধ্য দিযে মাটিতে যায এবং গাছকে নূতন শক্তি দেয।

(৩) যদি লেগুমিনাস জাতীয গাছ হয তবে তার শিকড়ের গাঁইট বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ কবে মাটিতে (N_2) নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িযে দেয।

(৪) যে সময ক্ষেতে ফসল থাকে না সেই সময খেতের মাটি গাছ দিযে ঢেকে রাখতে হয। কারণ তা হলে সূর্যের তাপ সোজাসুজি মাটিকে পুড়িযে ফেলতে পারে না। তা বাদে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারা সোজাসুজি পড়ে মাটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। এই ভাবে মাটির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(৫) যে সমস্ত গাছের শিকড় বহুদূর মাটির নীচে চলে যায় তারা সেখান থেকে গাছের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে আনে।

(৬) সবুজ সারের জন্য তৈরী গাছগুলোকে মাটির নীচে দিযে দিলে গাছগুলো অনেক খাদ্যের সন্ধান পাবে এবং এই খাদ্য থেকে অনেক বীজাণু উৎপত্তি হবে।

(৭) গাছের পাতা ও দেহাবশিষ্ট দিয়ে যে হিউমাস সৃষ্টি করবে তার প্রভাবে মাটি জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

(৮) এই কার্বনজাতীয় পদার্থের প্রয়োগে মাটির গঠন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। অতি সহজে মাটিকে গ্রানুলার ও কলমনার অবয়বে আনতে পারে।

(৯) সবুজ সার প্রয়োগে মাটির মধ্যে বাতাস চলাচলের গতি বাড়ে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই সবুজ সারেব প্রচলন হয়েছে। তুন্দ্রা অঞ্চলে যেখানে জল জমে বরফ হয় সেখানে যদি এই সবুজ সার করে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় তবে গাছ মাটিব তলে থাকাব ফলে জল জমতে অসুবিধা হয়। গ্রীষ্মকালে এই সবুজ সারের গাছগুলো মাটিকে অত্যধিক উত্তাপের হাত থেকে রক্ষা করে। যেখানে প্রচুর জল পাওয়া যায় সেখানে এই সবুজ সারের প্রচুর প্রচলন আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পীচ ও কমালেবুর বাগানেও এই সবুজ সারের প্রচলন দেখা যায়।

সাধারণ লেগুমিনাস ও নন্ লেগুমিনাস উভয়জাতীয় গাছের দ্বারা সবুজ সার তৈরীর প্রচলন আছে। তবে ননলেগুমিনাস থেকে লেগুমিনাস চলনের প্রধান কারণ যে লেগুমিনাস জমিতে নাইট্রোজেন বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়।

পচন পদ্ধতি ও লেগুমিনাস জাতীয় গাছ—(১) ক্লোভার—এই গাছ খুব বড় হয় না। ১ ফিট থেকে ৩ ফিটের মধ্যে ডাঁটাগুলি নরম থাকে, অনেকটা আমাদের দেশের কচুব ডাঁটার মত। মাটির নীচে দিয়ে দিলে খুব বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করতে পারে। সব থেকে উৎকৃষ্ট সবুজ সার। শিকড়ের পরিমাণ খুব বেশী ও মাটির তলায় বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে—একরে ৪২ সের থেকে ৯২ সের পর্যন্ত নাইট্রোজেন যোগ করে থাকে। ক্লোভার জাতীয় গাছের মধ্যে ল্যাডাইনো-ক্লোভার সব থেকে ভাল।

(২) লুসার্ণ বা এলফাএলকা—এই লেগুমিনাস জাতীয় গাছ জমিতে সব থেকে বেশী নাইট্রোজেন যোগ করে। একরে ৫০ সের থেকে ১০০ সের পর্যন্ত। এই গাছে খুব বেশী প্রোটীন থাকে। এইগুলি গরুকে খাওয়ালে গরুর দুধে প্রোটীন বেশী পাওয়া যায়।

(৩) কলাই জাতীয় গাছ (Cowpea)—গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এর প্রচলন বেশী। বৎসরের সব সময় এই জাতীয় গাছ ক্ষেতে বাড়তে পারে। বর্ষা সমাগমে এর পত্রভার বৃদ্ধি পায়। প্রধান শিকড়গুলি মাটির নীচে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে মাটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। এ ছাড়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেনও টেনে আনে। সাধারণতঃ একরে ৮ পাউণ্ড বীজ ছড়ান হয়।

(৪) সোয়াবীন—কলাই-এর মত। তবে ঠিক উপযুক্ত সময়ে একে মাটির নীচে দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ গাছ পেকে গেলে ডাঁটা শক্ত হয়ে যায়। চারা বার হবার পর ৪।৫ সপ্তাহের মধ্যে এই গাছের ডাঁটায় ও পাতায় বেশী নাইট্রোজেন থাকে। যে অঞ্চলে কলাই-এর বীজ পাওয়া যায় না সেখানে এর প্রচলন আছে। একরে প্রায় ৩০ সের নাইট্রোজেন যোগ করে।

(৫) ধন্‌চা—বাংলাদেশে এর প্রচলন খুব বেশী। কারণ এ গাছ রোদ ও বৃষ্টি সমভাবে সহ্য করতে পারে। শুষ্ক মাটিতে বা লবণাক্ত মাটিতে এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে দুই মাসের মধ্যে কোন একটি বীজ থেকে চারা বার হয় নি। যদি এর পরে উপযুক্ত বৃষ্টি পায় তবে সেই বীজ থেকে চারা বার হবে। তা বাদে গরু, ছাগলে ধন্‌চা গাছ বড় একটা নষ্ট করে না। বাংলাদেশের রাস্তার ধারে বা জমিতে যেখানে সেখানে এই গাছ দেখতে পাওয়া যায়। একর প্রতি প্রায় ৫০ পাউণ্ড বীজের প্রয়োজন। আর একরে ৩২ সের নাইট্রোজেন যোগ করে।

(৬) সানহেম্প (Saun Hemp) ভারতবর্ষে ধন্‌চা ও সান্‌হেম্প প্রায় সমান পরিমাণে চলে। তবে ধন্‌চার মত এ গাছ জল সহ্য করতে পারে

না। জলের তলায় থাকলে ২।৩ দিনের মধ্যে পচে যায়। এর জন্য বিশেষ করে মাঠ তৈরী করতে হয় না। একরে ৫০ সের বীজ দরকার। সবুজ-সারের বীজ ও গাছ ঠিক করতে গিযে লক্ষ্য রাখা উচিত যে সেই গাছের পাতার সংখ্যা কত। যে গাছের পাতা বড় নয বা সংখ্যায বেশী নয সে জাতের গাছ দিযে ভাল কাজ হয় না। তাছাড়া লক্ষ্য করতে হবে গাছ যেন তাডাতাড়ি পূর্ণতা পায। বেড়িব পাতা আকারে বেশ বড়। যদি এই পাতা মাটিতে মিশিযে দেওযা যায তবে ভাল ফল পাওযা যায।

অনেকে আমাদের দেশে ধনচা ও আউস ধান একই সমযে মাঠে চাষ করেন। ধন্‌চা গাছ একটু বেড়ে উঠলে তাকে তুলে মাটি চাপা দেওযা হয। এতে মাঠে ফসলও পাওযা যায সবুজ সারও যোগ হয। এ ভিন্ন মাঠে অনেক সময রেড়ির পাতা দিযে সবুজ সার তৈরী করা হয।

ফসল	সবুজ অংশ (পরিমাণ) একরে	নাইট্রোজেন
লুসার্ণ	৬ টন	১০০-২০০ পাঃ একর
ল্যাডাইনো ক্লোভার	৫ টন	১৫০-২০০ পাঃ „
কলাই	৬ টন	৪০ পাঃ „
ধন্‌চা	৮ টন	৬৬ পাঃ „
সানহেম্প	১৫ টন	৬০ পাঃ „

B.S.

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[কৃষি রসায়ন]

প্রথম ভাগ

তৃতীয় খণ্ড

(একাদশ শ্রেণীর জন্য)

৮ (১ম)

প্রথম অধ্যায়

ক্যালসিয়াম বা চুণ

(Soil Reaction—and pH)

ক্যালসিযাম বললে অনেকে না জানতে পারেন কিন্তু চুণ বললে জানেন না বা চুণ কথাটি শোনেন নি এমন লোক বাংলাদেশে খুব কম আছে। কারণ পান খান না বা জীবনে কখনও খাননি এমন লোক বাংলা দেশে নিতান্ত বিরল। ক্যালসিয়াম কথাটি ইংরেজী। ক্যালসিযাম অর্থ চুণ নয়। পৃথিবীতে যে কয়টি মৌলিক ধাতু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ক্যালসিযাম তার মধ্যে একটি। যেমন সোডিযাম, পটাসিযাম ইত্যাদি। আর চুণ বলতে আমরা সাধারণতঃ চুণজাত কোন মিশ্র পদার্থকে বুঝি।

আমাদের দেশে চুণ সহযোগে পান খাওযার রীতি আছে, পরিমাণ মত চুণ না হলে পানের স্বাদ পাওয়া যায় না। আবার পানে যদি বেশী চুণ পড়ে যায় তবে গাল পুড়ে যায। কিন্তু এই চুণে থাকে কি? চুণ যে অবস্থায় থাকুক না কেন জলের সহিত মিশে ক্যালসিযাম হাইড্রকসাইড তৈরী করে। কারণ চুণে জল পড়লে দেখা যায় বুড়বুড় করে জলের মধ্য থেকে কোন গ্যাস বেরিয়ে আসছে। প্রথমতঃ এর মধ্যে কোন শূণ্য স্থান বায়ুতে ভর্ত্তি থাকে সেই স্থান জল গ্রহণ করায সেইখানকার বাযু বার হযে আসছে। আর যদি চুণ কার্বনেট আকারে থাকে তবে জলের সঙ্গে মিশে কার্বন ডায়অকসাইড বাষ্প তৈরী করে ঐ বাষ্প জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে।

মাটিতে ক্যালসিয়ামের একটা বিশেষ স্থান আছে। কারণ এর অবস্থিতির পরিমাণের উপর জমির অম্লতার কম বেশী হযে থাকে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশে লাল কাঁকুরে মাটির উপরিস্তরে ক্যালসিয়াম কম। তার ফলে pHও কম অর্থাৎ অম্লতা বেশী। যতই নীচের স্তরে যাওয়া যায় ততই

ক্যালসিয়ামের অবস্থিতির পরিমাণ বাড়ে ফলে অম্লতা কমে যায় বা pH ইউনিট বেড়ে যায়। আমাদের দেশের মাটিতে উপরের স্তরে সব সময়ই দেখা যায় ক্যালসিযামের পরিমাণ কম। লাল কাঁকুরে মাটি প্রাযই বালুময় ও তার জল ধারণ করবার ক্ষমতা খুব কম। যে শিলা থেকে এর উৎপত্তি হযেছিল সেই শিলার চুণজাতীয় পদার্থ বৃষ্টির জলের সাথে মিশে জমি থেকে চলে গেছে। ক্যালসিয়াম জাতীয পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধিব ফলে জমিতেও অম্লতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

অম্লতা বৃদ্ধি বলতে আমরা কি বুঝি? জমিতে জৈব ও অজৈব নানা প্রকারের এসিড আছে বা বিভিন্ন জীবাণু প্রক্রিযায নানা প্রকার জৈব ও অজৈব এসিডের সৃষ্টি হয। এই এসিডে হাইড্রোজেন থাকে। এসিডের বা অম্লতার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় এই হাইড্রোজেন আয়ণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে। সেজন্য একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায যে, যে মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য (Exchangeable) হাইড্রোজেন আয়ণের (ion) পরিমাণ বেশী সে মাটিতে অম্লতার পরিমাণও বেশী। কারণ মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য হাইড্রোজেন থাকে তার প্রায সবটাই পাওযা যায় বিভিন্ন এসিড থেকে। ফলে যদি কোন মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য হাইড্রোজেন বেশী থাকে তবে বোঝা যায় যে মাটিতে অম্লতার পরিমাণও বেশী। ফলে সেই মাটির pH ইউনিট কম।

কম বেশি সব জিনিষে অম্লতা আছে। বিশুদ্ধ জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎশক্তি চালালে হাইড্রোজেন আযণ পাওয়া যায। এর ফলে যে হাইড্রোজেন আয়ণ পাওয়া যায তার পরিমাণকে ধরা হয় নিরপেক্ষ রেখা। কারণ এইটাই সকল বস্তুর অম্লতা নিরুপণের মানদণ্ড। যদি কোন তরল পদার্থে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশী হয তবে হাইড্রোজেনের ঘন সন্নিবেশ হবে ও জলের পরিমাণ থেকে এই তরল পদার্থ H_2 পরিমাণ বেশী। ফলে এই তরল পদার্থের অম্লতার পরিমাণ জলের অম্লতার পরিমাণ থেকে বেশী।

দুটি বিভিন্ন আকারের পাত্র নেওয়া গেল। একটিতে আধ সের জল

ধরে অন্যটিতে ৪ সের। দুটি পাত্রে একই পরিমাণ চিনি মিশান গেল— ধরা যাক আধ সের। ভাল করে মিশিয়ে এই ২টি পাত্র থেকে জল দুটি বিভিন্ন কাপে নেওয়া হলে সাধারণভাবে জল মুখে দিয়েই বলা যায় যে আধসের জল যে পাত্রে সেই জল অন্য পাত্রটির জল থেকে বেশী মিষ্টি। তার অর্থ এই যে একই পরিমাণ জলে একটিতে অপরটি অপেক্ষা চিনির পরিমাণ কম। বলা যেতে পারে একটিতে চিনির ঘনত্ব অন্যটির থেকে বেশী। মাটিতে অম্লতা নিরুপণের বেলাযও ঠিক এইরূপ। আগেই বলা হয়েছে রাসায়নিক বিশুদ্ধ জলে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন পাওযা যায তাকে মানদণ্ড ধরে অম্লের সহিত তুলনা করে হাইড্রোজেন আযণ-এর ঘনত্ব কম বা বেশী নিরুপণ করা হয়। এই নিরুপণ প্রকাশ করা হয় pH আকারে। বলা যেতে পারে হাইড্রোজেন আযণের ঘনত্ব।

মাটিতে অম্লতার নিবপেক্ষ রেখা ৬·৫—৭ ইউনিট। pH ইউনিট এর বেশী হলে সে মাটিকে বলা হয ক্ষারজাতীয মাটি আর pH ইউনিট-এর কম হলে তাকে বলা হয অম্ল মাটি। সাধারণভাবেই সবার মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে কোন জিনিষেব মূল্য গণিতের সংখ্যায বেশী হলে সেই জিনিষের প্রাধান্য প্রকাশ পায। কিন্তু অম্লতাব বেলা উল্টা কেন? তার প্রধান কারণ হাইড্রোজেন আযণের পরিমাণ অঙ্ক শাস্ত্রের লগারিথম ও এ্যান্টিলগারিথম-এ প্রকাশ করা হয। এব ফলেই সংখ্যা কমাব সঙ্গে অম্লতার পরিমাণ বাড়ে।

মাটির অম্লতা সাধারণতঃ ৩ থেকে ১০ pH ইউনিটএর মধ্যে থাকে। যদি ৭ pH ইউনিট মাটিতে অম্লতা ও লবণাক্ততার মধ্যরেখা ধরা হয় তবে যে মাটির pH ইউনিট ৬ সে মাটি, যে মাটির অম্লতার পরিমাণ ৭ pH ইউনিট, সে মাটির অম্লতার থেকে ১০ গুণ অম্লতা বেশী। আবার ৫ pH ইউনিট মাটি ৬ pH ইউনিট মাটি থেকে ১০ গুণ অম্লপূর্ণ সুতরাং ৫ pH ইউনিট মাটি ৭ pH ইউনিট মাটি থেকে ১০০ গুণ অম্লপূর্ণ। তা হলে যে মাটির pH ৪ ইউনিট সে মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০০০ গুণ অম্লপূর্ণ।

অর্থাৎ এই মাটিতে হাইড্রোজেন আয়ণের পরিমাণ নিরপেক্ষ মাটিতে অবস্থিত হাইড্রোজেন আয়ণের থেকে ১০০০ গুণ বেশী। ফলে এর হাইড্রোজেন আয়ণের ঘনত্ব বেশী। আর যে মাটিতে pH ইউনিট ৮ সেখানে মাটিতে নিরপেক্ষ মাটির এক দশমাংশ পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ণ আছে মাত্র।

বেকম্যান pH মিটার বা অম্ল নিরুপণ যন্ত্র সাহায্যে অম্লতার পরিমাণ মাপ করা হয়। একটা কোন জানা সল্যুউশানকে মানদণ্ডরূপে ব্যবহার করে অন্যের অম্লতা নিরুপণ করা হয়। মাটির যে অম্লতার পরিমাণ আমরা নিরুপণ করি সেটা মাটির সারা অম্লতার তুলনায় খুবই কম। কারণ অনেক সময় এই হাইড্রোজেন আয়ণগুলি মৃত্তিকা পিণ্ডের মধ্যস্থলে বসে থাকে। তার ফলে সাধারণভাবে সেগুলিকে মৃত্তিকা পরমাণুর মধ্য থেকে বার করা যায় না। যেটুকু অম্লতা সব সময় জমিতে ক্রিয়াশীল থাকে সেটুকু পরিমাণ অম্লতার পরিমাণ করা হয় মাত্র। এ ভিন্ন নানা রকম যৌগিক মৃত্তিকা পিণ্ডের মধ্যে এসিড থাকতে পারে। যে মাটিতে যত কাদামাটি (clay) থাকে সে মাটিতে তত অম্লতা গুপ্ত থাকে। এদিগকে সাধারণতঃ জলের সহিত মিশালে কাদামাটি থেকে হাইড্রোজেন আয়ণ বেরিয়ে আসে না। একমাত্র উপায় পরিমাণ মত মাটি নিয়ে একটু একটু করে চূণ মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখা।

মাটির অম্লতার হ্রাস বৃদ্ধি বা মাটির লোনা হওয়া নির্ভর করে সেই স্থানের বৃষ্টিপাতের উপর। প্রথমতঃ বৃষ্টির জলের সহিত মাটিতে যে সমস্ত কার্বনেট জাতীয় পদার্থ থাকে সেগুলি মিশে জলের সহিত মাঠ থেকে চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ মাটিতে যে সমস্ত মিশ্র যৌগিক পদার্থ আছে সেগুলি যখন জলের সংস্পর্শে আসে তখন সেই মিশ্র পদার্থ থেকে সহজ দ্রব ধাতব পদার্থগুলি জলের সঙ্গে মিশে চলে যায় আর তাদের শূন্য স্থান হাইড্রোজেন গিয়ে অধিকার করে বসে। তার ফলে মাটিও ধীরে ধীরে অম্ল হয়ে পড়ে। আমাদের এই দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তার ফলে মাটিতে যে পরিমাণ কার্বনেট জাতীয় পদার্থ ছিল সেগুলি জলের সঙ্গে মিশে মাঠ থেকে চলে গিয়েছে। তার ফলে

আমাদের দেশের মাটির উপরিস্তরে অম্লতা ৫—৬ pH ইউনিটের মধ্যে। হাযদ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায মাটির নিম্নস্তরে প্রচুর কার্বনেট আছে। এগুলি জলের সাথে চুঁইয়ে মাটির নীচে এসে ঠাঁই নিযেছে। এই কার্বনেট যদি ১০"—২৫" মধ্যে থাকে তবে গাছের পক্ষে গ্রহণীয থাকে, এর নীচে চলে গেলে সাধারণ গাছের পক্ষে আর সেটা গ্রহণীয় থাকে না।

আমাদের দেশের যে অঞ্চল সমুদ্রের নিকটে ও যতদূর পর্যন্ত সমুদ্রের জলে জোযার ভাটা খেলে ততদূর পর্যন্ত এর মাটি লোনা। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে মাটির ওপর একটা সাদা স্তর পড়ে। শীতকালে ধান কেটে নেওযাব ফলে সমস্ত জমি সোজাসুজি সূর্যের তেজে উদ্ভাসিত হযে পড়ে।

গরমে উত্তাপের ফলে মাটি অনেক জাযগায ফেটেও যায। এই সময় একটু লক্ষ্য কবলে দেখা যায যে মাটির উপর সাদা রঙের একটা স্তর পড়েছে। দেশের লোকেরা বলবেন—"লোনা বা নুন"। লবন আইন ভঙ্গ করবার সময এ থেকে অবশ্য লবন তৈরী হযেছে। কিন্তু এ থেকে খুব বেশী লবন পাওযা যাযনি। এগুলি সোডিযাম জাত মিশ্র পদার্থ আর সাদা বর্ণের লোনা মাটির জন্য দাযী এই সমস্ত রাসাযনিক মিশ্র পদার্থ। এরই ফলে এখানকার মাটি লোনা ও তার pH ইউনিট ৮এর উপর। এগুলি সাধারণতঃ সোডিযম কার্বনেট। যখন উত্তাপের প্রভাবে নীচের জলকণা উপরে এসেছিল কৈসিকার্ষণ প্রভাবে তখন এরা জলের সঙ্গে উঠে এসেছিল। জল উপরে আসার সঙ্গে উত্তাপের প্রভাবে বাষ্পীভূত হযেছে। কিন্তু এগুলি মাটির উপব রযে গিযেছে। এগুলি সাধারণতঃ সোডিযম কার্বনেট। অনেক সময় সোডিয়াম ও পটাসিযাম এই দুইটি ধাতু মিশ্র আকারে মাটিতে থাকে। এর ফলে মাটিতে লবনত্ব খুব বেশী হয়।

আমাদের দেশের মাটিতে ক্যালসিয়াম খুব কম। এর প্রধান কারণ এদেশে অত্যধিক বৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ যে শিলা থেকে এই সকল মাটির উৎপত্তি

সেই শিলাতেও ক্যালসিয়াম কম ছিল। বাংলাদেশের মাটি উৎপত্তি হয় অধিকাংশ—স্যাণ্ডষ্টোন থেকে। দোঁয়াশ মাটিতে (loamysoil) এক একর জমিতে ৮০,০০০ পাঃ পটাসিয়াম, ৭৪,০০০ ক্যালসিয়াম আর ১৭,০০০ পাঃ ম্যাগনেসিয়াম থাকে। কিন্তু বালুমাটিতে এক একর জমিতে ৭০০ পাঃ পটাসিয়াম, ১৭০ পাঃ ম্যাগনেসিয়াম থাকে মাত্র। যে মাটিই হউক না কেন, এই দুইটি খুব বেশী ও খুব কম যে তালিকা দেওয়া হলো সাধারণতঃ এই দুইটির মধ্যে থাকে।

মাটির নিম্নস্তরে সাধারণতঃ ১০"—২০" মধ্যে সমস্ত ধাতব পদার্থগুলি সন্নিবিষ্ট থাকে। অর্থাৎ উপরের স্তরের থেকে নীচের স্তরে ধাতব পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে। বিশেষতঃ B_2 স্তরে সমুদয় রাসায়নিক পদার্থগুলি জমা হয়। কিন্তু পডজল মাটির কোন কোন সিরিজে দেখা যায় মাটির নীচে ক্যালসিয়ামের ভাগ কমে যাচ্ছে আর ম্যাগনেসিয়ামের ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। সব সিরিজে অবশ্য হয় না।

মাটিতে অম্লতা বৃদ্ধি হওয়ার প্রধান কারণ, মাটিতে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ থাকে সেগুলি মৃত্তিকা পরমাণু থেকে স্থানচ্যুত হয় ও সেইস্থান হাইড্রোজেন অধিকার করে বসে। স্থানচ্যুত এই ধাতব পদার্থের পরমাণুগুলি হয় গাছের শিকড় দ্বারা আকর্ষিত হয় কিম্বা অন্য রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিশে সহজ দ্রব্য হয়ে জলের সহিত মাটির নীচের স্তরে চলে যায় কিম্বা মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। এরই ফলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। মাটিতে এই অম্লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে যে সমস্ত লৌহ জাতীয় মিশ্র পদার্থ বা এ্যালুমিনাম মিশ্র যৌগিক পদার্থ থাকে বা ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ থাকে, সেগুলি তখন দ্রবণীয় হয়ে পড়ে বা সহজে জলের সহিত মিশে যায়। কিন্তু যখন মাটিতে অম্লতার পরিমাণ খুব কম থাকে pH ৬—৭-এর মধ্যে তখন মাটির মধ্যস্থিত জলকণার সহিত সহজে মিশে যেতে পারে না। এই মাটিতে গাছের গ্রহণযোগ্য যে ফসফরাস থাকে সে তখন এই সমস্ত লৌহ, এ্যালুমিনাম,

ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত ধাতব পদার্থগুলির সহিত মিশে জটিল (Complex) রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং তখন আর গাছের এই ফসফরাস গ্রহণযোগ্য থাকে না। আর এই সময়ে যে সমস্ত বীজাণু আবর্জনা মধ্য থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বার করে তারাও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে বা যে সমস্ত বীজাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনতে সাহায্য করে তারা ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য বা নিস্তেজ হযে পড়ে। এরই ফলে এই সময়ে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় বীজাণু থেকে ফাঙ্গাস জাতীয় বীজাণু বৃদ্ধি পায়, ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়।

আমরা জেনেছি গাছের অঙ্কুশিকড় বা অঙ্কুলোম দিযে কার্বন ডায়ক্সাইড বেশী নির্গত হয, জলের সহিত মিশে এই কার্বন ডায়ক্সাইড বাষ্প কার্বনিক এসিড তৈরী করে। এই কার্বনিক এসিডে যে হাইড্রোজেন থাকে সেই হাইড্রোজেন ধাতব মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ থেকে ধাতব পদার্থগুলিকে স্থানচ্যুত করে' নিজে সেখানে বসে পড়ে। আর জলের সহযোগে এরা গাছের দেহেতে ঢুকে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

কোন বিশেষ pH ইউনিটে সব গাছ ভাল জন্মায না। এক একটি বিশেষ জাতীয় গাছ কোন একটি বিশেষ pH ইডনিটে ভাল জন্মাবে। নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

pH	অম্লতার পরিমাণ	ফসল জন্মিবার পরিমাণ
৩	অতিশয় অম্ল	কোন গাছই ভাল জন্মিবে না,
৪	বেশী অম্ল	কোন গাছই ভাল জন্মিবে না,
৫	মাঝারি অম্ল	এতে কোন কোন গাছ বা ফসল ভাল জন্মিবে।
৬	অল্প পরিমাণ অম্ল	সাধারণ ফসল জন্মিবে।
৭	নিরপেক্ষ	সব গাছই ভাল বাড়িবে।
৮	অল্প লোনা	প্রায় সব গাছই জন্মিবে।
৯	মাঝারি লোনা	কোন গাছই ভাল বাড়বে না।
১৯	অতিশয় লোনা	কোন গাছই ভাল জন্মিবে না।

মাটির অম্লতা নিবারণ করবার সহজ ও প্রধান পন্থা মাটিতে পরিমাণ মত চুণ যোগ করা। গুঁড়া চুণ বা চুণ জাতীয় পদার্থ মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির অম্লতা দূর করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে লৌহ তৈরী করার চুল্লী থেকে একরকম তলানি ময়লা পাওয়া যায়। তাকে শ্লাজ বলে। এ দিয়েও মাটির অম্লতা দূর করা যায়। ঝিনুক-চুণ দিয়েও অনেক সময় মাটির অম্লতা দূর করা যায়। এ ভিন্ন অনেক রাসায়নিক সারের যোগেও মাটির অম্লতা দূর করা যায়। যেমন নাইট্রেট অব সোডা, ছায়নামাইড জাতীয় সার প্রভৃতি।

যে চুণ মাঠে ছড়ান হয় সে চুণ সাধারণতঃ ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম আকারে থাকে। ডলোমাইটে (CaMgCo₃) সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত থাকে ২০।১৩। যদি কোন বিশেষ পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অম্লতা দূরীকরণ করবার ক্ষমতাকে ধরা যায় ১০০ ইউনিট তবে সেই পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের ক্ষমতা হবে ১১৯, ক্যালসিয়াম অক্সাইড-এর ১৭৪, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের ক্ষমতা হবে ১৭২।

অম্ল মাটিতে ফাঙ্গাস ও একটিনোমাইসিস জাতীয়—বীজাণু—মাটির মধ্যে আকৃতি পরিবর্তন করতে সাহায্য করে, যদি মাটিতে অম্লতা কমে যায় বা মাটির pH ইউনিট বেড়ে যায় তবে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় বীজাণু অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। কারণ দেখা যায় যে, pH ইউনিট যে মাটিতে নিরপেক্ষ রেখায় সেই মাটিতে নাইট্রেট উৎপাদনকারী ও নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী ব্যাকটেরিয়া খুব ভাল ভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু বেশী চুণ দিলে মাটির অম্লতা খুবই কমে যায় তার ফলে আলু জাতীয় যে সমস্ত ফসল ঐ মাটিতে করা হয় তাদের নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও হয়। সেইজন্য সব সময় নজর রাখতে হবে যে মাঠে কি ফসল হবে। তার উপর নির্ভর করে' মাটির অম্লতা কম-বেশী করা যেতে পারে।

মাটিতে চুণ ছড়ালে মাটি প্রথমে কুঁকড়িয়ে যায় (Crumb) এর ফলে মাটির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এরই প্রভাবে মাটিতে মৃত গাছের যে শিকড় ইত্যাদি থাকে সেগুলি মাটির সহিত মিশে যায। এই সমস্ত অংশ পচে গিযে মাটির সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশে যায় এবং মাটিকে গ্রানুলার আকারে আসতে সাহায্য করে।

মাটিতে চুণ ছড়ালে মাটিতে ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায আর অন্যান্য বীজাণু ক্রিযাও বৃদ্ধি পায়। এরই ফলে মাটিতে যে সমস্ত গাছের শিকড় ইত্যাদি থাকে সেগুলিও পচে যাবে। নডুল ব্যাকটেরিযা-গুলি অধিকতব সকর্মক হযে উঠে—ও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে এবং অধিকতর নাইট্রেট তৈরী হয। যে সমস্ত ফসফরাস ও মলিবডিনাম গাছেব অগ্রহণযোগ্য অবস্থায থাকে তারা গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয। এক কথায চুণ দিযে মাটির pH ইউনিট যদি ৬·৫ করতে পারা যায তবে মাটির মধ্যে একটা সাজো সাজো রব পড়ে যায। যা কিছু দূষিত যা গাছের গ্রহণযোগ্য নয তারা অকর্মণ্য হযে পড়ে। এযেন মাটিতে বসন্তকাল এসেছে। যা কিছু মলিনতা দূরীভূত করে মাটিকে বৃক্ষ ধারণ উপযোগী করে তোলে। বসন্তে গাছগুলি যেমন নূতন পত্র পুষ্পে শোভিত হয তেমনি মাটিতেও একটা নূতন চাঞ্চল্য এসে যায। যে সমস্ত জিনিষ মাটিতে থেকেও গাছের কোন কাজে আসেনি তারাও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছের গ্রহণযোগ্য হযে পড়ে। ফুটবল খেলায যেমন না চেঁচালে খেলোযাড়দের উদ্যম বাড়ে না সেই রকম মাটিতে চুণ ছডালে মাটির মধ্যে চারিদিকে কার্যকারিতা বেড়ে যায। এ যেন মাটিতে নূতন একটি জীবনীশক্তি। যে সমস্ত গাছ বেশী মাত্রায ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করে তাদেরও এগুলি অতি অনাযাসলব্ধ হযে পড়ে।

ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা—

(১) গাছের দেহে যে সমস্ত কোষ আছে তার মধ্যে ক্যালসিয়াম

পেকটেট নামক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। এর অভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারিয়ে গাছ বেঁটে হয়ে যায়।

(২) ক্যালসিয়াম গাছকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে। মানুষের দেহে যেমন ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে বিশেষতঃ মেরুদণ্ডের মাঝে, যার ফলে মানুষ সোজা হয়ে হাঁটে সেইরকম গাছেরও এর প্রয়োজন আছে সোজা হযে বেড়ে ওঠার জন্য।

(৩) গাছের দেহে অনেক সময় অনেক জৈব-এসিড (organic acid) তৈরী হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিযাম-এর প্রভাবে এই অম্লতা নষ্ট হয়ে যায়, এর অভাবে গাছ বেঁটে হয়ে যায়। বীজের মধ্যে যে ক্যালসিযাম থাকে তার প্রভাবে গাছ খানিকটা বেড়ে ওঠে, তারপর মাটির মধ্য থেকে আর কোন ক্যালসিয়াম না পেলে গাছের বৃদ্ধি হয না। যদিও গাছ অনেক সময় মরে যায় না তথাপি গাছ 'বামন' হযে যায়।

ক্যালসিয়ামের অভাব (গাছের পক্ষে) প্রথমেই দেখা যায় কচি পাতায়। কচিপাতা সবুজ রঙ হারিযে ফেলে। আরও কিছুদিন গেলে দেখা যায় গাছ যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। আরও কিছুদিন গেলে দেখা যায়—যে গাছের পাতা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে নীচের দিকে চলে গেছে। গাছের পাতার সবুজ রঙ হারিয়ে গেলে পরে পাতা পড়ে যায়। গাছের পাতার কিনারায় ও আগায় ক্যালসিযাম হীনতার লক্ষণ অনেক সময় দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের ডাটা মোটা হয়ে যায় এবং পাতা পুরু হতে থাকে। পাতাগুলি অনেক সময় গাঢ় সবুজ হয়ে যায়। গাছের শিকড়ের কোন বিশেষ আকার থাকে না। শিকড়ের আগাগুলো আর সুঁচাল থাকে না। ভোঁতা হয়ে যায়। গাছের সারা দেহের যে কোন অংশের তুলনায় পাতায় সব থেকে বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। সূর্য-মুখীর পাতায় ক্যালসিয়াম শতকরা—৭'৬৪ ভাগ। মটরের আগার কচি

পাতায় শতকরা—৬·৫৩ ভাগ। তামাকের পাতায শতকরা—৬·৩৭ ভাগ। যই-এর (Oats) ডাঁটায় শতকরা—০·১৫ ভাগ, গমের ডাঁটায়—০·০৮ ভাগ, ধানের ডাঁটায ৩.০৭ ভাগ আর সব থেকে কম থাকে আলুতে শতকরা—০.০৪ ভাগ-মাত্র।

ফসল মাঠ থেকে কেটে আনার সাথে সাথে গাছের দেহের মাধ্যমে জমি থেকে ক্যালসিযাম ও ম্যাগনেসিযাম বেরিযে যায। নীচে তার একটা তালিকা দেওযা গেল।

ফসল	একরে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ।	ক্যালসিয়াম অপসারণ।	ম্যাগনেসিয়াম অপসারণ।
আলফালফা	৮ টন	১০০ পাঃ	৫০ পাঃ
বাঁধাকপি	১০ „	১০ „	৪ „
ভূট্টা (শস্য)	১০০ বুশেল	১ „	১০ „
যই	৫০ „	২ „	২ „
সোযাবীন	২৫ „	৫ „	৫ „
আলু	৪০০ „	২ „	২০ „
গম	৩৫ „	১ „	৩ „

গাছে যদি ম্যাগনেসিযামের অভাব হয তার লক্ষণ প্রথমেই ফুটে ওঠে গাছের বুড়ো পাতায়। গাছের সবুজকণা বা কোবোফিল-এ অক্সিজেনের পবিমাণ হ্রাস পায এবং গাছের পাতা সবুজ রঙ হারিযে হল্‌দে হয়ে পড়ে। এই হল্‌দে হযে শুকিযে যাওযার রীতি প্রথমে পাতায় দেখা যায়। যে সমস্ত উপশিরার অন্তবর্তী স্থান আছে সেগুলি হল্‌দে হযে পড়ে। প্রথমে জলীয অংশ হ্রাস পায। গাছের নীচের দিক্‌কার পাতার শিরা ও উপশিরার মধ্যবর্তী স্থানে সবুজ রঙ কমে যেতে থাকে ও সাদা হয়ে যেতে থাকে। দেখতে অনেক সময ভাইরাস রোগে আক্রমণের মত হয। গাছের মাঝামাঝি অংশের পাতার রঙ হল্‌দে হযে আসে। কিন্তু উপরের পাতা স্বাভাবিক রকমের

সবুজ থাকে। কতকগুলি গাছের পাতা যেমন তুলা, লাইমাবীন, ষ্ট্রবেরী ইত্যাদি গাছের পাতা ক্রমশঃ লাল হয়ে পড়ে। কিন্তু শিরাগুলি গাঢ় সবুজ থাকে।

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে মাটিতে কাজ করে চলে, যদিও একের কাজ অন্যে করতে পারে না বা একে অন্যের পরিপূরক নয়। তবুও এদের যেন কোথায় একটা নাড়ীর টান আছে, মাটিতে এদের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু মাটিতে মোট ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অনুপাত ২ থেকে ১এর মধ্যে থাকে। মাটিতে নানা প্রকার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তার ফলে এদেরও পরিবর্তন হয়। ফলে এদের অনুপাত কোন নিয়মমাফিক ধারায় চলে না। ক্যালসিয়াম প্রায় সব জমিতেই অল্পবিস্তর থাকে তার ফলে দেখা যায় গাছ প্রায়ই এর অভাব বোধ করে না। কিন্তু ম্যাগনেসিয়ামের অভাব অনেক মাটিতেই আছে।

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম মাটিতে থাকে ত্রয়ী হয়ে। যদি এই রকমের মাটিতে পটাসিয়াম অধিক গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে তবে গাছ পটাসিয়ামের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয় এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণ হ্রাস পায়। কিন্তু যে মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব আছে সে মাটিতে অধিক মাত্রায় পটাসিয়াম যোগ করলে ম্যাগনেসিয়াম-এর অভাব বেশী প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এর জন্য মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বেশী করে রাখা ভাল। মাটিতে ক্যালসিয়াম যোগ করলে দেখা যায় যে, গাছ অধিকতর ফসফরাস গ্রহণ করছে।

কোন্ অম্ল মাটিতে গাছ জন্মায়—অম্ল মাটিতে সধারণতঃ ক্যালসিয়াম খুব কম থাকে। যে সমস্ত গাছ অম্ল মাটিতে ভালভাবে জন্মিতে পারে সেই সমস্ত গাছের এমন একটি স্বভাব তৈরী হয় যার দ্বারা এই ক্যালসিয়াম ব্যতিরেকে গাছ কাজ করতে পারে। এর ফলে গাছের দেহে এলুমিনাম ও ম্যাঙ্গানীজের অংশ বেশী হয়ে পড়ে। আলু একটু অম্লপূর্ণ মাটিতে ভালভাবে জন্মাতে পারে। এর বেশী অম্লতা অর্থাৎ মাটি আরও বেশী অম্ল হলে

আলুতে স্ক্যাব রোগ জন্মায়। এর ফলে যে গাছ অম্ল মাটিতে ভালভাবে বৃদ্ধি পায় সে গাছের দেহে ক্যালসিয়ামের অংশও কম। কিন্তু সাধারণভাবে মাটিতে ক্যালসিযাম যত কমই থাকুক গাছ নিজের প্রযোজনানুযাযী ক্যালসিয়াম মাটি থেকে সংগ্রহ করে। টিমথি ও রেড টপ ঘাসে শতকরা ০·৪০ ভাগ, রাইতে শতকরা ০·২২ ভাগ, জনার, বাজরা ইত্যাদিতে শতকরা ০·৯৬ ভাগ ক্যালসিযাম থাকে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত গাছ বা ফসল অম্ল মাটিতে জন্মায় তারাও মাটি থেকে তাদের প্রযোজনানুযায়ী ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করে। যে মাটির pH ইউনিট নিরপেক্ষ রেখায় সেখান থেকে সবচেয়ে বেশী ক্যালসিযাম সংগ্রহ করে আলফাল্‌ফা। পরিমাণ ২.৬%। আর অম্ল মাটি থেকে রাই ক্যালসিযাম গ্রহণ করে ০.২২% ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি ফসল অম্ল মাটিতেও ভালভাবে জন্মাতে পারে। যেখানকার মাটি অম্লতাপূর্ণ অর্থাৎ pH আনুমানিক কমবেশী ৪ ইউনিট সেখানে অম্লতা সহ্যকারী ফসল করলে ভাল ফল পাওযা যায। কিন্তু প্রতি বৎসর একই ফসল করলে সামান্য যে ক্যালসিয়াম থাকে সেটুকু গাছের মাধ্যমে দূরীভূত হবে ও মাটির অম্লতা আরও বেড়ে যাবে। তখন আর সেই ফসলও ভাল হবে না। যেমন আমাদের দেশের মাটিতে বৎসরের পর বৎসর ধান উৎপন্ন হচ্ছে। ফলে মাটিতে ধান গাছের প্রয়োজনানুযায়ী পদার্থগুলি ক্ষয পেয়ে যায়। আর যে পদার্থগুলি ধান গাছের প্রয়োজন হয় না সেগুলি মাঠেতে পরিমাণে বেড়ে যায়। যদি অম্লতা সহ্যকারী ফসলের মধ্যে এই ক্ষেতে শস্য পরিবর্তন কিংবা রোটেশান করা যায় তবে ভাল ফল পাওয়া যাবে আর চুণ না দিয়েও অম্লতা হ্রাস করা যেতে পারে। মটর, সীম ও ঈষৎ লাল রঙের ক্লোভার জাতীয ফসলের রোটেশান করলে মাটির উর্বরতা সমান থাকবে। কেবলমাত্র আলু বাদে আর অন্য যে কোন ফসল এই মাটিতে পরিমাণমত চুণ দিয়ে বেশী ফসল পাওয়া যাবে। এমনকি উৎপাদিত ফসলও দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে।

মাটিতে কোন মতেই কোন রাসায়নিক সারের সহিত মিশিয়ে চুণ দেওয়া উচিত নয়। কারণ চুণের স্বভাব হল যদি সেই সারে এমোনিযা থাকে তাকে টেনে বার করা। সুতরাং যদি এমোনিয়া নষ্ট হযে যায তবে আর সারের বিশেষ মূল্য থাকে না, কারণ গাছের উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধির জন্য এমোনিয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া এদের অভাবে ফসফরাস মিশ্র পদার্থ আর দ্রবণীয থাকে না, অনেক সময সার উৎপাদন করবার জন্য ১৫ থেকে ২০ পাউণ্ড পর্যন্ত জলীয চুণ (hydrated lime) ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে সার তৈরী করবার সময যে সমস্ত এসিড তৈরী হয সেগুলি নষ্ট হযে যায, তবে অনেক সময় সারের সঙ্গে পোড়া চুণ ব্যবহার করা হয। সব সময় নজর রাখতে হয এদের যেন পরিমাণ কম থাকে, শতকরা ৫ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয। অনেক সময জমিতে ম্যাগনেসিযাম দেওয়ার জন্য একরে ২০০ পাউণ্ড ডলোমাইট দেওযা হয। আবর্জনা সারের সহিতও চুণ দেওযা বঞ্ছনীয নয। আর আবর্জনা সার দিযেও চুণের কাজ হয না। অবশ্য অনেক সমষ অন্য দিক দিযে চুণেব কাজ হয। লৌহ চুল্লীর তলানি ময়লা (basic slag), ছাযনামাইড প্রভৃতি সারেতে মুক্ত চুণ থাকে, ফলে এগুলি দিলেও মাটির অম্লতা কিছু পরিমাণে কমতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ সার দিযে যেমন এমোনিযা ও ফসফরাস জাতীয সার দিযে মাটির অম্লতা নষ্ট করা যায না। প্রথমতঃ সারের দাম বেশী। দ্বিতীযতঃ যে সমস্ত পটাসিয়াম, সোডিযাম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি জাতীয় মিশ্র পদার্থ থাকে সেগুলির সহিত প্রায সব সময়ই জোরাল এসিড (Concentrated acid) মিশে থাকে। ফলে বীজাণু ক্রিয়াতে মাটির এসিডের ভাগ বেড়ে যায়। জিপসামে ক্যালসিয়াম ও সালফেট থাকে। কিন্তু চুণের বদলে জিপসাম ব্যবহার করা যায় না। বরং লোনা মাটিতে জিপসাম দিযে মাটির অম্লতা কমানো যায়। ফসফেট লোনা মাটির সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে ও তার pH কমাতে সাহায্য করে।

অনেক সময় অম্ল মাটিতে সুপার ফসফেট দিলে লৌহ, এলুমিনাম ও ম্যাঙ্গানীজ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট পরমাণুগুলি অকর্মণ্য হযে পড়ে, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য। সুপার ফসফেট কিছু পরিমাণে চুণের কাজ করলেও বেশী দিন স্থাযী হয না এবং ফসফরাসও গাছের গ্রহণযোগ্য থাকে না।

অম্লতা নিবারণে চুণ প্রয়োগ বিধি—কোন্ মাটিতে কতটা চুণ দিলে কি পরিমাণে pH এর পরিবর্তন হয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয করে কিছু বলা যায় না। কারণ এটা নির্ভর করে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কি প্রকারে চুণ যোগ করা হবে অর্থাৎ প্রয়োগপন্থা এবং সেই স্থানের বৃষ্টিপাত, মাটির মধ্যস্থিত জলের পরিমাণ এবং মাটির বিশেষ বিশেষ অবস্থা বৈশিষ্ট্যের উপর। কৃষি গবেষণাগারে মাটির অম্লতা দূরীভূত করবার পদ্ধতি দ্বারাতে কেবলমাত্র আংশিক অম্লতা দূরীভূত হয। এ ভিন্ন মিশ্র অবস্থায় কাদামাটির পরমাণুর মধ্যস্থলে অনেক অম্ল বৃদ্ধিকারক পদার্থের পরমাণু থাকে যারা সহজে জল সহযোগে সেই স্থান থেকে বেরিযে আসতে চায না এবং আসেও না। কিন্তু মাটিতে যদি চুণ যোগ করা হয় তবে তারা অনাযাসে স্থানচ্যুত হয় ও ব্যূহ ভেদ করে বেরিযে আসে। সেজন্য সব থেকে সুবিধা পরিমাণ মত মাটি সংগ্রহ করে তাতে পরিমাণ মত অল্প থেকে বেশী চুণ যোগ করে তার অম্লতার পরিমাণ কি পরিমাণে কমছে দেখে সেই পরিমানানুযাযী মাঠেতে চুণ যোগ করাই বিধেয। বালিময় দোঁয়াস মাটিতে (Sandy loam) যদি ২ টন চুণ ভাল করে গুঁড়া করে (১০০ মেস ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে) মাঠে ছড়ান যায় তবে দেখা যায় ১০ বৎসরে ঐ মাটির অম্লতা ৫.২ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে এসেছে। যদি দেড় টন জলীয় চুণ ছড়ান যায় তবে ঐ মাঠের উপরের ৬ ইঞ্চি মাটির pH ৫.২ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে আসতে ১০ বৎসর সময় লাগবে। কিন্তু দেখা যাবে ঐ মাঠেরই নিম্ন স্তরের মাটিতে pH এই দীর্ঘ বৎসরে মাত্র ৫ ইউনিট থেকে ৫.৬ ইউনিটে এসেছে।

এক লিটার পাতনিক জলে ০.০০০০০০১ গ্রাম সকর্মক হাইড্রোজেন থাকে।

১ লিটার (N) সাধারণ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ১ গ্রাম হাইড্রোজেন থাকে। সুতরাং ০'০১ সাধারণ এসিডে ০'০১ গ্রাম হাইড্রোজেন থাকে। সুতরাং নিরপেক্ষ মাটি ০'০০০০০০০১ গ্রাম (H) থাকে। এত বড় একটি গাণিতিক সংখ্যাকে কম বেশী করতে গেলে অসুবিধা হয বলে একে ভগ্নাংশে পরবর্তিত করে লবে নিয়ে আসা হয। ০'০০০০০০০১ = $\frac{১}{১০০০০০০০}$ = ($\frac{১}{১০^৭}$) ও লগারিথমে প্রকাশ করা হয। লগারিথমে প্রকাশ করলে পাওযা যায ৭। pH হাইড্রোজেন আযণের লগারিথম প্রকাশ মাত্র।

গুঁড়া করে মাটিতে চূণ দিলে তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। কিন্তু ঢেলার আকারে দিলে মাটির সঙ্গে মিশতে সময লাগে। তাতে কাজও ভাল হয না। কিন্তু যে মাটিতে বালু বেশী বা বালুময সে মাটিতে চূণ যদি ঢেলার আকারেও দেওযা যায তবে ফল পাওযা যায। কারণ বালু মাটিতে এই চূণ ঢেলাব আকারে দিলে প্রযোজনানুযাযী ক্যালসিযাম চূণ থেকে বেরিযে মাটির অম্লতা দূর করতে সাহায্য করবে। মাটিতে জলের সহিত ঝিনুকের চূণ মিশিযে দেওযা ভাল কিংবা চূণ খুব ভাল করে গুঁড়া করে দেওযা উচিত। বংলাদেশের গাঙ্গেয অববাহিকার মাটি পলি দিযে গড়া। এতে সাধারণত বালুকণা ও বালুব স্তব প্রধান। ৪ থেকে ৬ বৎসর অন্তর মাটিতে দেড় টন চূণ দিলে ভাল ফল পাওযা যাবে। কাদা মাটিতে এরও বেশী চূণ যোগ করতে হয। পলি মাটিতে এব থেকে কম। যেখানে বেশী বৃষ্টি হয সেখানে চূণও বেশী যোগ করতে হবে।

মাটিতে চুণ যোগ করবার সময়—কলের লাঙ্গল দিযে মাটি চষবার সময় জমিতে অর্দ্ধেক চূণ দিযে দেওযা উচিত। এ দিযে ভাল ফল পাওযা যায। চূণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশবার সময পাবে। এ বাদে যখন ডিস্ক হ্যারো (Disc harrow) দিযে মাটি খোঁড়া হয় তখন বাকী অর্দ্ধেকটা দিযে দিলে ভাল হয়। সব সময়ই দেখা গেছে যে মাটিতে বীজ বপন করবার আগে চূণ ছড়ানোর পর্ব সমাধা করতে হয়। অনেকে মাটিতে যখন ফসল থাকে

তখন চুণ যোগ করে থাকেন। এতে ভাল ফল সে বছর পাওয়া নাও য়েতে পারে। অনেকে মাঠে ফসল উঠে গেলে প্রথম চাষের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে অর্দ্ধেক চুণ ছড়িয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। পরে জমিতে বীজ ছড়াবার কিছু আগে বাকি অর্দ্ধেক চুণ দিয়ে দিলে ভাল হয়। জমিতে চুণ ছড়ালে চুণ নিজে গাছের কোন উপকার করতে পারে না। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি মাটির সঙ্গে চুণ মিশতে পারে গাছের পক্ষে ততই ভাল। চূণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশতে প্রথম দরকার জলকণা, দ্বিতীয়তঃ মাটির সংস্পর্শে আসা।

যে মাটিতে অম্লতা অল্প অর্থাৎ মাটির অম্লতার পরিমাণ ৫.৮ ইউনিট থেকে ৬.৮ ইউনিট-এর মধ্যে সেখানে বীজের নীচে যদি চুণ দেওয়া যায় তবে ভাল ফল পাওযা যাবে। এতে চূণের ক্ষযও কম হবে। যে মাটিতে আলু বা তামাকের চাষ করা হয সেখানে ফসল উঠে গেলে পর জমিতে চুণ দেওযা উচিত। কারণ জমিতে চূণ দিলে মৃত্তিকা-রক্ষিত গাছের রোগের বীজাণুগুলি সকর্মক হয সুতবাং তখন যদি মাঠে ফসল থাকে তবে সে ফসলের গাছ রোগাক্রান্ত হযে পড়ে।

চুণের ক্ষয়—বৃষ্টির জল অনেকটা চূণ মাটি থেকে বয়ে নিযে যায। আর জলের সহিত মিশে কিছু চূণ চুইযে মাটির নীচে চলে যায। যেখানে বৎসরে ৩০″ বৃষ্টি হয সেখানে অবশ্য চূণের ক্ষয মাটির টাইপের উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির জল বৎসরে ১০০ পাঃ ক্যালসিযাম অকসাইড মাঠ থেকে বয়ে নিযে যেতে পারে। চুইযে প্রায ৫০ পাউণ্ড নষ্ট হয়। আমাদের দেশে এই অঞ্চলে প্রায ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয। সুতরাং বৃষ্টির জলে ৩০০ পাউণ্ড আর চুইয়ে ১০০ পাঃ চূণ মাঠ থেকে বেরিযে যাবে। চুণ অন্যান্য পদার্থের মত মাটির নিম্নস্তর থেকে উপরে উঠে আসতে পারে না।

অম্লতা বৃদ্ধির উপায়—এতক্ষণ অম্লতা হ্রাস করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল এখন দেখা যাক কি করে অম্লতা বৃদ্ধি করা যায়। অর্থাৎ কি করে লোনা মাটির লবনত্ব নষ্ট করা যায়। ফসলের পক্ষে দুইই ক্ষতিকর।

যেমন বেশী অম্ল মাটিতে ভাল ফসল হয না তেমনি বেশী লোনা মাটিতেও ভাল ফসল হয না।

গন্ধক গুঁড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করার প্রধান উপায়। কিন্তু সবসময় গন্ধক পাওয়া যায় না। আর এতে খরচও বেশী হয। এ বাদে আরও কযেকটি রাসাযনিক পদার্থ আছে যা দিযে অম্লতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যেমন সালফিউরিক এসিড, এমোনিযাম সালফেট ও অম্লপূর্ণ পীট মাটি। এক একর জমিতে ৪০০ পাউণ্ড গন্ধক গুঁড়া করে মিশালে সেই বৎসরই মাটির অম্লতা ½pH ইউনিট কমে যাবে। ফুলের বাগানে সাধারণতঃ এমোনিযাম সালফেট দেওযা হয। যেখানে গাছের বৃদ্ধির প্রযোজন সেখানে এমোনিযাম সালফেট দিলে গাছ নাইট্রোজেন পায আব সালফেট মাঠের অম্লতা বাড়াবে।

মাটিতে চুণ দেওযার পর যদি জমিতে এমোনিয়াম সালফেট দেওযা হয তবে এই সার থেকে কয়েকটি বিশেষ বীজাণু-ক্রিযার প্রভাবে এমোনিযাম ও সালফেট তৈরী হয পরে এমোনিয়া থেকে নাইট্রিক এসিড তৈরী হয় ও মাটির অম্লতা বৃদ্ধি করে। আর সালফেট থেকে সালফার বেরিযে এসে নানা বীজাণু-ক্রিয়ার মধ্য দিযা হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশে সামান্য পরিমাণে সালফিউরিক এসিড তৈরী করে। সে কারণে এমোনিযাম সালফেট মাঠে দিলে মাঠের অম্লতা বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর জমিতে চুণ যোগ করলে ঐ অম্লতা দূরীভূত হয। মাটিতে চুণ দিলে লেগুমিনাস জাতীয় গাছ বাতাস থেকে বেশী নাইট্রোজেন টেনে আনবে। ফলে মাঠের নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ বিশেষ বীজাণু-ক্রিয়ার ফলে গাছ বেশীমাত্রায ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণ করতে পারে। ফলে এই দুইটি সার কমে যেতে পারে। সেকারণ এই দুইটি সার যে বৎসর জমিতে চুণ দেওযা হয় সে বৎসর একটু বেশী পরিমাণে দেওয়া উচিত।

মাটির উপরিস্তরে সোডিয়াম জমা হওয়ার প্রধান কারণ মাটির আভ্যন্তরীণ

জলের প্রবাহ সব সময়ই উপরিস্তরে থাকে। বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায় যে মাটির উপরে একটা সাদা স্তর পড়েছে। এই মাটিকে চাষের উপযোগী করতে গেলে দরকার হয় গভীর নালা কেটে মাটির আভ্যন্তরীণ জলপ্রবাহকে নীচে নিয়ে যাওয়া। গাছ কিন্তু সোডিয়াম কার্বনেটের চেয়ে সোডিয়াম সালফেট বেশী গ্রহণ করে। গন্ধক দিয়ে সোডিয়াম কার্বনেট সালফেটে পরিণত হয়। কিন্তু সব থেকে ভাল হয় যদি এক একর জমিতে ৩০০ পাউণ্ড গন্ধক, ১০০ পাউণ্ড জিপসাম ও অন্ততঃ ৩০ টন আবর্জনা সার একসঙ্গে মিশিয়ে ছড়ান যায়।

মাটিতে অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ

সাধারণত নাইট্রোজেন পটাশ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম মাটিতে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে বেশী মাত্রায় থাকে। সেজন্য এগুলিকে প্রধান রাসায়নিক পদার্থ বলা হয়। এ ভিন্ন মাটিতে বোরণ, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, দস্তা (Zinc), কোবাল্ট, এলুমিনাম্, মলিবডিনাম, সালফার, ক্লোরিণ, সেলেনিয়াম ও আইডিন প্রভৃতি অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ খুব কম মাত্রায় থাকে। সে জন্য এগুলিকে বলা হয় মাটিতে অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ। গাছকে যদি সুস্থ ও সতেজ করে গড়ে তুলতে হয় তবে এদের প্রয়োজন আছে। এদের প্রয়োজন গাছের এত কম যে প্রায়ই মাটিতে এদের পরিমাণ ঠিকই থাকে, বছরের পর বছর সামান্য মাত্রায় মাঠ থেকে উঠে গেলেও গাছের চাহিদা মেটাবার মত পরিমাণ মাটিতে থেকে যায়। এদের মধ্যে লোহা, বোরণ ও ম্যাঙ্গানীজ-এর অভাব হলে গাছের দেহে যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া চলে তার কোন না কোনটির ব্যাঘাত ঘটে। ফলে কোন কোন রোগের চিহ্ন দেখা যায়।

আজকাল পৃথিবীতে প্রধান সার নিয়ে যত না কাজ হচ্ছে তার বেশী

কাজ হচ্ছে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলি নিয়ে। মাটির মধ্যে এই সমস্ত অপ্রধান পদার্থগুলির ঠিক ঠিক স্বভাব জানা যায় নি। তবে গাছের যে প্রয়োজন আছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এদের প্রয়োজন গাছের অতি অল্প পরিমাণে। কেন এদের প্রয়োজন? গাছের দেহে গিয়ে এরা কি কাজ করে? আজও নিশ্চিত করে বলা কষ্টকর। তবে মৃৎ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে মাটিতে গাছের বৃদ্ধির জন্য অন্য প্রধান রাসায়নিক সারগুলি থাকলেও কেবলমাত্র এই অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলির অভাবে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না। গাছ একেবারে মরে যায় না সত্য কিন্তু তার ফসল কমে যায়।

একই গাছের পক্ষে সবগুলি অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োজন হয় না। এক একটির জন্য এক একটি বিশেষ অপ্রধান পদার্থের প্রয়োজন হয়। সেই একটি কি দুইটি পদার্থ ব্যতিরেকে গাছ বাড়লেও তার ফসল ভাল হয় না। সেই বিশেষ একটি পদার্থের অভাবে গাছের নানা রোগ জন্মায়।

আনাজী কলাতে লৌহ আছে আমরা সবাই জানি, কিন্তু এই আনাজী কলা লৌহ পেলো কোথায়? গাছ মাটি থেকে এই লৌহ সংগ্রহ করেছে, মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক একর জমিতে ৩ পাউণ্ডের বেশী লৌহ নেই। অথচ কাঁচ কলাতে ৫ থেকে ১০ পি. পি. এম. লৌহ রয়েছে। এ দিয়ে বোঝা যায় যে আনাজী কলাগাছ মাটি থেকে লোহা টেনে নেয়।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কাজে এই অপ্রধান রাসায়নিক পদার্থগুলি কাজে লাগে।

(১) কোন কোন গাছের এগুলি বিশেষ বিশেষ খাদ্য, সবগুলিকে একত্রে গাছের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও এদের মিশ্রিত কোন কোন বিশেষ দ্রব্য গাছ শিকড় দিয়ে টেনে নেয়। এদের গাছের বৃদ্ধিতে বেশ প্রয়োজন আছে।

(২) অনেক সময় দেখা যায় মাটিতে কোন প্রধান রাসায়নিক পদার্থের অভাব হলে এই সমুদয় প্রধান পদার্থের অভাব পূরণ করে। অবশ্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব বোরণ দিয়ে মিটান যায় না। এটা যেন আমাদের দেশে যে চলতি কথা আছে 'মধ্বাভাবে গুড়ং দত্তাৎ' এর মত। এখানে যেমন দুইটি পদার্থের মধ্যে মিষ্টতা বর্তমান ওদের তেমনি উভয় ধাতব পদার্থে সমগুণ সম্পন্নতা থাকে।

(৩) অনেক সময় গাছের দেহে ভিটামিন তৈরী করিতে এরা সাহায্য করে।

(৪) কোন কোন পদার্থ মাটির মধ্যে বেশী থাকে ও তার ফল ক্ষতিকর হয়, ফলে তাদের প্রভাবে গাছ মরে যায়। এই অপ্রধান ধাতু মাটিতে থেকে সেই বিষাক্ত আবহাওয়া নষ্ট করে দেয়।

(৫) এর অবস্থিতির ফলে গাছের অনেক সময় রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ে।

(৬) এরা অনেক সময় গাছের দেহেতে উত্তেজনা আনে।

উপরে যে সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা গেল এগুলি সবই সম্ভাব্য পর্যায়ে নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না তবে এটা স্থির নিশ্চিত যে এদের প্রভাবে গাছের খাদ্য-গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। এ যেন ঠিক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পরিবেশকের খাবার যাচাই করা। একটু একটু খেতে খেতে বেশী খাওয়া হয়ে যায়। ফুটবল খেলায় দর্শকের চেঁচামেচিতে অন্যের কোন কাজ হোক আর নাই হোক খেলোয়াড়ের প্রাণ দিয়ে খেলতে ইচ্ছা হয়। তেমনি এই অপ্রধান পদার্থগুলির উপস্থিতিতে গাছের খাওয়ার ইচ্ছা বাড়ে।

গাছের পক্ষে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়

বেশী পরিমাণে	খুব কম পরিমাণে
নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন।	লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তামা, দস্তা, বোরণ, মলিব্‌ডিনাম।

গন্ধক (Sulfur) গ্রীষ্মকালের মাটিতে কার্বন জাতীয় পদার্থের সহিত মিশে গন্ধক অবস্থান করে। গ্রাম্মপ্রধান দেশের মাটিতে ১০০ থেকে ৩০০ পি. পি. এম. পর্যন্ত সালফাব পাওযা যায। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মাটিতে কার্বন জাতীয পদার্থের অবস্থানের পরিমাণের উপর সালফারের অবস্থান নির্ভর করে। শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ভূমিতে সালফার সাধারণতঃ 'B' স্তরে পাওযা যায।

যদি কোন দেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য বাসাযনিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায তবে দেখা যায যে, N, P_2O_5, K_2O 3 SO_3 এর অবস্থানের পরিমাণের অনুপাত ১ : ০.৪ : ০.৬ : ০.৩।

অতি সহজেই গন্ধক গাছের পাতায ঢুকতে পারে। গাছের প্রোটিন তৈরী কবতে গন্ধকেব দবকার হয আর এর পবিমাণ ঠিকমত থাকলে নাইট্রেট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায না ও গাছের এমোনিযা নাইট্রোজেন নিতে কোন কষ্ট হয না। লেগুমিনাস জাতীয গাছের বেশী গন্ধক প্রযোজন। গন্ধক লেগুমিনাস জাতীয গাছের নডুল বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

গাছ সোজাসুজি মাটি থেকে সালফেট (SO_4) গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর উপরিভাগে বাতাসে ০.০৫ পি. পি. এম. সালফেট আছে। বাতাসে কার্বন ও সালফেটের অনুপাত ২৪০০ : ১ গাছের' পাতায ১৫০ : ১। খুব সম্ভবতঃ এর কিছু পরিমাণ সালফার গাছ বাতাস থেকে সংগ্রহ করে।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ পচে মাটিতে গন্ধক জমা হয। অনেকে মনে করেন হাইড্রোজেন সালফাইড আকারে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে বেরিয়ে আসে পরে অক্সিজেনের প্রভাবে সালফেটে পরিণত হয।

এই সালফেট অতি সহজেই জলে দ্রবণীয়। সুতরাং আর্দ্র অঞ্চলে ইহা অতি সহজেই জলেব সহিত চুইযে যেতে পারে বা গড়িযে মাটি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। মাটিতে যে সালফেট আছে সেটা যদি গাছ গ্রহণ না করে তবে

চুইযে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এক একর জমি থেকে ৪১.৮ পাঃ সালফেট চলে যায। বৃষ্টির জলের সঙ্গে আকাশ থেকে কিছু গন্ধক মাটিতে এসে পড়ে। এক একর জমিতে বৎসরে প্রায ৩০ পাঃ গন্ধক যোগ হতে পারে। সুতরাং গন্ধকের ক্ষয অনায়াসে পূরণ হয। সাধারণতঃ একক সুপার ফসফেটে শতকরা ৩০ ভাগ SO_3 ও ২০ ভাগ P_2O_5 থাকে। এমোনিয়া সালফেটে ৬০ ভাগ SO_3 ও শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আবর্জনা সারে টন প্রতি ৪ পাঃ SO_3 থাকে।

জমিতে সারের সঙ্গে যে SO_3 দেওযা হয ও বাতাস থেকে বৃষ্টির জলে যে পরিমাণ SO_3 মাটিতে পড়ে তাব পরিমাণ মাঠ থেকে গাছ যে পরিমাণে SO_3 টেনে নেয তার পরিমাণ থেকে বেশী। সে কারণে যে মাটিতে সার দেওযা হয় সে মাটিতে সাধারণতঃ গন্ধকের অভাব হয না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোনা মাটি

(Acid & Saline Soil—their formation and occurrence)

সুন্দরবনের লোনা মাটি ও তার প্রতিকার : বাংলা দেশে দক্ষিণে সমুদ্রের ধারের বহু জমি লোনা মাটিতে ভর্তি। কলিকাতার পূর্বদিকেও লবণ হ্রদ আছে যার ফলে দিনের পর দিন কলিকাতার স্ফীতি উত্তর-দক্ষিণে বৃদ্ধি পেলেও পূর্বদিকে বাড়বার কোন সুবিধা নাই। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বিরাট আয়তন ব্যেপে লোনা মাটি রয়েছে। সমুদ্রের তীর থেকে বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া থানার উত্তররেখা পর্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে কলিকাতা ও তার উত্তর-দক্ষিণের কিছু স্থান বাদ দিয়ে প্রায় সমুদয় ভূভাগ এর কবলে কবলিত।

লোনা মাটি সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ বিভিন্ন পরিমাণে—সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্ষারজাতীয় মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ বেশী আকারে থাকে ও ক্লোরাইড ও সালফাইড জাতীয় অম্ল পদার্থ কম থাকার জন্য। যখন পাথর থেকে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি সৃষ্টি হতে থাকে তখন পাথর থেকে এই ক্ষারজাতীয় পদার্থ নির্গত হয় ও তাদের ঘনত্ব বাড়বার ফলে মাটিতে লবনাক্তত্বা বাড়ে। জলের সঙ্গে CO_2 কার্বণ ডায়ক্সাইড মিশে এই সমস্ত মিশ্র রাসায়নিক পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে এবং সেই সমস্ত ধাতব পদার্থের বাইকার্বনেট তৈরী করে। অনেক সময় এই CO_2, বাষ্প বাতাস থেকে মাটিতে আসে কিম্বা ক্ষুদ্র বীজাণুর মাধ্যমে নির্গত হয়। কার্বনেটও বাইকার্বনেট বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অনেক সময় এদের অবস্থিতির পরিমাণের উপর মাটির pH-এর পরিমাণ নির্ভর করে।

লোনামাটির উৎপত্তির প্রধান কারণ—ঐ জাতীয় পদার্থ উৎপত্তি স্থানের পাথরে অবস্থিতির জন্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে যে সমস্ত হ্রদ বা সাগরে এই লবনজাতীয় পদার্থ নদী টেনে এনে ফেলেছে সেখানকার জল লোনা। তারপর কালক্রমে কোন নৈসর্গিক কারণে সেখানে যদি জল শুকিয়ে গিয়ে ভূভাগের সৃষ্টি হয় তবে সেই মাটি লোনা হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়।

সাধারণতঃ উষ্ণ ও আধা উষ্ণ অঞ্চলে লোনা মাটি দেখা যায়। তার কারণ সহজ দ্রব লবণ জাতীয় পদার্থ কোন স্থানের আর্দ্রতার প্রভাবে জলের সঙ্গে নীচে চলে গেলে সেখানকার মাটি আর লোনা থাকে না।

লোনামাটি সাধারণতঃ তিন রকমের দেখতে পাওয়া যায় (১) লোনা মাটি, (২) লোনা ক্ষার মাটি ও (৩) আলুনি ক্ষার মাটি।

লোনা মাটি চেনার উপায়।—কোন স্থানের মাটির উপরে সাদা স্তরের সন্নিবেশ দেখে। রাশিয়ায় এই মাটিকে বলা হয় সোলানচক। এই জমি ফসলের পক্ষে উপযুক্ত নয়। কারণ এই ক্ষার জাতীয় পদার্থ মাটির মধ্যে থেকে গাছপালাকে শিকড় দিয়ে সার টানতে বাধা দেয়। তবে কয়েকটা গাছ আছে যারা এই লোনা মাটিতেও বেশ ভাল ভাবে বাড়ে। পূর্ণবয়স্ক মাটিই হোক পলিমাটিই হোক সর্বত্রই লোনা মাটি গড়ে উঠতে পারে।

মাটিতে কতটা ক্ষারজাতীয় পদার্থ আছে এবং কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থ কতটা আছে তার উপর মাটির লবণাক্ততা নির্ভর করে।

লোনা মাটির প্রভাবে ও ক্ষার মাটির প্রভাবে এই মাটির সৃষ্টি হয়। এদের pH প্রায় ৮ থেকে ৯এর মধ্যে থাকে। ক্ষার জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকায় মাটিতে জল পড়লে ফুলে উঠে। মাটিতে যে পরিমাণে ক্ষার জাতীয় পদার্থ আছে যদি চোয়ানির ফলে মাটির ক্ষার জাতীয় পদার্থের হ্রাস হয় তবে সেই মাটি ফসলের উপযোগী হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে সোডিয়াম দিয়ে জলের সহযোগে সোডিয়াম হাইড্রকসাইড তৈরী করে তারপর

CO_2 সহযোগে সোডিযাম কার্বনেট তৈরী হয। এই জাতীয় মাটিতে pH ৮.৫ ইউনিটের উপরে সমুদয় সোডিয়াম বিক্ষিপ্ত হযে পড়ে। এই জাতীয মাটিকে ফসলের উপযোগী করা খুবই কষ্টকব। কারণ গাছের শিকড থেকে সমুদয ক্ষারজাতীয পদার্থ ও পরিবর্তনযোগ্য সোডিযাম দূরীভূত না করলে গাছ ভালভাবে জন্মাবে না।

আ-লোনা ক্ষার মাটি—এই জাতীয় লোনা মাটিতে পরিবর্তনযোগ্য সোডিযাম খুব বেশী থাকে। এর নাম দেওযা হযেছে "কৃষ্ণ ক্ষার" আর রাশিয়ায একে বলা হয সলোনেজ। যদি সময পায তবে অতি সহজে এই জাতীয মাটি তাদের সত্ত্বা গড়ে তুলতে পাবে। সাধাবণত লোনা মাটিতে জল শোষণেব ক্ষমতা কম। বিশেষুতঃ এই জাতীয মাটির নিম্নস্তবে একটি অপ্রবেশ্য স্তরের সৃষ্টি করে। ফলে জল চুইয়ে নীচে যেতে পারে না। pH 6-এ নেমে আসে। যেখানে চুণ নেই সেখানে এই জাতীয ক্ষার মাটি গড়ে উঠতে পারে।

লোনা মাটিকে ফসল উৎপাদনেব উপযোগী করবাব প্রধান উপায হলো জমিতে নালা কেটে চাবিদিককার জল সরিযে দেওযা। ফলে মাটিতে যে সমস্ত সহজ দ্রব্য লোনা জাতীয মিশ্র বাসাযনিক পদার্থ থাকে তারা জলের সঙ্গে মিশে নীচে চলে যাবে এবং ধীরে ধীবে নালীতে এসে পড়বে এবং দূরে চলে যাবে। সাধারণত গাছেব শিকড ৫।৬ ফিটেব নীচে যায না সুতরাং নালী ৭ ফিট গভীর হওয়া প্রযোজন। ফলে ঐখানে জলের উচ্চতা ৬ ফিটের মধ্যে থাকবে।

দ্বিতীয উপায হলো ঐ জমিতে মিষ্টি জল ঢেলে দিলে চুইযে যাবার সময তারা সহজ দ্রব মিশ্র পদার্থগুলি জলের সাথে মিশে যাবে এবং গাছের শিকড়ের চারিদিককার জমি থেকে লোনা জাতীয মিশ্র পদার্থগুলি ধুইয়ে নিযে যাবে। এতে কিছু জলের ক্ষতি হয। জমিতে যখন সমানভাবে জল ঢেলে দেওয়া যায তখন জমির চারিদিকের ক্ষার পদার্থ নীচে চলে যাবে। যদি জমি

নীচু হয় তবে কোন ক্ষতি নেই। যদি উঁচু জমি হয় তবে যাতে জল সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে মিঠা জল মাটির নীচে দিয়ে চুইয়ে যেতে পারে। লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এই ধরণের ফসল সেখানে করা উচিত।

যতক্ষণ পর্যন্ত না উপরের সাদা স্তর দূরীভূত হয় ততক্ষণ এই মাঠে জল দেওয়া উচিত। যদি সুবিধা হয় তবে ঐ মিষ্টি জল ওখানে আটকে রেখে জল শুকানোর সাথে সাথে মাটি শুকালে ভাল হয়।

এই রকম জমিতে কমপোষ্ট ও সবুজ সার ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়। জমিতে চোঁযাবার জন্য কতটা জল লাগবে তার পরিমাণ নির্ভর করে সেখানে যে ধরণের ফসল রোপন করা হবে তার প্রয়োজনীয়তার উপর।

লোনা মাটির লবনত্ব কমাবার প্রধান উপায় জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জিপসাম ছড়িয়ে। ক্যালসিয়াম সালফেট থেকে ক্যালসিয়াম বিচ্যুত হয়ে সোডিয়াম মিশ্র পদার্থের সোডিয়ামকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে বসে যাবে। মাটিতে অল্প ক্যালসিয়াম মিশ্র পদার্থ থাকতে পারে কিন্তু বাইরের থেকে কোন সহায়ক মাটিতে না পড়লে বিশেষ কাজের হয় না। মাটিতে যদি একটু CO_2 থাকে তবে হাইড্রো কার্বনিক এসিড তৈরী হবে ও তার ফলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সহজদ্রাব্য হবে। মাটিতে গন্ধক প্রয়োগ করলে লোনা মাটির লবনত্ব কমান যায়। কিন্তু গন্ধক বিশেষ দামী হওয়ায় সবসময় প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

লোনা মাটিতে যে জল দেওয়া হয় লক্ষ্য রাখতে হবে সে জলে যেন সোডিয়াম না থাকে, অন্যান্য পদার্থ যত থাকে ততই ভাল। জলের ও লোনা মাটির সংমিশ্রণে উপরের মাটি একটু ফুলে ওঠে। পা দিলে পা আটকে যায়, মাটির কোলয়েড থেকে সোডিয়াম দূরীভূত হলে জলের সঙ্গে ক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সোডিয়াম কার্বনেট তৈরী করে, pH বৃদ্ধি পায় এবং মাটির কোলয়েড ভেঙ্গে যায় ও স্ফীত হয়ে ওঠে।

যখন জমিতে সহজ দ্রাব্য ক্যালসিযাম মিশ্র পদার্থ থাকে এবং জলে ক্যালসিয়াম থাকে না তখন সেই জল মাটিতে সেচন করলে ও জমিতে জিপসাম ($CaSO_4$) ছড়ালে ভাল ফল পাওযা যায। পরিমাণ নির্ভর করে জলের ও জমির লবণাক্ততার উপর। (1) একরে ৩০০০ পাঃ জিপসাম ছড়িযে সামুদ্রিক জলার জমিতে ভাল ফল পাওযা যাচ্ছে। ৩৬০০ পাঃ গন্ধক ১২ টন জিপমাসের থেকেও কার্যকরী।

$CaSO_4 + Na_2CO_3 = Ca.co_3 + Calo_3 + Na_2So_4$ (জলের সঙ্গে মিশে নীচে চলে যাবে)

$CaSO_4 + Na\ (clay)\ Na = Na_2SO_4 + Ca\ (clay)$

মাটিতে গন্ধক দিলে—

$2S + 3O_2 + 2H_20 = 2H_2SO_4$

$H_2SO_4 + Na_2CO_3 = Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$

$H_2SO_4 + CaCo_3 = CaSO_4 + H_2O + Co_2$

১২ টন জিপসাম বা ৩৬০০ পাঃ গন্ধক এক একব জমিতে এক বৎসবে pH ১০ ইউনিট থেকে ৭ ইউনিটে নিযে আসবে। গন্ধক দিযে তাড়াতাডি ফল পাওযা যায। মাটির সমস্ত সোডিযাম দূরীভূত কবাতে ৭ বৎসর সময লাগবে।

হাঙ্গেরীয লোনা মাটিকে 'জিক' বলে। সিগমণ্ড দেখিযেছেন যে নিম্নলিখিত প্রক্রিযায হাঙ্গেরীয লোনা মাটি চাষযোগ্য করা হয।

(১) নালী তৈরী করে,

(২) নীচের জলের স্তরে উপরে উঠতে না দিযে,

(৩) আগের থেকে মাটির নীচে শক্ত প্যানের সৃষ্টি করে, যেন নীচের জল কৈশিকাকর্ষণে মাটির উপরে না আসে। এর জন্য তিনি মাটিতে চুণ, জিপসাম ও কমপোষ্ট প্রচুর পরিমাণে মাঠে যোগ করেছেন। লবণাক্ততার জন্য মাঠে অঙ্কুরোদ্গম হয় না।

লোনা জমির উদ্ধার—সমুদ্রের নিকটবর্তী জমিতে প্রথমে বাঁধ (dyke)

বেধে দিতে হয় যেন সমুদ্রের লোনা জল বাঁধের মধ্যে না ঢোকে। জমির লোনা জল পাম্প করে বাব করে দিতে হয়। হল্যাণ্ডে বহু জমি সমুদ্রের মধ্য থেকে তৈরী হয়েছে। প্রায় ৩০০ বৎসর ধরে সেখানে চাষ হচ্ছে। এগুলোকে বলে "পোল্ডার"। এর প্রধান লক্ষ্য হলো নালী কেটে লোনা জল বার করে দেওয়া। যেখানে সম্ভব সেখানে মিষ্টি জল বেঁধে রেখে জমিতে চোযানির ব্যবস্থা করা। এমনভাবে ফসল চাষ কবতে হবে যেন মাটিতে কার্বনিক এসিড পড়ে। ভিজে মাটিতে লাঙ্গল দিলে মৃত্তিকার তাপ নষ্ট হযে যায। হল্যাণ্ডে গত যুদ্ধের সময ডাইক ভেঙ্গে মধ্যে যে লোনা জল ঢোকে এবং প্রায ১৮ মাস সেখানে লোনা জল দাঁড়িযেছিল। দেখা যায, সেখানে একরে ৩ টন জিপসাম ছড়িযে ৮ বৎসবে ভাল ফল পাওযা গেছে এবং আলফালফা এবং বার্লি ইত্যাদি ফসল করে মাটিব বৈশিষ্ট্য পুনরায ফিবিযে আনা গেছে।

ভাবতবর্ষের গুজরাটে এবং বাংলাদেশে অনেক জমি আছে যেখানে লবণাক্ততার ফলে ফসল করা যায না। সাধারণত যে জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু সেখান থেকে এই ক্ষার জাতীয পদার্থ চুইযে এসে জমা হয়েছে। জলসেচন ব্যবস্থার দ্বারা মাটিব ক্ষাবত্ব কমান যায কিন্তু যদি অতিরিক্ত পরিমাণে জলসেচন কবা যায তবে মাটিব লবণাক্ততা না কমে আবও বেড়ে যাবে। কারণ জলেব সমতা প্রায মাটির সমতাব সমান হবে। তার ফলে জমির লবণাক্ততা বেড়ে যাবে। ফলে সেই জমিতে আর ভাল ফসল হবে না কেবল লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন ঘাস আর কোন কোন আগাছা জন্মাতে পারে।

এই জমি ব্যবহার করতে গিযে বিশেষ নজর রাখতে হয় বীজ তলা তৈরী করার সময। সামান্যমাত্র লবণ জল বীজকে নষ্ট করে ফেলে এবং অঙ্কুর জন্মাতে দেয় না। একটু উঁচু করে বীজ তলা তৈরী করে ভাল করে মিষ্টি জল দিযে ধুইযে ফেললে সহজে বীজ থেকে চারা বার হবে।

লোনা জমির জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়া করতে হয়। অনেক সময়

জমির এই পার্থক্য না বোঝার ফলে কৃষক তার ক্ষেতে ভাল ফসল পায় না। এর জন্য প্রয়োজন লবণ সহ্যকারী ফসল বিশেষতঃ লবণ সহ্যকারী বীজ, অবস্থানুযায়ী জলসেচ, বিশেষভাবে লাঙ্গল দেওয়া ও অন্যান্য মৃত্তিকাকর্ষণের নিয়মাবলী।

(১) যে সমস্ত ফসল লবণ সহ্য করতে পারে না সেরকম ফসল লোনা মাটিতে না করে যে ফসল লবণত্ব সহ্য করতে পারে সেইসব ফসলের বীজ চাষের ব্যবস্থা করলে ভালভাবে জন্মাবে। চিনির বীট, বিলাতী বেগুন ইত্যাদি খুব ভালভাবে জন্মায়।

(২) জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সেচন করে সহজ দ্রব্য লোণা মিশ্র পদার্থ তাকে জলে মিশিযে তরল করে রাখলে কমক্ষতি করতে পারবে। জল সেচনের ফলে মাটির নীচে সহজ দ্রব পদার্থ চুইযে যেতে পারবে। ফলে গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি ও পরিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে।

যদি মাটিতে সোডিয়াম মিশ্র পদার্থ থাকে তবে মাটির জলকণার সহিত এমন একটি চাপের সৃষ্টি করবে যার ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যাবে। জমিতে এমন ভাবে, এর যখন ফসল থাকে না তখন মিষ্টি জল সেচন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে বর্ষা সমাগমে পুকুর, খানা সব ভরে যায়। ঐ সময় যদি লোনা জমির উপর মিষ্টি জল বেধে রাখা বা সেচন করা যায় তবে যে সমস্ত সহজ দ্রব্য সোডিয়াম মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ নীচে চুইযে যাবে, কিন্তু তার থেকে আরও ভাল হয় যদি গরমের সময় কিংবা শীতকালের শেষে যদি জলসেচন করা যায় তবে আর সাদা ক্ষারগুলি মাটির নীচে থেকে উঠে আসতে পারবে না। যেখানে এভাবে জমিকে চাষের উপযোগী না করা যায় সেখানে পাইপের সাহায্যে জলসেচন করলে কাজ চলতে পারে।

জমিতে চাষ দেওয়ার প্রথা—জমিতে উঁচু ভিলি তৈরী করে লেটুস উৎপন্ন করা যেতে পারে। উঁচু ভিলির নীচের নালীতে অনেক সময় সাদা স্তর পড়বে। যেখানে সাদা স্তর পড়েনি সেখানে লেটুস উৎপন্ন করা যাবে।

ফলে ঐ গাছ যে অঞ্চলে অল্প ক্ষার আছে সেখানে শিকড় চালাবে ও ভালভাবে বেড়ে উঠবে। গাছ বেড়ে উঠলে তখন আর মাটির ক্ষার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যেখানে অতি সহজে মাটির মধ্যকার সহজ দ্রব সোডিয়াম মিশ্র পদার্থ জলের স্তর জমির উপরে চলে আসে সেখানে নানাবিধ ঝোপ গাছ জন্মে থাকে জমিতে। এইভাবে সেখানে সোডিয়াম জমতে দেওয়া হয় না। যেখানে জলের স্তর খুব উপরে সেখানে অনেক সময় এদিয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মাটি থেকে সোডিয়াম অপসারণ করলে মাটি অনেক সময় নিকৃষ্টতম হয়ে পড়ে। মাটিকে গ্রানুলার আকৃতিতে আনার জন্য বেশ চেষ্টা করতে হয়। ঘাস উৎপন্ন করে, মাটিতে সবুজ সার মিশিয়ে ও সময় সময় জিপসাম ছড়ালে মাটি গ্রানুলার অবস্থায় আসে। লোনা জমিতে গভীর করে চাষ দিয়ে কোন ফল হয় না। কেবলমাত্র যদি জমিতে নীচের স্তরে জিপসাম থাকে তবে তার ফল পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

লোনামাটি পুনরুদ্ধার—আরাপাঁচ

(Methods of reclamation—Arapanch Sonerpur)

কলিকাতার পূর্ববর্তী অঞ্চল—কলিকাতার পূর্বদিকে প্রায় ১০০ বর্গ মাইলেরও বেশী জমি লবণ অধ্যুষিত অঞ্চল। ফলে সেখানে কোন ফসল হয় না। অনেকে ভেড়ি বেঁধে ঘিরে নিয়ে মাছের চাষ করেন। আবার নীচের দিকে সোনারপুর অঞ্চলে বড় বড় লম্বা ঘাস জন্মিয়ে সমস্ত জমি আবাদের অযোগ্য করে রেখেছিল। বর্ষায় জল জমে, গরমের দিনে অনেক জায়গায় জল শুকায় না একটু কমে যায় মাত্র। দিন দিন কলিকাতার আয়তন বাড়ছে। আজ দক্ষিণ কলিকাতা বাড়তে বাড়তে সোনারপুর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে কিন্তু পূর্বদিকে খাল পেরিয়ে আর যেতে পারছে না। এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ অপেক্ষাকৃত নীচু, বর্ষাকালে জল জমে। এ ভিন্ন ২।৩টি খালের সহযোগে কলিকাতা করপোরেশন শহরের ময়লা জল বিদ্যাধরী নদীতে নিয়ে ফেলছে। এইজন্য এতদিন এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ মনুষ্য বাসের অযোগ্য ছিল আর চাষবাসেরও অযোগ্য ছিল।

আজকাল এই জমি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার না করতে পারলেও আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই ভূ-ভাগ কেবলমাত্র উত্তম জমিতে পরিণত হবে না—চাষের উপযোগী করা হবে। এই কারণে মহিষবাথানের নিকটে একটা পোল্ডার ফার্ম করে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে।

হল্যাণ্ডে সমুদ্রের ধারে বাঁধ বেঁধে বহু জমি চাষবাসের উপযোগী করেছে। এই জমিগুলোকে বলা হয় Polder। আজ ২০০ বৎসরের উপর তারা সেখানে কেবলমাত্র চাষবাস করছে না সেখানে বাড়ী ঘর তৈরী করে

বাস করছে। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায় কয়েক বৎসর আগে যখন হল্যাণ্ডে যান তখন এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ও দেশের কার্যপদ্ধতি নিজের চোখে দেখে কলিকাতার পূর্ব দিককার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমি পুনরুদ্ধারের কথা আলোচনা করেন এবং ভারত সরকারের মাধ্যমে হল্যাণ্ড থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী নিয়ে এসে কাজ সুরু করে দিয়েছেন। কৃষ্ণপুর অঞ্চল ইতিমধ্যে লোকবসতির উপযুক্ত হযে গেছে। এ ভিন্ন গবেষণা সমানে চলেছে। গুজরাট অঞ্চলে যে সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোনা জমি আছে তারও উদ্ধারকার্য সমানে চলেছে। ইহা খুবই ব্যয সাপেক্ষ।

একদিকে যেমন গবেষণা চলছে অন্যদিকে সোনারপুর আরাপাঁচের পাশে জল নিষ্কাশনের যন্ত্র বসিযে লোনা জল দূরের নদী সহযোগে বার করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এতদিন যেখানে ভাল ফসল হযনি এখন সেখানে ফসল হচ্ছে এবং যে জমি পতিত ছিল আজ তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হযেছে।

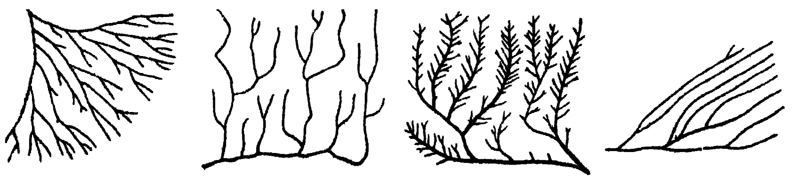
বসিরহাট মহকুমার প্রায সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল ও ক্যানিং অঞ্চল সুন্দরবনের অন্তর্গত। গঙ্গাতীরে ২৪ পরগণা জেলার সমুদ্রতীর পর্যন্ত ভূ-ভাগ চাষের ও বসবাসের যোগ্য হলেও পূর্বদিকে এখনও বহুজমি পতিত রয়ে গিয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে চাষ-আবাদ কেবলমাত্র শুরু হয়েছে।

এখানে চাষের জমির এক একটি বিস্তীর্ণ এলাকা উচু বাঁধ দিয়ে ঘিরে রাখা হয। একে চল্‌তি কথায বলা হয় ভেঁড়ি। এক একটি ভেঁড়ির মধ্যে অনেক জমি থাকে। গরমকালে কৈশিকাকর্ষণে জল মাটির উপরে আসে। উপরে আসবার সময় সমস্ত সোডিয়াম মিশ্রিত সহজদ্রব পদার্থ সহজে জলের সহিত মিশে উপরে আসে। উপরে আসার পর জলকণা উত্তাপের প্রভাবে বাষ্পতে পরিণত হয়—এবং লবণ জাতীয় পদার্থ মাটির উপরে রয়ে যায়। ফলে মাটির উপর সাদা স্তর দেখা যায়। এইগুলি ক্ষার জাতীয় পদার্থ। বর্ষাকালে জলের সঙ্গে মিশে এগুলি মাটির নীচে

চলে যায়। এই সময় প্রচুর বর্ষণের ফলে নদীর জলের লবণাক্ততা হ্রাস পায়। এই বৃষ্টির জল সমুদ্রের মধ্যে বেশীদূরে যেতে পারে না। কারণ দোটানা টানে তীর থেকে সমুদ্রের মধ্যে ৩।৪ মাইল যেতে না যেতে আবার জোযারে ফিরে আসে। জোযাবেব স্রোতে নদীপথে ভেঁড়ির ধার দিযে দেশেব মধ্যভাগে ঢুকে পড়ে। ফলে ভেঁডির মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগে জলের স্তব উপবে চলে আসে। তখন কিন্তু জলে বেশী লবণাক্ততা থাকে না ফলে এই সমযে কৃষক ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করে। একবার গাছ ভালভাবে মাটিতে শিকড গজাতে পারলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয না।

এইভাবে আমাদেব দেশে কোন কোন লোনা মাটিতে চাষ হযেছে। এব জন্য প্রয়োজন হযেছে ভেঁড়ি ও আকাশের বৃষ্টি। ঐ দুইটিব একটির অভাব হলে এখানে ফসল করা দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে ভেঁড়ি ভেঙ্গে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আবাদী জমিতে লোনা জল ঢুকে পড়ে ফলে বহু একর জমিব ফসল নষ্ট হযে যায।

যেখানে বৃষ্টি কম হয সেখানে বৃষ্টির ফলে মাটিতে ক্ষাবও কম ক্ষয হয। এরই ফলে সেখানে যে সমস্ত রাসাযনিক পদার্থের ক্ষয হয, সেগুলি ক্ষযে গেলেও সেখানকার মাটিতে কিছু পরিমাণে ক্ষারীয পদার্থ থেকে যায়। কেবলমাত্র এরই ফলে মাটিতে অম্লতার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে না। এর জন্য প্রযোজন জল



১ ২ ৩ ৪

বিভিন্ন প্রকারের জলনিকাশের নালী

চলাচলের নালা ও তা দিযে প্রচুর জল চলাচল। ক্ষার জাতীয় পদার্থ মাটিতে যেভাবেই আসুক না কেন গ্রীষ্মকালে মাটির উপরিভাগে একটি

সাদা মাটির স্তরের সৃষ্টি করে। এই সাদা পদার্থগুলিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলি সোডিয়াম (Na) পটাসিয়াম (K) ক্যালসিয়াম (Ca) ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড ও নাইট্রেট (মিশ্র পদার্থ)। অবশ্য এদের উপস্থিতির পরিমাণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে হয়ে থাকে। যেখানে মাটিতে এই স্তরের সৃষ্টি হয় সেখানে এই পদার্থগুলির একত্রে জমা ও ঘনীভূত হওয়ার ফলে ভাল ফসল হয় না। যদি সোডিয়াম ও পটাসিয়াম কার্বনেট ঘনীভূত হয় তবে সে মাটি কমবেশী কালো রঙের হয়। আর যদি কোন স্তরে ফসফেট ও ক্লোরাইড একত্রে ঘন সন্নিবিষ্ট হয় তবে সেই স্তর দেখতে সাদা হয়। এই জাতীয় মাটিতেও গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় না।

এক এক দেশের লোকেরা খুব গরম সহ্য করতে পারে আবার অনেক জায়গার লোকেরা খুব ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে যেমন এস্কিমোরা। আমরা গরম দেশের অধিবাসীরা যদি শীত প্রধান দেশে যাই তবে শীতে কষ্ট পাবো। এস্কিমোরাও আমাদের দেশে আসে তবে গরমে কষ্ট পাবে। সেই রকম এক জাতীয় গাছ আছে যারা ক্ষারযুক্ত মাটিতে (অর্থাৎ যেখানে মাটির pH ৭.৫ ইউনিটের উপর) ভালভাবে জন্মায়। আবার কতকগুলি গাছ আছে যারা আদৌ এই ক্ষারত্ব সহ্য করতে পারে না। আল্‌ফাআল্‌ফা, মিষ্ট ক্লোভার, জোয়ার ও বাজরা প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় শস্য, বার্লি, রাই, বীট, তুলাপ্রভৃতি সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতে (যেখানে pH ৭-৮ এর মধ্যে) ভাল জন্মাতে পারে। লোণা মাটিতে বাবলা গাছ ভালভাবে জন্মায়। এভিন্ন সুন্দরী, গর্জ্জন, নলখাগড়া, গোলপাতা ভালভাবে জন্মায়। গাছের এই লবণাক্ততা সহ্য করার শক্তি নির্ভর করে মাটিতে লবণ জাতীয় পদার্থের ঘনত্বের উপর এবং তাদের মাটির বিভিন্ন অংশে উপস্থিতির পরিমাণের উপর। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মাঠে যে সমস্ত মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় সেগুলি ১৫" ইঞ্চির নীচে যায় না। গেলেও তার পরিমাণ খুব কম। সুতরাং যদি

কোন পার্শ্বপ্রসারী শিকড় বিশিষ্ট ফসল এই মাটিতে করা যায় তবে তাতে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

মাটিতে লোনা এড়াবার উপায়—বাংলাদেশের দক্ষিণাংশে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ও অন্যান্য নীচু জমিতে সাদা স্তর পড়তে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালেই এর প্রাচুর্য হয়ে থাকে। তখন মাটির অম্লতা কমে গিয়ে pH প্রায় ৮ ইউনিট হ'যে যায়। তারপর বর্ষার তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি জলের সহিত মিশে মাটির নীচু স্তরে চলে যায়। এই চলে যাওয়ার উপর এই অঞ্চলের ধান্য ফসল হওয়া নির্ভর করে। যেবার কম বৃষ্টি হয় সেবার এগুলি মাটির তলদেশে যেতে পারে না বা ধুয়ে যেতে পারে না। তারফলে ফসল হ্রাস পায়। যে মাটিতে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম কার্বনেট জমে মাটিকে কালো করে রাখে সে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সালফার মিশিয়ে দিলে জমির অম্লতা বৃদ্ধি পায়। সালফার মাটির মধ্যে গিয়ে তীব্র সালফিউরিক এসিড তৈরী করে এবং জমির ক্ষারত্ব নষ্ট করে বিশেষ বিশেষ ফসলোৎপাদনের উপযোগী করে তোলে। ক্যালসিয়াম সালফেট দিয়েও মাটির অম্লতা বাড়ান যায়। এই সময়ে যে রাসায়নিক ক্রিয়া সংগঠিত হয় তাহা অতি সহজ।

ক্যালসিয়াম সালফেট + সোডিয়াম কার্বনেট =

সোডিয়াম সালফেট + ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলের সহযোগে জমি থেকে বার হয়ে যায়। জল যখন চুঁইয়ে মাটির তলায় যায় তখন তার সঙ্গে সহজে দ্রবণীয় সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও ক্লোরাইড অনায়াসে মাটির তলায় গিয়ে জমা হয়।

অনেক জায়গায় পর পর কয়েক বৎসর জল সেচনের পর দেখা যায় যে, সেখানে মাটিতে লোণার ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং সেই সময় যে সমস্ত জল মিশ্রিত ধাতব পদার্থ নীচে থাকে সেগুলি মাটির উপরিভাগে আসে। জলের সহিত এই ধাতব পদার্থগুলি মাটির উপরে আসে এবং জলীয়

পদার্থগুলি বাতাসে উবে গেলে মাটির উপরিভাগে শক্ত ধাতব পদার্থ জমে বসে যায়। সুতরাং মাটিতে জল থাকা-কালীন গাছ যতটা এই সমুদয় পদার্থ গ্রহণ করতে পারত জল মাটি থেকে উবে গেলে এইগুলির পরিমাণ বেড়ে যায় ও তাহা গাছের আর গ্রহণযোগ্য থাকে না। আবার মাটিতে পর্যাপ্ত জল পাওয়া গেলে এগুলি গাছের গ্রহণযোগ্য হয়। এই জন্য সবার আগে কৃষককে জানতে হবে কোন সময়ে কতটা জল সেচন করতে হবে। এ কথা খুবই নিশ্চিত যে অম্লমাটি থেকে ক্ষার বিশিষ্ট মাটি বহু সমস্যাপূর্ণ এবং একে শস্যোৎপাদনের উপযুক্ত করা একটী বিরাট সমস্যার ব্যাপার ও ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ।

ক্ষার মাটি—আর্দ্র অঞ্চলে মাটিতে যে সমস্ত ধাতব পদার্থ থাকে সেগুলি নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে বা জলের সহিত ক্রিয়া করে নূতন নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং এই পদার্থগুলি জলের সহযোগে মাটি থেকে বা মাঠ থেকে অন্যত্র চলে যায়। চলে যাওয়ার পর এরা সব সমুদ্রের জলের সহিত মিশে যায়। সমুদের জল ভীষণ লবণাক্ত। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন সমস্ত সমুদ্রের জলে যে লবণ আছে তা দিয়ে ভারতবর্ষের মত ৪টি দেশকে ১.৬ মাইল নীচে পর্যন্ত ঢেকে দিতে পারে। সমুদ্রের জলে ৩.৫% লবণ। এতে আছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান ধাতু ও ক্লোরিণ, সালফেট, কার্বনেট ও ব্রোমিণ জাতীয় মিশ্র অম্ল সৃষ্টি কারক পদার্থ। অবশ্য এদের মধ্যে সোডিয়াম প্রধান এবং এদের পরিমাণ সমস্ত ধাতব পদার্থের শতকরা ৩০·২৬ ভাগ আর অন্য পদার্থের মধ্যে ক্লোরিণ শতকরা ৫৫ ভাগ। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম জলে বাহিত হয়ে এসে সমুদ্রে পড়ে এবং তারা সমুদ্রের জলে তলানি পড়ে যায়। এই জন্যই সমুদ্রের তলদেশে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ান কার্বনেট জমা হয়ে আছে। আজ যে চুণামাটির ও ফসফেটের পাহাড় দেখা যাচ্ছে এরা একদিন সমুদ্রের তলায় ছিল তারপর কোন নৈসর্গিক প্রভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

প্রকৃতি—মাটির উপর থেকে ক্ষার জাতীয় পদার্থের হ্রাস হওযার সাথে সাথে মাটি ক্রমশঃ অম্লপূর্ণ হযে পড়ে। আর্দ্র অঞ্চলের মাটীতে সাধারণতঃ শতকরা ৮০ ভাগ সিলিকা, ৮ ভাগ এলুমিনাম অক্সাইড ও ১০ ভাগ লোহা ও অক্সিজেন মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ (F_2O_3) আর ১ ভাগ টাইটানিযাম অক্সাইড থাকে। আর বাকি অন্য সব পদার্থ মিশে থাকে ১% ভাগ। বাকি পদার্থের মধ্যে ০·১% ফসফরাস পেনটাঅক্সাইড (P_2O_5), সালফাব ডাযঅক্সাইড (SO_2) এবং শতকরা ৩ ভাগ কার্বন জাতীয পদার্থ। যদি আমরা কোন পাথরের ক্ষয লক্ষ্য করি তবে আমবা অনাযাসে জানতে পারি কিভাবে মাটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিযে বর্তমান এই অবস্থায এসে দাঁড়িযেছে।

সাধাবণ প্রাকৃতিক আবহাওযার উপব প্রাথমিক শিলার ক্ষয নির্ভর কবে। ল্যাটারাইট মাটিতে বেশী কেওলিনাইট জাতীয কাদা মাটি পাওযা যায। পডজল মাটিতে ইলাইট ও মণ্টমরিলোণাইট জাতীয কাদা মাটি পাওযা যায। অম্লতা ও প্রাকৃতিক আবহাওযা প্রাথমিক শিলাকে ক্ষয সাধনে সাহায্য করে। মাটিতে যে অম্লগুলি দেখতে পাওযা যায সেগুলি মৃত্তিকা সৃষ্টির দ্বিতীয পর্যাযে সৃষ্টি হয। এই সমযে সিলিকা বিভিন্ন বাসাযনিক পদার্থের মিশ্রণে বহুবিধ মিশ্র পদার্থ সৃষ্টি কবে। এই পদার্থের উপর মাটির অম্লতার পরিমাণ নির্ভর করে। এই সিলিকেটগুলি জলের সহিত সহজে দ্রবণীয নয। সুতরাং মাটির এই অম্লতা (acidity) মাটির একান্ত নিজস্ব (Potential)। আর্দ্র অঞ্চলে মাটির উপরিস্তরে ধাতব পদার্থের সমন্বয হয। মাটির মধ্যে যে সমস্ত অম্লজাতীয পদার্থ থাকে সেগুলি এদের সহিত মিশে যায় এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে, তরলীভূত বিভিন্ন পদার্থ মাটির নীচে চুঁইযে যায। এর ফলে মাটিতে যে কার্বনজাতীয পদার্থ থাকে সেগুলি পৃথক্ হয়ে পড়ে। এই সময়ে বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে আরও বেশী নাইট্রিক এসিড তৈরী হয় এবং মাটিতে অম্লতা মিশ্রিত জলীয় পদার্থ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মাটিতে অম্লতা বৃদ্ধির সাথে সাথে

মাটিতে যে সমস্ত লোহা ও এলুমিনাম মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ থাকে সেগুলি জলে দ্রবণীয় হয়ে' পড়ে। মাটির মধ্যেকার সলিউশনে এদের পরিমাণ দুই এক সময়ে এত বেশী হয় যখন গাছ আর এদেরকে টেনে নিতে পারে না (toxic)।

পীট—পীট মাটিতে হিউমিক এসিড বেশী থাকে। এভিন্ন অন্যান্য জৈব এসিডও দেখা যায়। যেমন বিউটারিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড ও এসেটিক এসিড। এইগুলি পীট মাটিতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ এই জাতীয় মাটিতে চাষ-আবাদ বেশী করলে এগুলি বৃদ্ধি পায়। চাষ করার ফলে অন্যান্য যে সমস্ত অজৈব এসিড (inorganic acid) থাকে সেগুলিও পরিমাণে বেড়ে যায়। হিউমিক এসিড জলে মিশে না। এই মাটিতে অন্যান্য মাটি অপেক্ষা নীচের স্তরের রাসায়নিক পদার্থগুলি বেশী পরিমাণে উপরে উঠে আসে।

মাটিতে অম্লতার পরিমাণ জেনে, ঠিক করা উচিত যে সেই মাটিতে কোন্ ফসল ভাল ফলবে। মাটির মধ্যে এই অম্লতা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ জলের সহিত ক্রিয়া করে হাইড্রোজেন নিষ্কাষণ করে। এটার পরিমাণ নিরূপন করে মাটির অম্লতার পরিমাণ নিরূপিত হয়। হাইড্রোজেনের মাপ pH ইউনিট-এ দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা বোঝা যায় যে ১ লিটার সলিউশানে কতটা হাইড্রোজেন আয়ন আছে এবং তার বিপরীত লগারিথম (Anti-logarithm) নিয়ে এই ইউনিট নিরূপিত হয়। সাধারণতঃ মাটিতে pH ইউনিট ৭, নিরপেক্ষ লাইন ধরা হয়। তারপর এক এক ইউনিটের জন্য অম্লতা ও ক্ষারত্ব ১০ গুণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। যদি কোন মাটির pH ইউনিট হয় ৬, তবে সেই মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০ গুণ অম্লতাপূর্ণ, pH ইউনিট ৫ হলে সেই মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০০ গুণ অম্লতা সম্পন্ন। কোন মাটির pH ইউনিট ৮ হলে সেই মাটি নিরপেক্ষ মাটি থেকে ১০ গুণ ক্ষারত্ব সম্পন্ন। সাধারণতঃ এক pH ইউনিটে ০.০০০০০০১ গ্রাম হাইড্রোজেন আয়ন থাকে।

pH ইউনিট ৭ থেকে যত সংখ্যা কমের দিকে যাবে মাটির তত অম্লতা বাড়বে আর সাত ইউনিটের থেকে যত উপরের দিকে যাবে তত ক্ষারত্ব বাড়বে। pH মাপবাব বিভিন্ন যন্ত্র আছে। আজকাল pH মিটার দিযে অম্লতা নিরূপন করা হয। এই যন্ত্র দিযে অম্লতা নিরূপনের সময তিনটি রিডিং নিযে আবার যন্ত্রটিকে ক্যালিব্রেট করা উচিত।

মাটির pH ইউনিট নির্ভব কবে মূলতঃ মাটিতে অবস্থিত কাদামাটির উপর ও মাটিতে অবস্থিত ক্যালসিযাম ও কার্বন জাতীয পদার্থেব উপস্থিতির পরিমাণের উপর। মাটিতে অম্লতার পরিমাণ বেশী থাকলে অম্লতার পবিমাণ কমাইবার প্রধান উপায় মাটিতে উপযুক্ত পবিমাণ পোড়া চুণামাটি গুঁড়া করে ছড়িযে দেওযা। ১০টি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বকমের মাটি নিযে পবীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাটির pH ইউনিট ৪·৫ থেকে ৫·৫ তুলতে এক একর জমিতে ৫৫০ পাউণ্ড থেকে ৭০০ পাউণ্ড পর্যন্ত পোড়া চুণ লেগে থাকে। কিন্তু পীট মাটিতে এই বেঞ্জের pH ইউনিট পরিবর্তন করতে গেলে আরও বেশী চুণামাটি লাগবে।

মাটিতে যত অম্লতা বাডবে ততই মাটি শস্যোৎপাদনেব প্রতিকূল হযে পড়বে। মাটিতে PH ইউনিট ৪·২ থেকে ৫·০ পর্যন্ত, মাটি বিশেষ অম্লতাপূর্ণ। এই মাটিকে অম্লমাটি বলতে পারা যায। ইহা শস্যোৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর। এমন কি যে সমস্ত ফসল ৫—৬ ইউনিটের মধ্যে ভাল হয সে ফসলগুলিও ভাল জন্মাবে না। মাটিতে এই উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হলো যে হাইড্রোজেন, লোহা, এলুমিনাম ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির সাহায্যে এমন কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি করবে যেগুলি গাছের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। এবই ফলে গাছ মরে যাবে। খুব সম্ভবতঃ এইরূপ মাটিতে নাইট্রোজেন ও কার্বন জাতীয পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে নাইট্রিক এসিড তৈরী করতে পাবে। অনেক সময জমিতে জল সেচনের ফলে মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পেতে পাবে। ক্ষার জাতীয সার মাটিতে দিলে অনেক সময়

অম্লতার হ্রাস হয়। কার্বণ জাতীয় পদার্থের যোগের ফলেও অনেক সময় বিভিন্ন প্রক্রিযার মাধ্যমে মাটিতে একটা স্থিতাবস্থা হয ও অম্লতা বৃদ্ধি হ্রাস পায। কতকগুলি ফসল আছে যারা অম্ল মৃত্তিকায ভাল গড়ে ওঠে, যেমন আলু, সোযাবিন, মিষ্টি আলু, ওট, রাই ইত্যাদি। খুবই সৌভাগ্যের কথা যে অম্লতা মাটিতে বেশীদিন স্থায়ী হয না। অম্লপদার্থগুলি জলের সহিত মিশে দূবে চলে যায কিংবা অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত মিশে কার্বনেট প্রস্তুত করে ও পবে অন্যান্য মিশ্র পদার্থ তৈবী করে।

এতদিন পর্যন্ত মাটির দাম ছিল মানুষের কাছে। মাটি নিযে কাড়াকাড়ি, আলি ঠেলাঠেলি, খুনোখুনি হযেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয যে রাজায় রাজায় কত কাটাকাটি কত না মারামারি হযেছে এই জমি নিযে। এর প্রধান কারণ মাটির উৎপন্ন ফসল। শূন্যে তো আর ফসল ফলে না! ফসল না পেলে মানুষ না খেযে মবে যাবে। মানুষ যত খাদ্যই প্রস্তুত করুক না কেন শস্যের প্রযোজন আছেই। গত যুদ্ধে জাপানীরা কেবলমাত্র একটি ভাতের পিণ্ড খেযে একটি দিন অনায়াসে কাটিযে দিযেছে। শরীরের কোন ক্ষতি তাদের হয নি। ডাক্তারেরা মানুষকে কেবলমাত্র ভিটামিন ট্যাবলেট খাইযে কতদিন বাঁচান যায তার চেষ্টা করছেন। এ সমস্ত উপায উদ্ভাবন করলেও এদের তৈবীব মূল পদার্থের জন্য মাটিব কাছে মানুষকে হাত পাততেই হবে।

কৃত্রিম ভূমি—কিন্তু সে দিন মাটির শেষ হযে আসছে। মাটির দেমাক বুঝি আর মানুষ সয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেমন করে কেবলমাত্র রাসাযনিক পদার্থ ও জলের সাহায্যে ফসল ফলান যায তার চেষ্টা চলছে। অনেকে জলের মাধ্যমে জলের ও রাসাযনিক সারের সহযোগে, আবার অনেকে কাঠের গুঁড়ার মাধ্যমে ফসলের চেষ্টা করছেন। কৃতকার্যও হয়েছেন।

নিম্নলিখিত পদার্থগুলি এই পরিমাণে থাকলে গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করা হবে। ১০ গ্যালন জলে—

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	০ পাউণ্ড ৯ আউন্স
ট্রিপলসুপার ফসফেট—(০-৭৮-০)	১ „ ৬ „
পটাসিযাম নাইট্রেট—(১৩-০-৪৪)	৯ „ ১২ „
ক্যালসিযাম সালফেট—(জিপসাম)	৬ „ ১০ „
এমোনিযাম সালফেট—(১০-০-০)	১ „ ৪ „

এ ভিন্ন মাটিতে যে অপ্রধান ধাতব পদার্থগুলি থাকে সেগুলিও ইহাতে অল্প পরিমাণ যোগ কবলে ভাল ফল পাওযা যায। লোহা ১ পি. পি. এম., তামা ০.০১ পি পি. এম, দস্তা ০.১ পি. পি. এম এবং ম্যাঙ্গানীজ ০.২৫ পি পি. এম. যোগ কবা উচিত।

কেবলমাত্র বালু, পাথরকুচি ও কাঠের গুঁড়াতে যদি গাছের সৃষ্টি করতে হয তবে গাছ দাঁড়িযে থাকে তাব ব্যবস্থা করতে হবে। একই সল্যুউশান বার বার ব্যবহৃত হতে পাবে। এটা থেকে কোন পদার্থ কমে গেলে পুনবায এতে বাসাযনিক পদার্থ যোগ কবে চালান যেতে পাবে। এই সল্যুউশানের pH ইউনিট ভাল কবে লক্ষ্য করা হয। কোন্ সমযে কোন্ ফসল ফলাতে হবে তার উপব সার যোগ কম বেশী হযে থাকে।

যখন কৃত্রিম উপাযে গাছের উৎপাদন করার চেষ্টা করা হয তখন বিশেষ সতর্কতা নেওযা উচিত। মাটির মধ্যে নানা পরিবর্তন সাধিত হয যার ফলে গাছের খাদ্য গ্রহণ সোজা হযে পড়ে। কিন্তু কৃত্রিম উপাযে ইহার ব্যতিক্রম হয়। মাটিতে জল পড়লে জল নীচু দিকে চলে যায। আবার গ্রীষ্মের সময় জল নীচের থেকে উপরে উঠে আসে। এর ফলে মাটিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ আছে তাদের ঘনত্ব সব সময একই থাকে না এবং একের সহিত অন্যের অনুপাতও সমান থাকে না। সুতরাং কৃষককে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে যে ক্ষেতে ফসল বেশী পেতে গেলে যে সমস্ত প্রক্রিযাগুলি

ভাল ভাবে করা উচিত সেগুলি যাহাতে করা হয় তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কৃষকের প্রধান কর্তব্য হবে যে মাটিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ জলের সহযোগে দ্রবণীয় হয়ে আছে সেগুলিকে ঠিক পথে ও যথাযথ-ভাবে চালিত করা। মাটিতে ঠিক মত ফসল উৎপাদন করতে গেলে দরকার মাটিতে উদ্ভিজ্জ সার প্রয়োগ, ঢাকনি ফসল (Cover crop), চুণ জাতীয় পদার্থের বিচার ও তার প্রযোগ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও চাষ আবাদের পদ্ধতির উপর।

মাটির মধ্যকার বিভিন্ন ধাতব পদার্থের অনুপাত জানা গেলে পদ্ধতিও নির্ণয় করা যায়। সাধারণতঃ এমোনিযাম সালফেট মাঠে যোগ করা হয় নাইট্রোজন বৃদ্ধির জন্য কিন্তু এই এমোনিযাম সালফেট অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সহিত ক্রিয়া করে। সুপারফসফেট মাটিতে প্রয়োগ করলে পাওয়া যায় ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও সালফার। এরা অনায়াসে মাটির সহিত মিশে যেতে পারে, তা ছাড়া মাটিতে যে লোহা ও এলুমিনাম মিশ্র পদার্থ থাকে তাদের তলানি পড়তে সাহায্য করে, তা ছাড়া মাটিতে চুণ দিলে, তাহাতে যে ম্যাগনেসিযাম থাকে তার ফলে মাটিতে ম্যাগনেসিয়াম বৃদ্ধি পায।

কেবলমাত্র উপরের স্তর আলোচনা করে মৃৎবিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হন নি তারা তার নীচের স্তরও বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেছেন। আর্দ্র অঞ্চলের নীচের স্তরের মাটি খুব আঁটসাঁট। সুতরাং যাহাতে মাটির নীচের স্তরের এই কঠিনতা নষ্ট করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত। মাটির নীচের স্তরে গাছ যতই শিকড় চালাতে পারবে গাছও ততই বৃদ্ধি পাবে ও সেথানকার মাটি তত ভাল ফসল উৎপাদন করবে।

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[জৈব রসায়ন]

প্রথম ভাগ

প্রথম খণ্ড

(নবম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

কৃষি জীববিদ্যা

Agricultural Biology

কৃষি জীববিদ্যা—এ পৃথিবীতে যে দিকে তাকাই সে দিকেই দেখা যায় বস্তুর সমারোহ। একের পরে এক, একের পিঠে এক। এই বস্তু নিয়েই পৃথিবী। আমাদের চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায় তাদের সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ কবা যায়। (১) যাদের প্রাণ আছে যেমন মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি। (২) আর যাদেব প্রাণ নেই যেমন জড পদার্থ।

কিন্তু প্রাণটা কি? এটা কি কেবলমাত্র অক্সিজেন। কারণ অক্সিজেন ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচতে পারে না। যুগেব পর যুগ মানুষ এই সমস্যা নিযে অনুসন্ধান করে চলেছে আজও করছে—পেযেছে সিদ্ধান্ত থেকে আর এক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এক কালের আবিষ্কার পববর্তী কালে অচল হযে পড়েছে।

এরিষ্টটল প্রথমে (৩৮৪—৩২২ খৃঃ পূঃ) বলেন যে মানুষ ও গাছ উভয়েরই প্রাণ আছে। কিন্তু তিনি তার এই দার্শনিক মতেব কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। কেউ বলেছেন জীবনটা রাতের মত জলন্ত। কেউ বলেছেন জীবনটা একটি শক্তিমাত্র (energy)। এই শক্তি কি জীবের কাজ করবার শক্তি মাত্র। যদি তাইই হয তবে প্রাণী দেহে শক্তি থাকতে পারে দুরকমে (১) লুপ্ত অর্থাৎ potential আর চলমান অর্থাৎ kinetic। যখন কোন প্রাণী বা যন্ত্র কর্মবিরত থাকে তখন যে শক্তি তারা আহরণ করে তাকে বলে potential শক্তি আর যখন কোন প্রাণী কাজ করে বা চলে বা কোন যন্ত্র চালু থাকে তখন বলা হয় তারা আহরণ করেছে kinetic energy.

কিন্তু জড় পদার্থ ও প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। জড় পদার্থ নড়তে চড়তে পারে না, অন্য কোন বহিরাগত শক্তি তাকে না সরালে সে যেমনি ছিল তেমনি থাকবে। কবে কোন দিন কোন সুদূর অতীতে পাথরখানা একখানে

স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল কেউ জানে না। শক্ত পাথর এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মধ্যে কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাহিরের নানাপ্রকার শক্তিতে এর ক্ষয় হলেও একে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। আরও দিনে দিনে ক্ষয় পেয়ে পেয়ে হয়ত লীন হয়ে যাবে নয়ত অন্য কোন বহিরাগত শক্তি এসে একে স্থানচ্যুত করে ফেলবে। কিন্তু সে বহিরাগত শক্তি। গাছের প্রাণ আছে গাছকে তো সরতে দেখা যায় না। আমাদের চাবিদিকে যে সমস্ত বিরাট বিরাট গাছ আছে তারা শিকড় দিয়ে মাটি আঁকড়ে রাখে। তার ফলে তাকে সরতে দেখা যায় না কিন্তু অনেক ছোট ছোট গাছ আছে যারা চলে। গাছের যখন নূতন কিশলয বার হয় যখন গাছেব ফুল ফোটে এও একরকম গাছের চলা। যে সমস্ত দেহে প্রাণ আছে অর্থাৎ প্রাণীরা যখন একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায তখন জলবায়ুর তারতম্য হেতু তাদের অস্বস্তি হয। যেমন আমরা গরম দেশের লোক আমরা যদি এস্কিমোদের দেশে যাই তবে আমাদেরকে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে। গাছপালারও সেইরূপ। যদি একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তিত করা যায় তবে তাদেরকে সেই নূতন জাযগায খাপ খাইযে নিতে সময় লাগবে। লজ্জাবতী লতার পাতায হাত দিলে পাতাগুলি গুটিযে যায়। এগুলি অস্বস্তির চিহ্ন। তৃতীয়তঃ প্রাণিরা চলে। চলার জন্য শক্তির প্রযোজন। খাদ্য থেকে প্রাণিরা সেই শক্তি আহরণ করে। প্রাণিবা খাদ্য গ্রহণ করে শক্তি পায় ও বৃদ্ধি পায়। এব ফলে প্রাণিদেহে অনবরত পরিবর্তন সাধিত হ'চ্ছে, গঠন হচ্ছে ও ক্ষয হচ্ছে। প্রাণির দেহের এই ক্ষয পূরণের জন্য খাদ্যের প্রযোজন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাণিদেহে দুটি ক্রিযা সমভাবে কাজ করে চলেছে। একটির দ্বারা ক্ষয় সাধন অন্যটির দ্বারা ক্ষয় পূরণ। জড় পদার্থে এ সবের কোন বালাই নেই। (৪) প্রাণী মাত্রেই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। এরা যে খাদ্য খায় সেগুলি দেহের মধ্যে গিয়ে অক্সিজেনের সহিত ক্রিয়া করে ফলে শক্তির অপচয ক্ষয়। জড় পদার্থ শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় না। (৫) প্রাণিরা শরীরের মধ্যকার

দূষিত পদার্থ মলমূত্রাকারে পরিত্যাগ করে। যে সমস্ত জল গাছের কাজে লাগে না গাছ সেই অব্যবহৃত জল পাতার উপরের ফুটা দিয়ে বার করে দেয়। জড় পদার্থের এসব কোন বালাই নেই। (৬) প্রাণিদের বৃদ্ধি আছে অর্থাৎ প্রাণিমাত্রেই বাড়ে কিন্তু জড় পদার্থের কোন বৃদ্ধি নাই। অনেক সময় বাহিরের ধুলাবালিতে আকৃতি বাড়লেও সে ধুলাবালি স্থায়ী হয না। (৭) প্রাণী মাত্রেই বংশরক্ষা করে যেমন কুকুর বিড়াল ইত্যাদি বৃদ্ধ হযে মরে যাওয়ার আগে কতকগুলি বাচ্চা রেখে যায। কিন্তু জড় পদার্থে এর কোন চিহ্নই পাওয়া যায না। (৮) প্রাণীমাত্রেরই জীবনকাল একবকম সীমাবদ্ধ থাকে। এইটাই তাদেব জীবনকাল কিন্তু জড় পদার্থের এরূপ কোন নিযম নাই।

মানুষ, পশু ও পক্ষী প্রাণী। কিন্তু মানুষ ও পশুপক্ষী যে ধরণের প্রাণী গাছপালা সে ধরণেব প্রাণী নয। তাছাড়া বৃক্ষ জগতের সভ্যসংখ্যা প্রাণী জগতের সভ্যসংখ্যা থেকে অনেক বেশী। বড বড় আকারের গাছের সঙ্গে বড় বড আকারের পশুপক্ষীর তফাৎ বেশ বোঝা যায। কিন্তু ছোট ছোট আকারের প্রাণী ও গাছের পার্থক্য বোঝা দুরূহ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা বলেন যে গাছের দেহে ক্লোরোফিল বা সবুজকণা আছে যার জন্য গাছের রঙ সবুজ। কিন্তু প্রাণিদেহে এর নিতান্ত অভাব। গাছ নিজের চেষ্টায খাদ্য তৈরী করে খায ও বেড়ে উঠে কিন্তু পশুপক্ষী পরের তৈরী খাদ্য খেয়ে বেড়ে উঠে। কিন্তু কতকগুলি বিষযে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি। উভযই জন্মায়—বেড়ে ওঠে, বংশ বৃদ্ধি করে ও মরে যায। এদের আবার বৈশাদৃশ্যও অনেক। গাছের দেহে যে কোষ থাকে তার চারিদিকে কোষাবযব আছে। কিন্তু মানুষ ও পশুপক্ষীর দেহে এমনটি নাই। উদ্ভিদের কোষের মধ্যে প্লাসটিড থাকে কিন্তু পশুপক্ষীর দেহে কোন প্লাসটিড থাকে না, উদ্ভিদের কোষের মধ্যে ফাঁকা স্থান আছে আর সেগুলি কোষরসে (cell sap) ভর্তি। প্রাণীদের এমনটি হয় না। যদিও ২।১ জায়গায় এমনি পাওয়া যায় তবু সাধারণতঃ তারা এমনটি নয়। এক স্থান

থেকে অন্য স্থানে প্রাণীদের যাবার গতি খুব বেশী কিন্তু গাছের খুব ধীর। অনেক ক্ষেত্রেও নাই বললেও অত্যুক্তি হবে না। গাছেরা শক্ত খাবার খেতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য ও পশুরা শক্ত খাবার খেতে পারে।

বাযোলজী বলতে সাধারণতঃ প্রাণীবিদ্যা বুঝায়। Bios = প্রাণ Logus = বিদ্যা। প্রাণিবিদ্যা ২ ভাগে বিভক্ত। (১) জীববিদ্যা ও (২) উদ্ভিদবিদ্যা। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে গাছের দেহতত্ত্ব, কোষতত্ত্ব, তাদের বৃদ্ধিও তাদের জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায তাকে বলে উদ্ভিদবিদ্যা। জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যাব মধ্যে কযেকটি বিষযে বেশ মিল আছে যেমন দেহতত্ত্ব (morphology), তাদের বাসস্থান (ecology), জন্মতত্ত্ব (embryology) প্রজনন বিদ্যা (genetics) ও বিভক্তিকরণ (classification)—উভয ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য।

পৃথিবীতে যে কত বকমের গাছ আছে তার ইযত্তা নেই। কারণ আফ্রিকার নিবিড অরণ্য ও ব্রাজিলের গহন বনে ঢুকে গাছের সংখ্যা নির্ণয করা ও পার্থক্য নিরূপণ করা এক রকম অসাধ্য। তবুও পৃথিবীতে আমাদের চারিপাশে যত রকমের গাছ আছে তাদের সবগুলিকে বিভিন্ন প্রক্রিযায বিভক্তিকরণ করা হযেছে।

গাছকে বাদ দিযে মানুষেব দিন চলা অসম্ভব। খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য আমরা মুখ্য ভাবে গাছের কাছে ঋণী। ভাতই খাই আর রুটিই (গম থেকে তৈরীই হোক, জোযার বাজরা বা ভুট্টা থেকে তৈরী হোক) হোক আমরা আমাদের খাদ্য সংগ্রহ করি গাছের কাছ থেকে। যে কাপড আমরা পরি সেটা তৈরী হয তুলা থেকে। গাছ বাতাস থেকে কার্বন ডায়অকসাইড বাষ্প টেনে নেয় ও পাতায খাদ্য প্রস্তুত করে। কার্বন ডাযঅকসাইড বাষ্প মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের পক্ষে ক্ষতিকর। মশলা, চা, কফি এ সব আমরা পাই গাছ থেকে, ঘর বাড়ী তৈরী করতে বা জানালা দরজা তৈরী করতে কাঠের প্রয়োজন। অনেক ঔষধ তৈরী হয় গাছের পাতা, শিকড বা বাকল থেকে। যে কয়লা না

হলে শুধু যে আমাদের রান্না খাওয়া হবে না তাই নয় আমাদের সমস্ত কল-কারখানা থেমে যাবে সেই কয়লাও পাওয়া যায় গাছ থেকে। পেট্রোলিয়াম, নানারকমের রঙ, রবার প্রভৃতি গাছের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। যারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, যারা আমাদের ভাত কাপড় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, যারা শীতে দিয়েছে বস্ত্র, বর্ষায় দিয়েছে ছাতা তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এদের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গোপালন প্রভৃতি বিদ্যাসমূহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

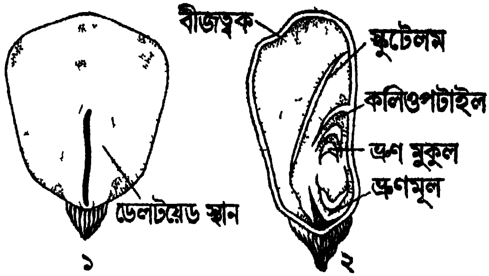
বীজ

(Seed and its germination)

বীজ থেকে চারা হয় আর সেই চারা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। কিন্তু বীজ এত শক্তি পায় কোথা থেকে। আর বীজ থেকে চারা বার হয় কেন? কারণ বীজের মধ্যে গাছ ঘুমিয়ে থাকে। উপযুক্ত আবহাওয়ায় সে ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে বীজ কোষ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। এই বীজের অন্তর্ভাগই হলো শিশু গাছের ঘুমাবার ঘর। গাছ বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির মধ্যে শিকড় চালিয়ে দেয় আর মাটির উপর গাছের কাণ্ড বেড়ে উঠে। গাছ যখন বীজ কোষ ভেঙ্গে পৃথিবীর মাটিতে আলোক দর্শন করে তখন তার মাটি থেকে খাবার সংগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকে না। তখন তার জন্য বীজপত্রে খাবার সংগ্রহ করে রাখা হয়। সেই খাবার খেয়ে গাছ প্রথমে মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে পায়। যদি বীজপত্র ভিন্ন অন্য কোথাও খাবার সংগ্রহ করে রাখা হয় তবে তাকে বলে শস্যজাতীয় (albuminous)।

ছোলা ও মটর—একটি মটর বীজ নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। মটর বীজ দেখতে অনেকটা গোলাকার। এই বীজের চারিদিক একটা পাৎলা আবরণে ঢাকা। একে বলা হয় বীজবহিত্বক (testa) আর ঠিক এরই নীচে খুব পাৎলা একটা স্তরের আবরণ আছে। একে বলে বীজ অন্তস্তক (tegmen)। বীজের আগায় বা বীজ যেখানে স্থুরু হয়েছে সেখানে একটা দাগ থাকে এটাকে বলে ডিম্বকনাভী (hilum)। ঠিক ডিম্বকনাভীর কাছে একটি ছোট ফুটা আছে একে বলে ডিম্বকরন্ধ্র (micropyle)। জলে ভিজিয়ে একটু চাপ দিলে এখান থেকে জল বেরিয়ে আসে। যখন

বহিরাবরণ ছাড়িযে ফেলা হয় তখন শাঁস (Kernel) বেরিযে আসে। যদি এই শাঁসে একটু চাপ দেওযা যায তবে বীজপত্র বার হয়ে আসবে। এদেব একটা আগা জোডা থাকে। এখান থেকে এর বৃদ্ধির সাথে সাথে এক অংশ মাটির নীচে চলে যায অপব অংশ মাটিব উপরে উঠে। কলাই জাতীয বীজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের এলবুমিন থাকে না।

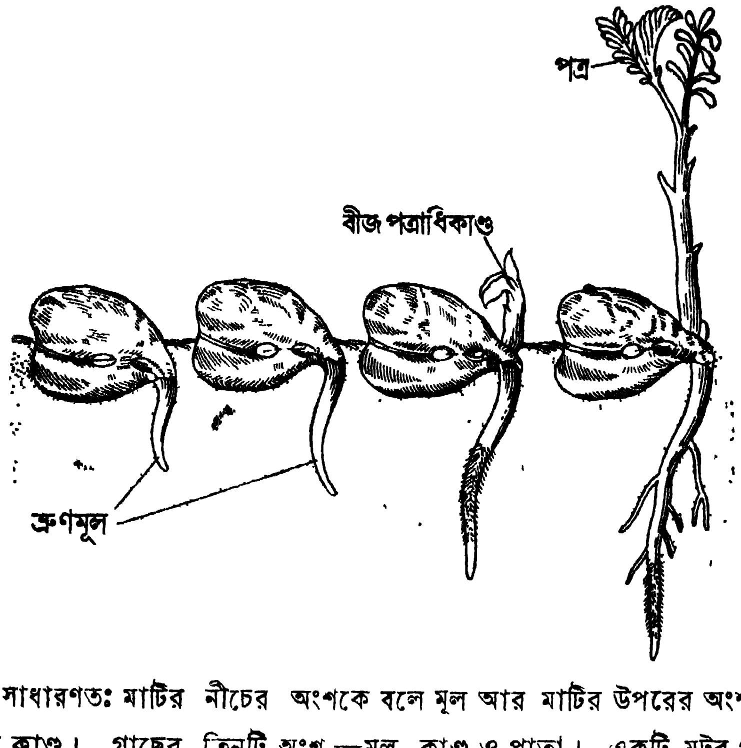


বীজপত্রে গাছেব খাদ্য জমা কবা থাকে। কিন্তু আর একরকমেব বীজ আছে যাদেব এলবুমিন থাকে। অর্থাৎ যাদেব বীজপত্রে খাদ্য জমা থাকে না।

রেড়ির বীজ—বহিবাবরণ খুব শক্ত। দেখতে লম্বা, বাহিরের খোলাটা ছাডালে দেখা যায—বীজেব বহিত্বকেব উপব চিত্রবিচিত্র করা। এর এক সীমান্তে বহিবাববণ একটু স্ফীত হযে উঠে। একে বলা হয ক্যারাঙ্কল (caruncle)। ক্যাবাঙ্কল এব নীচে শক্ত ধবণের একটা আবরণ থাকে এগুলি ঠিক বীজেব অন্তস্তক নয (tegmen), এগুলি নিউক্লিয়াসের ধ্বংসাবশেষ। এরও দুটি বীজপত্র থাকে। এক আগায এরা দুটি জোডা। এখান থেকে শিকড ও ডালপালা গজায।

মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম—একটি মটর বীজ মাটিতে পুঁতে দিলে কিম্বা চোষ কাগজেব উপর একটু জল দিযে কযেকটি মটব বীজ বেখে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে অঙ্কুরোদ্গম হতে দেখা যায়। প্রথমেই ভ্রূণ মূল বার হযে মাটির নীচের দিকে যেতে থাকে। উপর দিক থেকে বার হোক আর পাশের দিক থেকেই বার হোক—এটা নীচের দিকে মাটির মধ্যে যাবেই।

এইটা হোলো গাছের মূল বা শিকড় প্রধান ধর্ম। এর মূল শিকড় থেকে পাশের শিকড় বার হতে থাকে। বীজপত্র ছুটি মাটির উপরে উঠে আসে আর এর থেকে শিশুগাছ খাদ্য সংগ্রহ করে।



সাধারণতঃ মাটির নীচের অংশকে বলে মূল আর মাটির উপরের অংশকে বলে কাণ্ড। গাছের তিনটি অংশ,—মূল, কাণ্ড ও পাতা। একটি মটর গাছ তুলে এনে পরীক্ষা করলে দেখা যায়—প্রধান মূল সোজা চলে গিয়েছে আর এর থেকে বার হয়েছে সরু সরু শাখামূল। আরও একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই শিকড়ের অনেক জায়গায় গুটির মত ফুলে উঠেছে। এদের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি খালি চোখে দেখা যায় না, এমন বীজাণু থাকে। এই বীজাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে আনে। এই বীজাণু N_2 টেনে এনে খাবার তৈরী করে। এই সময়ে গাছের দেহ থেকে

শর্করা জাতীয় খাদ্য নিয়ে বীজাণু নিজে বাঁচে এবং প্রয়োজনানুযায়ী গাছকেও খাদ্য দেয়। যদি ভুট্টা কপি বা ওল গাছ তুলে এনে দেখা যায় তবে তাদের শিকড়ে এরকম কোন ফোলা বা গুটি দেখা যায় না। এদের কোন প্রধান শিকড় নেই।

যাদের দাঁত আছে তারা শক্ত বা আধা শক্ত জিনিষ খেতে পারে। কিন্তু যাদের দাঁত নেই তাদের পক্ষে আধা শক্ত জিনিষ খাওয়াও কষ্টকর শক্ত জিনিষের তো কথাই নেই। গাছের কোন দাঁত নেই। তবে শক্ত জিনিষকে গাছ অনেক সময় নরম করে ফেলে। মূল শিকড় থেকে একপ্রকার রস বার হয় আর সেই রস শক্ত জিনিষকে নরম করে ফেলে।

গাছের মাটির উপর যে অংশ তাকে বলা হয় কাণ্ড। মটর গাছ লম্বায় ৩' ফিট পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণতঃ ২' ফিট লম্বা হয়। মটর গাছের কাণ্ড নরম, দুর্বল এবং ফাঁপা। দেখতে সবুজ রঙের। বেশী লম্বা হলে গাছ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এর গাঁট থেকে পাতা বার হয়। দুই গাঁটের মাঝখানের পর্বমধ্য বেশ বিস্তৃত। প্রতি পাতার গোড়ায় থাকে একটি করে মুকুল।



মটর গাছ

বলা যেতে পারে মটর গাছ লতানো। কারণ এর কাণ্ড দুর্বল। মটর গাছের পাতা বিপরীত (alternate) দিকে বার হয়। যেখানে পাতা বার হয় তার সঙ্গে থাকে উপপত্র। পাতার তিনটি অংশ। গোড়া, বোঁটা ও ফলক। মটর গাছের পাতা যৌগিক। • গোড়ার চারিদিকে সাজানো আছে

অক্ষ ফলক, আর এটা বেড়ে সৃষ্টি হয়েছে আকর্ষক। প্রতি পাতার কোলে একটি করে মুকুল থাকলে তাকে বলে মৌলিক আর যখন অক্ষফলকে কেবল মুকুল থাকে তখন বলে যৌগিক।

মটর গাছে ফল ধরে শীতকালে। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে যখন একটু শীত কমে তখন ফুল ধরে। পাতার উপর একটি দণ্ডে কয়েকটি ফুল বার হয়। মটরের ফুল কেবলমাত্র সবৃন্তক নয় সম্পূর্ণ। এককথায় বলা যায় এতে ফুলের সব অংশই আছে। সাদা, লাল প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে আর এই দিয়ে কীট পতঙ্গ আকর্ষণ করে।

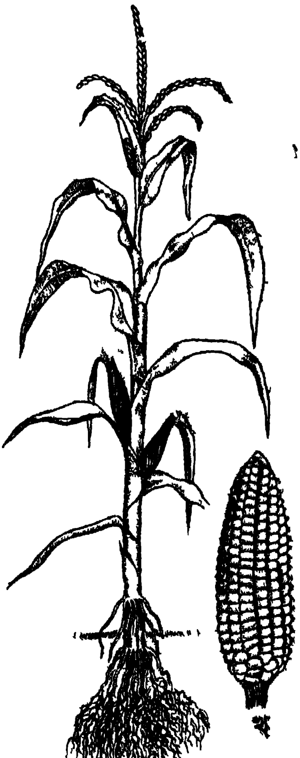
মটর ফুলের নীচে সবুজ রঙের চোঙের মত থাকে এর নাম বৃতি। এতে করাতের মত পাঁচটি অংশ আছে। এদের নাম বৃত্যংশ।

দল পাঁচটি। পরস্পর অসমান কিন্তু ফুলগুলি এমন ভাবে সাজানো দেখলে মনে হয় একটি প্রজাপতি। একটি পাপড়ি থাকবে বড়। কুঁড়ি অবস্থায় কুঁড়িটাকে ঢেকে রাখে। এর দুপাশে পাখির ডানার মত দুটি পাপড়ি আছে। আর ভিতরে আছে দুটি পাপড়ি মিলে একটা নৌকার মত।

মোট ১০টা পুংকেশর আছে। ৯টা এক সাথে জুড়ে থাকে আর একটা আলাদা থাকে। সরু সরু দণ্ডের মত আছে আর তার মাথায় আছে পরাগধানী। পুংকেশরের মাঝখানে আছে গর্ভকেশর। এর মাথায় আছে লোমশ এবং আটটি গর্ভমুণ্ড। গোড়ার অংশকে বলে গর্ভকোষ। আর মাঝের অংশ হলো গর্ভদণ্ড। কীট পতঙ্গের সাহায্যে পরাগ যোগ হয়। মটর ফুলে কীট পতঙ্গ ছাড়াও পরাগ যোগ সংঘটিত হতে পারে।

এ থেকে যে ফল হয় তাকে বলে মটরশুঁটি। এই মটরশুঁটি হলো ঐ মটর গাছের ফল। এই ফল মৌলিক ও শাঁসবিহীন। এর মাঝখানে ২।৪টি বীজ সাজানো থাকে। প্রথমে থাকে সবুজ তারপর আস্তে আস্তে হলদে হয়ে যেতে থাকে।

ভুট্টা (Zeamays) শস্য জাতীয় ফসলের প্রধান বীজ। অন্যান্য ঘাস জাতীয় ফসলের মত ভুট্টা একবীজপত্রী। একটি বীজ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করা যাক—দেখা যাবে যে, ঐ বীজের র‍্যাডিকেল প্রথমে বার হয়ে আসবে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্লুমিউল বার হবে। ধীরে ধীরে এই র‍্যাডিকেল কালে বীজ ভেদ করে, বীজত্বক ফাটিয়ে বাইরে আসবে এবং এইটাই মূলের আকাব নিয়ে মাটিব মধ্যে ঢুকে পড়বে। ঠিক প্রায সঙ্গে সঙ্গে এব থেকে সমস্ত কঠিন মূল (adventitious) বাব হয়ে আসতে সুরু করে। এই সমস্ত ঠেস মূলগুলি মূলকাণ্ডেব চারিদিকে ঘিরে থাকে এবং গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। এই সমস্ত ঠেস মূলগুলি বার হবাব এবং মাটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কববার পব মূল শিকড়েব বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায এবং অ স্তে আস্তে সে অংশ শুকিয়ে যায।



ভুট্টা গাছ

যখন এইভাবে বীজ থেকে মূল সৃষ্টি হতে থাকে তখন কোলিযপটাইলে ঢাকা প্লুমিউল থেকে গাছেব কাণ্ডের বৃদ্ধি সুরু হয়ে যায়। এইটা বেড়ে প্রায় ১" হয়ে যায় এবং এর থেকে পাতা বার হয়ে আসে। এর পরে বীজ থেকে মূল কাণ্ডের সুরু হয়। ভুট্টা একবীজপত্রী এবং এর অঙ্কুরোদ্গম হয একপাশ থেকে (hypogeal)। বীজ থেকে চারা বার হওয়ার পর বীজ ধীরে ধীরে নবম হয়ে আসতে থাকে। তারপর যখন সব খাদ্য শেষ হয়ে যায় এবং গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে

পারে তখন এই বীজ হলদে আকার ধারণ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে পেকে যায়।

ভুট্টা গাছ ১২'—১৫' লম্বা হতে পারে, কিন্তু কখনও এর ডালপালা থাকে না। কাণ্ড বেশ মোটা। অনেক সময় সরু আখের মত মোটা হয়। পর্ব ও পর্বমধ্য আছে। পর্বমধ্য ফাঁপা। পর্বগুলি যুক্ত ও শক্ত। পাতাগুলি লম্বা এবং প্রায়ই বাঁকা। পাতার দুটি অংশ—একটির নাম ফলক আর একটির নাম গোড়া। পর্ব থেকে এর বিকাশ। এরা বিপরীত। পাতার গোড়া কাণ্ড জড়িয়ে রাখে। পাতা লম্বা ও চ্যাপ্টা। উপশিরাগুলি মধ্যশিরার সঙ্গে সমন্তরালভাবে স্থাপিত। প্রত্যেক পাতার গোড়ায় একটি করে পত্রমূল থাকে (ligule)।

ভুট্টা গাছ—পুং স্ত্রী পুষ্প বহন করে। কিন্তু এই দুই রকমের ফুল দুটি বিভিন্ন স্পাইকলেটে থাকে আর এরা থাকে বিভিন্ন ফুলে। যেগুলি ষ্ট্যামিয়েট ফুল তারাও কাণ্ডের আগায় বেড়ে উঠে। আর প্যানিকেলে বহু স্পাইকলেট থাকে। প্রত্যেক স্পাইকলেটের গোড়ায় দুটি গ্লুম থাকে।

প্রতিটি গাছে ২।৩টি ভুট্টার কব পাওয়া যায়।

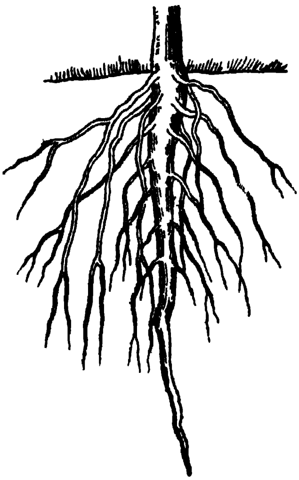
গাছের মুল ও তার কাজ (Roots modification and function)

মুল—গাছের অঙ্কুরোদ্গমের পর যে অংশ আলো বাতাস ত্যাগ করে মাটির নীচে জলের সন্ধানে ঘোরে তাকে বলা হয় মুল বা শিকড়। বীজ থেকে বার হয়ে আসে radicle, সেইটা বেড়ে মাটিতে ঢোকে আর শিকড়ে পরিণত হয়। শিকড়ের মাথায় থাকে ঢাকনি (root sheeth)। মাটি ভেদ করে শিকড়কে নীচে যেতে এই ঢাকনি সাহায্য করে। শিকড় যখন কোন শক্ত বা আধা শক্ত স্তরে ঢুকবে তখন যেন কোন আঘাত না লাগে। এই ঢাকনির মাথাটা একটু পুরু। এ ভিন্ন আঘাত আসতে পারে নানাদিক থেকে। আঘাত খেলে শিকড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একে রক্ষা করাই হলো শিকড়ের কাজ। এই ঢাকনির আগার অংশটি বেশ পিচ্ছিল যেন অনায়াসে মাটির

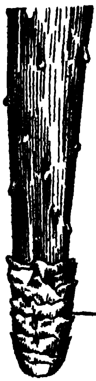
মধ্যে ঢুকতে পারে। মাটিব মধ্যেকার নানাপ্রকার বাসায়নিক প্রক্রিয়া ও শক্তির সংঘাতে এই ঢাকনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে একবার নষ্ট হলে পুনরায় বেড়ে উঠে।

অনুলোম—ঢাকনিব নীচে বহু সরু সরু ও ছোট ছোট লোমেব মত দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে বলা হয অনুলোম। অনেক জায়গায় খালি চোখে এদেরকে দেখা যায় না। কাবণ অনেক সময এবা একটিমাত্র কোষের সাহায্যে তৈবী থাকে। গম, সরিষা প্রভৃতি গাছেব অনুলোমগুলি খালি চোখে দেখা যায় না।

সাধারণ মূলের বিভিন্ন অংশ



প্রধান মূল



১। মূলাগ্রভাগ (Root cap)

২। বর্ধনশীল অঞ্চল (Growing part)

৩। মূল রোম (Root hairs)

৪। স্থায়ী অঞ্চল (Permanent zone)

১। মূলাগ্রভাগ (Root Cap Region)

মূলের আগায় টুপির মত ঢাকনি থাকে। একে বলা হয় মূলত্র। এর প্রধান কাজ মূলের আগাটিকে মাটিব ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করা। এর থেকে চট্‌চটে এক রকম রস নির্গত হয় ফলে মূল সহজে শক্ত মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে। যে সমস্ত উদ্ভিদ জলে ভাসে তাদেব অবশ্য মূলে কোন ঢাকনি থাকে না। আলগা ভাবে একটা ঢাকনি থাকে।

২। বর্দ্ধনশীল মূল (Growing region)



ঠিক মূলত্রেব নীচের অংশকে বলা হয় বর্দ্ধনশীল মূল। এই অংশে যে সমস্ত কোষ (Cell) থাকে তারা তাড়াতাড়ি বিভক্ত হতে পারে ও পরিবর্তিত হতে পাবে। এই অংশ বৃদ্ধি পায় কোষেব বিভাজন প্রভাবে। তাবপর সেই সমস্ত কোষ পরিবর্ধিত হয়।

৩। মূলরোম (Root hairs)

ঠিক বর্ধনশীল মূলের নীচে থাকে মূল রোম। এই অংশে বহু সরু সরু এককোষবিশিষ্ট সুতার মত দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় মূল রোম। এদের কাজ হলো মাটি থেকে জল এবং জলের মাধ্যমে গাছের খাদ্য মাটি থেকে টেনে নেওয়া। গাছকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও সাহায্য ইহারা করে। যেমন যেমন মূল বেড়ে যায় তেমন তেমন এই অংশে মূলরোমও গজায়।

৪। স্থায়ী অঞ্চল (Permanent region)।

এর পরই মূলের থাকে স্থায়ী অঞ্চল। মূলের কোষগুলি পরিণত অবস্থায় পরিণত হলে এখানে এসে-স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এখান থেকে গাছের শাখা বার হয।

মূলের সাধারণ কার্যাবলী (Roots and their functions)

১। শিকড়ের প্রধান এবং অবশ্য কর্তব্য মূল রোমের মাধ্যমে মাটি থেকে গাছের খাদ্য ও জল গ্রহণ কবা। মূলেব অন্য কোন অংশ এই কাজ করে না। কেবলমাত্র মূল রোমের সহায়তায় গাছ মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। অবশ্য জলজ গাছ তাব নিজের দেহের মাধ্যমে জল টেনে নেয। এ ভিন্ন দেখা যায প্রায সকল রকমেব গাছ শিকড়ে কিছু খাদ্য জমা করে রাখে।



২। গাছকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িযে থাকতে সাহায্য করে।

৩। গাছের নীচের অংশ যাতে অনাযাসে মাটির মধ্যে চলে যেতে পারে তার সাহায্য করে।

এ ভিন্ন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্য শিকড় দ্বারা সম্পন্ন হয়।

বিশেষ কার্যাবলী

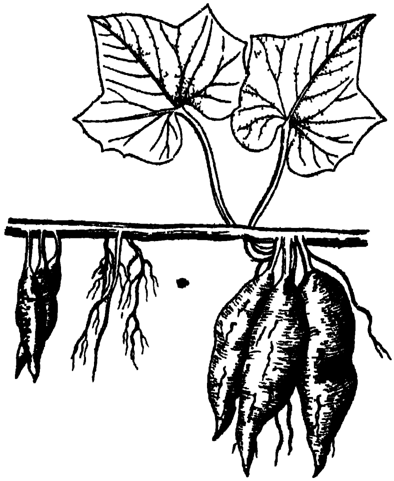
১। অনেক সময গাছকে ভালভাবে মাটিতে আটকে রাখার কাজ করে যেমন, কেয়া গাছের ঠেশ মূল। (Stilt root)

২। গাছের ডাল পালার ভার বয় যেমন, বটগাছের ঝুরি।

৩। অনেক লতানো গাছ আছে তাদের শিকড়ের সহাযতায কোন উঁচু স্থানে উঠতে পারে আরোহীমূল। যেমন লাউ, পানগাছ ইত্যাদি।



পান


রাঙ্গাআলু

৪। অনেক গাছ আছে যাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে মূল সাহায্য করে। এদেব মধ্যে রাঙ্গাআলু খাদ্য সঞ্চিত করে রাখে।

৫। যেখানে লোনা মাটিতে গাছ জন্মায সেখানে লোনামাটিতে শিকড চললেও শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা হয না। তখন তাদের শিকড থেকে শ্বাস মূল বার হয় ও মাটির উপরে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসেব সাহায্য করে। যেমন, সুন্দরী বৃক্ষ।

৬। অনেক গাছ আছে যাদের মূল বাতাসে ভাসে এবং বাতাস থেকে মূলের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে। বাযবীয মূল যেমন, অর্কিড।

৭। কতকগুলি গাছ আছে যারা মূলের সবুজ অংশের মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত করে যেমন, ইশের মূল।

৮। মূলের সাহায্যে বংশ রক্ষা করে যেমন, পটলের গেঁড়ি।

৯। অনেক গাছের শিকড় গোছা গোছা। যেমন সুপারী।

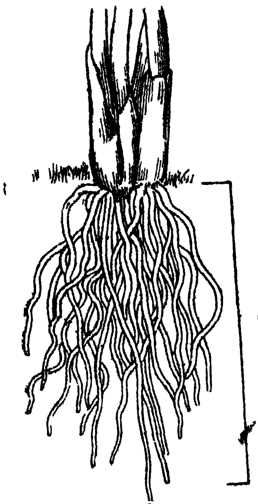
১০। কতকগুলি গাছের শিকড় জলে ভাসে যেমন শেওলা।



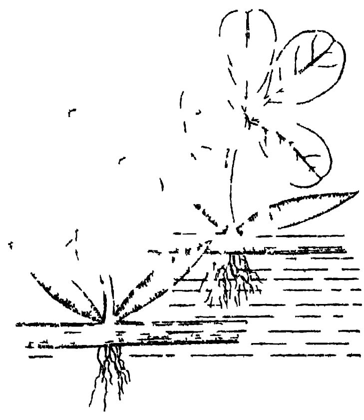


অভিশ্রবণ (Osmosis) গাছ শিকড়ের তথা মূল রোমের মাধ্যমে মাটি থেকে জলের সহায়তায় খাদ্য গ্রহণ করে। কেমন করে গাছ মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যদি একটি পাত্রের মাঝখানে আধা প্রবেশ্য কোন পর্দা বা আধা অভেদ্য (Semi permeable membrane) পর্দা রেখে যদি একটিতে জল অপরটিতে চিনির জল রাখা যায় তবে দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পরে যে অংশে কেবলমাত্র জল ছিল সে অংশের জলে একটু মিষ্টি জল ঢুকে পড়েছে। যদি দুইটি পাত্রে বিভিন্ন উচ্চতায় জলে রেখে কোন নল দিয়ে সংযোগ করা হয় তবে দেখা যাবে যে, যে পাত্রের জল উঁচুতে ছিল সে পাত্র থেকে জল নীচের পাত্রে চলে গেছে। কিম্বা যদি দুইটি ঢাকা পাত্রে বিভিন্ন চাপে বায়ু থাকে তবে তাদের সংযোগ হলে

উচ্চ চাপ বিশিষ্ট পাত্র থেকে বায়ু নিচু চাপ বিশিষ্ট পাত্রে ঢুকবে এবং দুইটার চাপ সমান করে দেবে। এই যে পদ্ধতি একে বলা হয় অভিশ্রবণ। গাছও এই পদ্ধতির দ্বারা মাটি থেকে জল টেনে নেয়। আর জলের মাধ্যমে বিবিধ খাদ্য জাতীয় পদার্থগুলি গাছের দেহেতে ঢুকে পড়ে।



মূল রোমের প্রধান কোষগুলি কোন জলের সাহায্যে ভর্তি থাকে। আর এই জলে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থাকায় এর ঘনত্ব একটু বেশী। ঠিক এর পাশেই থাকে সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজম একটি অভেদ্য পর্দার সৃষ্টি করে। মাটির মধ্যকার তরল পদার্থ বা জল ও কোষ মধ্যস্থিত জল সাইটোপ্লাজমের দ্বারা পৃথক করা থাকে। ফলে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় জল মাটির মধ্যকার মূল রোমে প্রবেশ করে। জল কেবল একেলা যায় না। যে সমস্ত সহজ দ্রব রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে থাকে তারাও জলের সঙ্গে মিশে গাছের দেহেতে প্রবেশ করে। পরে জলের সাহায্যে খাদ্য পাতায় নীত হয়। এর পরে ঠিক ঐ ভাবে কোষ হইতে কোষান্তরে চলতে থাকে। কারণ চাপের তারতম্য হলেই অভিশ্রবণ পদ্ধতিতে জল কোষ হতে কোষান্তরে নীত হবে।



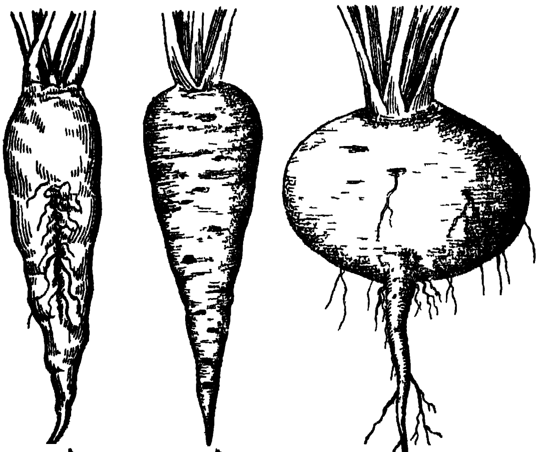
এক কোষ থেকে জল যখন অন্য কোষে ঢোকে তখন সেই কোষের

আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ফলে সাইটোপ্লাজমের উপর চাপ পড়ে। সাইটোপ্লাজম স্থিতিশীল, ফলে সেই চাপ সে কোষের মধ্যে ফিরিয়ে দেয় এবং এরই ফলে কোষের মধ্য থেকে জল বার হয়ে আসে। এই যে কোষের জল বার করার পদ্ধতি একে বলা হয় রসস্ফীতি চাপ বা turgidity pressure.

এইভাবে গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে।

মূলের বিশেষ কার্যসাধন

১। মূলের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার ফলে তাদের মূলস্ফীত হয়ে পড়ে। অনেক সময় এরা মোচার মত আকার নেয় তখন এদেরকে বলা হয় মোচাকৃতি (fusiform) ; যেমন মূলা।



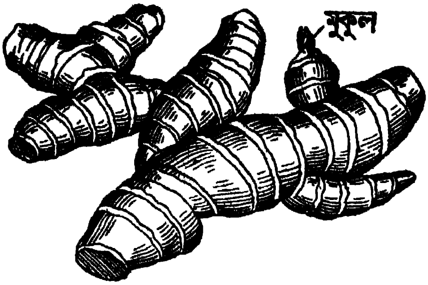
১ ২ ৩

২। কখনও কখনও খাদ্য বেশীর ভাগ উপরের অংশে জমা হয় এবং নীচের দিক ক্রমশঃ সরু হয়ে আসে তখন ইহাদিগকে বলে কোণাকৃতি আকার বা কনিক্যাল ; যেমন গাজর।

৩। অনেক সময় মূলে খাদ্য জমা হওয়ার ফলে প্রায় গোলকার হয়

তখন ইহাকে বলে শালগমাকার বা Napi form। এইগুলিকে বলা যেতে পারে সঞ্চয়ীমূল ; যেমন—শালগম।

এই সব ছাড়া একরকম মূল আছে যাহারা আবার খাদ্য সঞ্চযের ফলে



স্ফীত হযে পড়ে, যেমন আদা

কাণ্ড

(Stem, their modification & function)

গাছেব যে অংশ মাটিব উপব থাকে সাধাবণতঃ সেই অংশকে কাণ্ড বলে। এক কথায বলা যায মাটিব নীচেব মূল ভিন্ন উপবেব অংশগুলি অর্থাৎ পাতা, শাখা প্রশাখা কাণ্ডেব অন্তর্গত। শাখা মুকুল প্রভৃতি সাবা অংশ নিযে গাছেব কাণ্ড গঠিত।



শাখা বা প্রশাখাব যে অংশটি বেড়ে চলে তাকে বলা যায মুকুল। অনেক সময এই মুকুল পাতা দিযে ঢাকা থাকে। শাখার আগায যে মুকুল থাকে তাকে বলে অগ্র মুকুল। আর পাতার গোড়ায যে মুকুল থাকে তাকে বলে পার্শ্বমুকুল। সাধারণতঃ পাতার গোড়ায়

একটিমাত্র মুকুল থাকে, যদি একাধিক মুকুল থাকে তবে তাকে বলা যেতে পারে অস্থানিক মুকুল। আগার মুকুল দিয়ে গাছের বৃদ্ধি হয়। অনেক সময় দেখা যায় পাতার কোন কোন অংশে মুকুল বার হয় যেমন পাথর কুচির পাতা। অস্থানিক মুকুল তিন ভাগে বিভক্ত।

১। যে গাছের পাতা থেকে মুকুল বার হয় তাকে বলে পত্রাশ্রয়ী মুকুল; যেমন পাথরকুচি।

২। গাছের ডাঁটা কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে তার থেকে যে পাতা বার হয় তাকে বলে কাণ্ড মুকুল, যেমন গোলাপ।

৩। মূল বা শিকড় থেকে যে পাতা বার হয় তাকে বলা যায় মূলজ। এ ভিন্ন আছে প্রয়োজনানুযায়ী নানা প্রকার রূপান্তরিত মুকুল।

১। লতানো গাছকে উপরে উঠবার জন্য কোন শক্ত জিনিষের সাহায্য নিতে হয়, একে বলা হয় আকর্ষ। যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদি।

২। অনেক গাছের পাতার গোড়া থেকে ঝোলানো গোলাকার সঞ্চিত খাদ্য থাকে, পরিণত গাছ থেকে পড়ে নূতন গাছের সৃষ্টি করে।

এ ভিন্ন কাণ্ডে থাকে পর্ব ও পর্ব মধ্য। শাখা, প্রশাখা বা কাণ্ডে যেখান থেকে পাতা বার হয় তাকে বলে পর্ব আর দুই পর্বের মধ্যবর্তী স্থানকে বলে পর্বমধ্য।

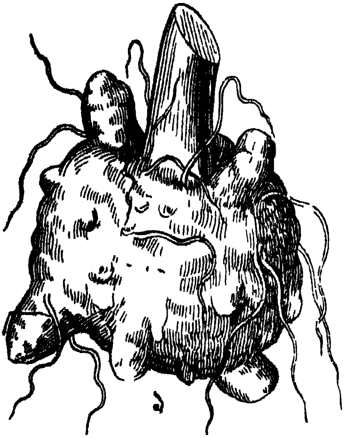
কাণ্ডের কার্যাবলী—ইহার প্রধান কাজ একস্থান থেকে অন্যস্থানে খাদ্য ও জলের চলাচলের সাহায্য করা এবং দেহের মধ্যে যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া হয় সেগুলিকে নিষ্পন্ন হতে সাহায্য করা।

ফল, মূল, পত্র প্রভৃতি ধারণ করে যান্ত্রিক কার্য সাধন করা। অর্থাৎ পাতা তার নিজস্ব কাজ করে এবং মূল ও তার নিজস্ব কাজ করে।

কাণ্ডের ভিতর যে সমস্ত টিস্যু (tissue) থাকে তাদের মাধ্যমে জল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে। গাছের খাদ্য প্রস্তুত হয়ে গেলে খাদ্য ফ্লোয়েমের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। এই প্রধান কাজ-

গুলি ছাড়াও কাণ্ড রূপান্তরিত হয় ও গাছের বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পন্ন করে।

কতকগুলি গাছ আছে তারা মাটিতে লতিয়ে চলে। পরে এই লতানো অংশের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নীচে চলে যায় এবং সেখানে একটা গাছ গড়ে উঠে, যেমন শুশনি শাক। পর্ব থেকে পাতা বার হয়ে নূতন গাছ হয় আর



১। ওল

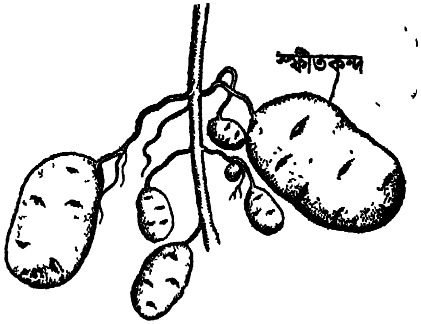


২। পেঁয়াজ

সেখান থেকে মূল নীচের দিকে চলে যায়। অবশ্য এখানে পর্ব মধ্য নষ্ট হয় না। আর এক জাতের দেখা যায় যাদের এই পর্ব মধ্য বেশ লম্বা। যেমন পানা বা টোকা শেওলা, কচুরিপানা। আর এক রকমের মুকুল দেখা যায় যারা শিকড়ের নিকট কাণ্ড থেকে বার হয়ে মাটির ভিতর দিকে সমান্তরাল ভাবে চলে এবং একটু সরে এসে মাটির উপর মাথা তোলে এবং নূতন গাছরূপে জন্মায়। যেমন পুদিনা, মুথা ইত্যাদি। একে বলা যায় ভূনিম্নস্থ গাছ (Sucker)।

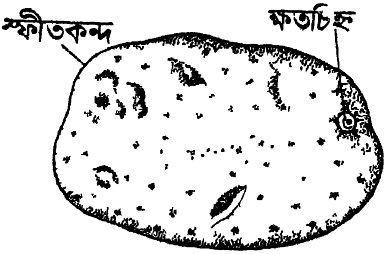
কতকগুলি গাছ আছে যাদের কাণ্ড মাটির নিচে বেড়ে খাদ্য সঞ্চিত করে রাখে। এগুলিকে বলা যেতে পারে ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। একপ্রকার কাণ্ড আছে যাদের খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার ফলে গোলাকার হয়। এর উপরে থাকে একটি অগ্রমুকুল, পাশে থাকে পার্শ্বমুকুল। এগুলোকে চলতি কথায় চোখ

বলে, যেমন ওল। আর এক রকমের আছে যাদের কাণ্ডের অংশ বিভক্ত হয়ে যায় এবং আগা ফুলে উঠে, যেমন আদা। অনেক সময় এই গ্রন্থিকাণ্ড সোজাসুজি মাটির মধ্যে থাকে।



স্থূল কাণ্ড—খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার ফলে গোলাকার হয়। এদের উপর ছোট ছোট শল্ক পত্র থাকে এবং একাধিক কাক্ষিক মূল থাকে। যেমন আলু। আলুর চোখ থাকে।

কন্দ—এই প্রকার মূল ছোট এবা দেখতে চেপ্টা। পর্বমধ্যগুলি কম লম্বা। রসাল, বেশ বড় শল্কপত্রগুলি কাণ্ডকে ঘিরে রাখে। এর থাকে কাক্ষিক মুকুল এবং অনুকুল আবহাওয়ায় এর থেকে নূতন গাছ দেখা যায়। এই চেপ্টা মুকুলের নীচের দিকে অস্থানিক মূল বার হয়। এইগুলিকে বলে বালব।



বালব দুরকমের—যেমন পেঁয়াজ। একটার পর আর একটা শল্কপত্রগুলি সাজানো, আর এক রকমের আছে যাদের সজানো নয় যেমন লিলি।

বায়বীয় কাণ্ড—বাতাসে ভাসে এমন অনেক গাছ আছে।

শাখা কণ্ঠক—গাছের কাক্ষিক মূল কাঁটার আকার নেয় তাকে বলে শাখা কণ্টক, যেমন বেল, দুরন্তা ইত্যাদি।

আকর্ষ—কখনও কখনও বাযবীয মূল আকর্ষে পরিণত হয। যেমন ঝুমকালতা।

পর্ণকাণ্ড—অনেক সময় পাতার মত চ্যাপ্টা হয ও পাতার কাজ করে।

এই রকম রূপান্তরিত কাণ্ডকে পর্ণ কাণ্ড বলে। যেমন ফণিমনসা। এই সব চ্যাপ্টা কাণ্ডের উপর ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে আর সেখানে থাকে কাঁটা। এই কাঁটাগুলিকে বলে পর্ণ কণ্টক (spine)।

শাখা কি ?—মূল কাণ্ড থেকে কাণ্ডের সদৃশ, কাণ্ডের আগা থেকে বা পাশ থেকে বার হয় সেগুলিকে বলে শাখা আবার শাখা থেকে এমনি করে প্রশাখা বার হয়। গাছের উপর এই শাখা ও প্রশাখা একটা নির্দিষ্ট পন্থায় বৃদ্ধি পায। এই পদ্ধতিকে বলা হয শাখাবিন্যাস। শাখাবিন্যাসের আকারের উপর নির্ভর করে তাদের নামকরণ হয।

১। যে পত্রাকারের আকার ডাইনে বা বামে পর্যাযক্রমে বিপরীত দিকে বাডতে থাকে তাকে বলে বৃশ্চিকাকার। যেমন মারকেনস্কিয়া।

২। যে পদ্ধতিতে জোরালো প্রশাখা গোলাকাব আকাব নেয তাকে বলে গুণ্ডাকার, যেমন অশোক।

পাশ থেকে যে শাখা বার হয় সেটা দুরকমের—

১। নিয়ত, যখন কোন কাণ্ডেব অগ্রভাগের বৃদ্ধি বন্ধ হয তখন ঠিক তার নীচের থেকে পার্শ্বমুকুল বড় হযে শাখার আকার নেয়। এর থেকে এক বা একাধিক শাখা বৃদ্ধি পেতে পারে।

যখন ঠিক এর নীচের থেকে দুই দিকে শাখা বার হয় তখন বলে দ্বিপার্শীয় শাখাবিন্যাস, যেমন কৃষ্ণকলি।

আবার যখন কেবলমাত্র একপাশে শাখাবিন্যাস হয় তখন একে বলা হয—একপার্শ্বীয় শাখাবিন্যাস, যেমন হাড়জোড়া, অশোক ইত্যাদি।

যখন সকল দিকে শাখা বার হয় তখন একে বলে বহু পার্শ্বীয়। যেমন ক্রোটন, করবী।

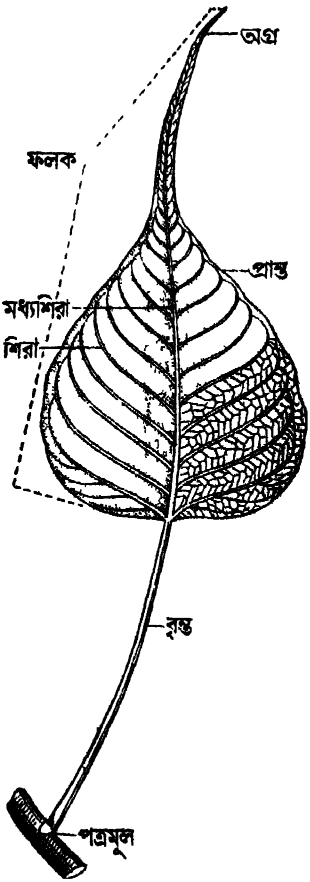
কাণ্ডের পর্ব থেকে যে হরিৎ বর্ণের সাধারণতঃ চ্যাপ্টা যে অঙ্গ উৎপন্ন হয় তাকে বলে পাতা বা পর্ণ। পাতা ছোট থেকে বেড়ে বড় হয়। নির্দিষ্ট সীমারেখায় এসে এর বৃদ্ধির সমাপ্তি হয়।

একটি সাধারণ পাতার তিনটি অংশ।

১। ফলক—পাতার চ্যাপ্টা, পাৎলা অংশকে ফলক বলে।

২। বৃন্ত বা বোঁটা—পর্ব থেকে পাতার ফলক পর্যন্ত বিস্তৃত যে সরু ডাঁটার মত অংশ, যেটা কাণ্ডে ফলক যুক্ত করে রাখে তাকে বলে বৃন্ত।

৩। পত্র মুল—যেখানে পত্র বৃন্ত গাছের কাণ্ডের সহিত যুক্ত থাকে তাকে বলে পত্রমূল।



সব পাতায় যে তিনটী অংশই থাকতে হবে এমন নয়। এর মধ্যে কোনটির অভাব হলে তাকে বলা হয় রূপান্তরিত পত্র (modified)। পাতার শীর্ষবিন্দুকে বলে পত্রাগ্র। আর কিনারাকে বলে প্রান্ত। ফলকের মাঝখানে বৃন্তের শেষ বিন্দু থেকে আগা পর্যন্ত বিস্তৃত রেখাকে বলে মধ্যশিরা আর এর থেকে বার হয়ে প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শিরাকে বলে উপশিরা।

পাতার কাজ ও আকারের উপর নির্ভর করে, পাতাকে নিম্নলিখিত অংশে ভাগ করা যায়।

১। পল্লব—শাখার পর্ব হতে চ্যাপ্টা হরিৎ বর্ণের যে পত্র বার হয় তাকে বলে পল্লব। এই পাতায় গাছের খাদ্য তৈরী হয়।

২। শল্কপত্র (scale leaf)—কাণ্ডের পর্ব পিঙ্গল বর্ণের আঁইশের মত যে পাতা উৎপন্ন হয় তাকে বলে শল্ক পত্র। আদা আর হলুদে খুব সরু বা পাৎলা হয়। পেঁয়াজ বা রসুনে এগুলি হয় একটু রসাল।

বীজপত্র—বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের সাথে সাথে প্রথম যে দুটি পাতা দেখা যায় তাকে বলে বীজপত্র। কোন কোন গাছের থাকে দুটি কোন কোন গাছের থাকে একটি।

মঞ্জরী পত্র—যে পাতা থেকে ফুল বার হয তাকে বলা যায় মঞ্জরীপত্র।

পুষ্পপত্র—ফুলের পাপড়ি এক রকমের পাতা ভিন্ন আর কিছু নয। এর অনেকগুলি ভাগ আছে। পুষ্প দল (Sepal), পাপড়ি (Petal), পুংকেশর (Stamen), গর্ভপত্র (carpel)।

পাতার থাকে পত্রমূল। কাণ্ড বা শাখা প্রশাখা থেকে যেখানে পাতা বার হয সেখানে থাকে পত্রমূল। কোন পাতার পত্রমূল থাকে, কোন কোন পাতার পত্রমুল থাকে না। কোন কোন পাতার মূলভাগ স্ফীত হযে উঠে তাকে বলে উপাধান যেমন কলা, ঘাস, নারিকেল, ইত্যাদি গাছের পাতা কাণ্ড ঘিরে থাকে, একে বলে কাণ্ড বেষ্টক (sheathing)। এই পত্র বেষ্টক বিন্দু থেকে কতকগুলি কাঁটার মত বার হয একে বলে জিহ্ব সূত্র (Ligule) সাধারণতঃ দ্বিবীজপত্রী গাছের পত্রমূলে খুব ছোট ছোট পাতার মত থাকে এগুলিকে বলা হয উপপত্র (stipule)।

উপপত্র আবাব নানা বকমেব হযে থাকে।

(ক) পত্রমূলেব দুই পাশে ঈষৎ হলদে বঙের উপপত্র দেখা যায। যেমন জবা, তুলা ইত্যাদি।

(খ) যখন দুইটি উপপত্র পত্রমূল থেকে বাব হযে দুটা ডানার মত দুই দিকে বার হয় তাকে বলা হয বৃন্তলগ্ন উপপত্র। যেমন গোলাপ।

(গ) যখন দুটি উপপত্র একই বিন্দু থেকে উৎপন্ন হযে দুই বিপরীত দিকে যায তখন একে বলে প্রতিমুখ (opposite)। যেমন কদম, রঙ্গন ইত্যাদি।

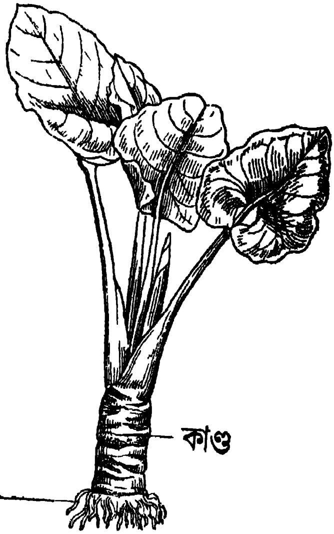
(ঘ) যখন কোন পাতার উপপত্র সংযুক্ত হযে বৃন্তের কক্ষে অবস্থিত হয তাকে বলে কাক্ষিক (intrapetiolar) গন্ধরাজ।

(ঙ) একটি পাতার দুটি উপপত্র যখন সম্পূর্ণরূপে ঘিরে রাখে তখন তাকে বলা যায় কাণ্ড বেষ্টক যেমন, টকপালং, পানিমরিচ ইত্যাদি।

(চ) যখন দুটি উপপত্র একত্রিত হয়ে পল্লবের আকার নেয়, তখন একে বলা হয় পল্লবাকার। যেমন মটর, খেঁসারি ইত্যাদি।

উপপত্রেরও রূপান্তর হয়, তখন তাকে আর উপপত্র বলে চেনা দায় হয়।





(ক) উপপত্র যখন আকর্ষের আকাব নেয তখন একে বলা হয আকর্ষী উপপত্র। যেমন কুমারিকা।

(খ) কণ্টক—অনেক সময় কাঁটাব আকার নেয়, যেমন কুল, বাবলা।

অনেক গাছের পাতার পর্ণবৃন্ত (Petiole) থাকে, অনেকের আবার থাকে না। যাদের পর্ণবৃন্ত থাকে তাদেরকে বলে সবৃন্তক পত্র আর যাদের নেই তাদেরকে বলে অবৃন্তক পত্র। যেমন শিয়াল কাঁটা।

বৃন্ত আবার নানা আকারের হতে পারে। যে সমস্ত গাছের পাতা পায়নার আকার নেয় তাদেরকে বলে সূক্ষ্ল বৃন্ত, যেমন কমলালেবু।

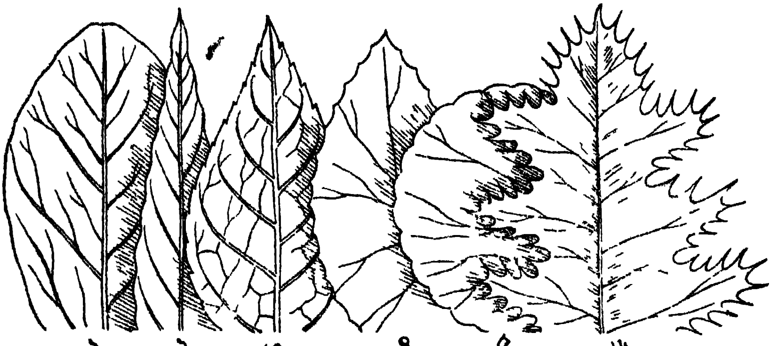
অনেকের বৃন্ত ফুলে উঠে তাকে বলে স্ফীত বৃন্ত। যেমন কচুরিপানা। অনেকের আবার আকর্ষের আকার হয় তাকে বলে আকর্ষী বৃন্ত, যেমন ছাগলবাটি।

অনেক গাছে আবার ফলক থাকে না ছোটবেলায়ই ঝরে পড়ে। সেই-সব গাছের পর্ণবৃন্ত চ্যাপ্টা আকার নেয়, যেমন আকাশমনি।

পাতার ফলক নানা আকারের হতে পারে।

কোন গাছের পাতা সূচাল তাকে বলে সূচ্যাকার, যেমন পাইন। কোন পাতার ফলক যখন সরু লম্বা হয় তখন তাকে বলে রেখাকার, যেমন রজনীগন্ধা।

যখন ফলক দেখতে বল্লমের মত হয় তখন তাকে বলে বল্লমাকার, যেমন



দেবদারু। যখন ফলক লম্বা ও সমান্তরাল হয় তখন তাকে বলে আয়ত, যেমন কলাগাছ। যখন কোন পাতার নীচের অংশ চওড়া ও উপরের অংশ সরু হয় তখন তাকে বলে ডিম্বাকার, যেমন জবা পাতা ও বটপাতা।

কোন পাতা পান পাতার মত দেখতে হলে তাকে বলে পানপত্রী যেমন পান, ওলপত্র ইত্যাদি। মানুষের কিডনীর মত আকার হলে তাকে বলা বৃক্কাকার। দেখতে তীরের আগার মত হলে তাকে বলে মাসক পত্রাকার, যেমন কচু। গোলকার হলে তাকে বলে মণ্ডলাকার যেমন পদ্ম।

ফলকের কিনারা নানা আকারের হতে পারে।

(১) কিনারায় যাদের কোন খাঁজ থাকে না তাকে বলা হয় অখণ্ড যেমন আম, জাম ইত্যাদি।

(২) যার কিনারা ঢেউ খেলানো হয় তাকে বলে তরঙ্গায়িত যেমন দেবদারু।

(৩) অনেকের কিনারা করাতের দাঁতের মত হয় তখন তাকে বলে ক্রকচ (seriated) যেমন গোলাপ ইত্যাদি।

(৪) অনেকের কিনারা দাঁতের মত দেখতে হয় এবং বাহিরের দিকে সাজানো থাকে তাকে বলে দন্তুর।

পাতা মূলতঃ দুরকমের, একক পত্র ও যৌগিক পত্র।

যখন কোন পাতা একটি সম্পূর্ণ অথচ খণ্ডিত ফলক দ্বারা গঠিত হয় তখন একে বলা হয় একক পত্র যেমন আম, জাম, ইত্যাদি।

যদি কোন পাতার ফলকের সীমা ভগ্ন হয়ে মধ্য শিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তবে তাকে বলে যৌগিক পত্র। অনেক সময় এই ক্ষুদ্র অংশ পত্রাংশের (leaflet) আকার নেয়। যেমন তেঁতুল, অপরাজিতা ইত্যাদি।

এ ছিন্ন আছে—

পক্ষবৎ খণ্ডিত—যে পাতার ফলক মধ্যশিরা পর্যন্ত কাটা তাকে বলে পক্ষবৎ খণ্ডিত যেমন চন্দ্রমল্লিকা।

পক্ষবৎ উপখণ্ডিত—কোন পাতা আবার এর থেকে কম খণ্ডিত থাকে তাকে বলে পক্ষবৎ উপখণ্ডিত, যেমন সর্ষে।

পক্ষবৎ অবিখণ্ডিত—যখন ফলক মধ্যশিরা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তাকে বলে পক্ষবৎ উপখণ্ডিত, যেমন গাঁদা।

অনেকের পাতা হাতের তালুর মত দেখতে তাকে বলে করলাকার খণ্ডিত, যেমন ঢেঁড়স ইত্যাদি।

অনেক পাতার ফলক মাঝখানের আগেই বেঁকে যায় তখন তাকে বলে করতলাকার উপখণ্ডিত, যেমন উচ্ছে, করলা।

করতলাকার অবিখণ্ডিত—যে পাতার আকার করতলবৎ এবং তার ফলক বেঁকে মধ্য শিরা পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে বলে করতলাকার অবিখণ্ডিত, যেমন বেলপাতা।

যৌগিক পত্র দুরকমের। পক্ষল ও করতলাকার।

যে সমস্ত যৌগিক পত্রের আগায় একটি পত্রক থাকে তখন একে বলে সচূড় পক্ষল (Imparipinate), যেমন নিম, গোলাপ ইত্যাদি। যখন মধ্য শিরার দুই পাশে দুটি পত্রক থাকে তখন একে বলে অচূড় পক্ষল। তেঁতুল, কালকাসুন্দা ইত্যাদি।

যৌগিক পত্রের মত করতলাকার পত্রেরও ভাগ করা যায়। যখন পাতার মূলে একটীমাত্র ফলক থাক তখন একে বলে একক ফলক, যেমন কমলালেবু।

(৪) অনেক সময় অনেক পাতায় দুটি পত্রক থাকে তাকে বলে দ্বিফলক যৌগপত্র, যেমন হিঙ্গন। তিনটি ফলক থাকলে ত্রিফলক পত্র এবং চারটি ফলক থাকলে চতুর্ফলক যৌগপত্র বলা হয়। ত্রিফলক আমরুল আর চতুর্ফলক শুষনি।

(৫) করতলাকার যৌগিক পত্রের পাতার আগা অনেক সময় ৪টির বেশী থাকে তখন তাকে বলা হয় অঙ্গুলাকার, যেমন ছাতিম, শিমূল।

পাতার অগ্রভাগের আকার অনুযায়ী পাতা ভাগ করা যায়।

(১) যখন ফলকের আগা সরু না হয়ে চওড়া হয় যেমন বট, কাঁঠাল ইত্যাদি।

(২) ফলকের আগা সরু অথচ লম্বা নয় তাকে বলে সূক্ষ্মাগ্র যেমন আম, জবা।

(৩) তীক্ষ্মাগ্র—যখন পাতার ফলকের অগ্রভাগ সরু ও লম্বাকার হয় তখন একে বলা যায় তীক্ষ্মাগ্র, যেমন অশ্বথ ইত্যাদি।

(৪) অনেক সময় পাতার আগা থাকে খাঁজ কাটা, যেমন কাঞ্চন।

পাতার মধ্যে অনেক শিরা ও উপশিরা। এদেরও একটা বিন্যাস আছে। তাকে বলা হয় শিরা বিন্যাস। সাধারণতঃ মধ্য শিরা পাতার মাঝখান দিয়ে ফলকের আগা পর্যন্ত চলে যায়।

পাতার মধ্য শিরা দিয়ে উপশিবা বার হয। আর এদের মাঝখান থেকে বহু উপশিরা বাব হয়ে জালেব মত আকাব নেয। একে বলা যায একশিরাল জালিকা বিন্যাস।

অনেক সময এই শিবা বিন্যাস পাখীর পাখনার মত দেখায তখন একে বলে পক্ষশিবা জালিকা পত্র। অনেক সময আবাব মূল শিরা পবপর বিভক্ত হয়ে একটা জালেব সৃষ্টি কবে একে বলে বহুশিবাল জালিকা বিন্যাস।

মূলতঃ জালিকা বিন্যাস দুই বকমের। অভিসাবী ও অপসারী।

অভিসাবী (Convergent)। যখন মূল শিরাগুলি পত্রমূল থেকে বাব হযে কিনাবার দিকে অগ্রসর হযে তাবপব পত্র ফলকেব শীর্ষদেশে এসে মিলিত হয তাকে বলা হয অভিসাবী জালিকা বিন্যাস যেমন কুল, তেজপাতা ইত্যাদি। অপসারী (divergent) ফলকখাঁজকাটা। তার মাঝখান থেকে শিরাগুলি বার হযে পাতাব গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত, যেমন কুমডা, লাউ ইত্যাদি। অনেক সময দেখা যায উপশিবাগুলি সমান্তরাল-াবে মধ্য শিরা থেকে বার হযে পাতাব ফলক পর্যন্ত বিস্তৃত এগুলোকে সমান্তবাল শিরাবিন্যাস বলা হয়, যেমন কলা।

অনেক গাছেব পাতার শিরাগুলি এক বিন্দু থেকে বাব হযে ফলকের আগায এসে শেষ হয একে বলা হয অভিসারী সমান্তরাল শিরাবিন্যাস। যেমন বাঁশ পাতা, ঘাস, ভুট্টা ইত্যাদি।

অপসারী শিবাবিন্যাসে পাতার গোড়া অর্থাৎ বোঁটার গোড়া থেকে শিরাগুলি তৈরী হযে ক্রমশঃ ফাঁক হয়ে যেতে থাকে তারপর পাতার আগায গিয়ে বিভিন্ন স্থানে মিশে যায। একে বলে অপসারী শিরাবিন্যাস, যেমন তালপাতা।

(ক) পাতার সাধারণ কার্যাবলী।

বাষ্প মোচন—পাতার বহির্ত্বকে খুব সূক্ষ্ম বহু ছিদ্র আছে। এগুলির নাম পত্ররন্ধ্র বা stomata. ঠিক এ ছিদ্রের পাশে দুটী কোষ আছে যাদের বলা হয় রক্ষীকোষ। এই রক্ষীকোষ ও মধ্যবর্তী রন্ধ্রের মাঝখানে বাতাবকাশ (air cavity) থাকে। এইখান দিয়ে পাতা জল টেনে নিয়ে স্ফীত বা জল বার করে দিয়ে সঙ্কুচিত হতে পারে। ফলে পাতার মধ্যে যে ফুটা (Cavity) থাকে সেটা বড় ছোট হয়।

পাতার মধ্যকার এই জল বাষ্পাকারে এক কোষ থেকে আর এক কোষ পরে পত্রের শূন্যস্থান বা বাতাবকাশ দিয়ে বার হয়ে যায়। যখন পাতার এই ফুটা (Stomatal Cavity) বড় হয় তখন বশী জল বার হয় আর যখন ছোট হয় তখন কম জল বার হয়ে যায়। এই যে বাষ্পাকারে জল নিষ্কাশন একে বলা হয় বাষ্পমোচন (transpiration)। শীতকালে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে তখন পাতা দিয়ে বেশী জল বার হয়ে যায় আর বর্ষাকালে কম বার হয়। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বাষ্পমোচন কম বেশী হয়।

বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবন।

পূর্বোক্ত পদ্ধতিকে বলা হয় বাষ্পমোচন। এর সঙ্গে বাষ্পীভবন এর তফাৎ আছে। সাধারণ সমুদয় জলাশয় বা যেখানে জল থাকতে পারে তার থেকে উষ্ণতার প্রভাবে জল বাষ্পীভবন হয়। কিন্তু বাষ্পমোচন কেবলমাত্র জীবিত গাছের পক্ষে সম্ভব।

(খ) অঙ্গার আত্মীকরণ।

গাছের পাতার প্রধান কাজ খাদ্য তৈরী করা। আমরা যেমন উনানের উপর আমাদের সমস্ত ভাত তরকারী রান্না করি গাছ তেমনি পাতায় খাদ্য প্রস্তুত করে। তার পর সেই খাদ্য দেহের বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেয়।

পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীরা দেখেছেন গাছের পাতার পেলিসাড্ কোষ জীবিত অবস্থায় পাতার সবুজ অংশের ক্লোরোফিল ও সূর্যালোক এর সহায়তায় জল (H_2O) ও কার্বন ডায়অক্সাইড বাষ্প থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে এই পদ্ধতিকে বলা হয় অঙ্গারাত্মীকরণ (Photosynthesis)। গাছ পাতার দ্বারা বাতাস থেকে CO_2 এবং শিকড় দ্বারা মাটি থেকে জল টেনে পাতায় নিয়ে আসে। তারপর সাধারণ ৬-বাতিসম্পন্ন সূর্যালোকে খাদ্য প্রস্তুতি চলে—

$$6\,CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{সূর্যালোক}]{\text{ক্লোরোফিল}} = C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

৬ অণু কার্বন ডায়অক্সাইড + ১২ অণু জল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করে এক অণু শর্করা ও ৬ অণু জল, আর ৬ অণু অক্সিজেন বাতাসে মিশে যায়।

দেখা গেছে এই রাসায়নিক পদ্ধতিতে সূর্যের আলোক বিশেষ প্রয়োজন। সূর্যের আলোক ব্যতিরেকে কার্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। এই জন্য একে বলা হয় আলোক সংশ্লেষ।

এই আলোক সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজন—

(১) আলোক—আলো থেকে পাওয়া যায় তাপ ও শক্তি।

(২) CO_2, এই বাষ্প থেকে গাছ অঙ্গার সংগ্রহ করে।

(৩) জল (H_2O) থেকে হাইড্রোজেন সংগৃহীত হয় তাহা নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করাতে পরিণত হয়।

(৪) উত্তাপ—দেখা গেছে কোন এক বিশেষ উত্তাপের পরিমাণ আলোক সংশ্লেষের বিশেষ উপযোগী। ২০°—৪৫° সেঃ।

(৫) পত্র রন্ধ্রের বিস্তৃতি ও হ্রাস—ছিদ্র বড় হলে বেশী CO_2 ঢুকতে পারে আর কম হলে এর পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে স্বভাবিক থেকে বাড়লে বেশী CO_2 ঢুকবে এবং তাতে কার্বনিক অম্ল সৃষ্টি হবে। ফলে গাছ মরে যাবে।

(৬) ক্লোরোফিল—জীবজগতে ক্লোরোফিল অতি আবশ্যকীয় দ্রব্য। এরা সূর্যালোক থেকে আলো সংগ্রহ করে। তা বাদে এনজাইমের কাজ করে।

শ্বাস ও প্রশ্বাস—পাতার মধ্যে এইভাবে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া চলে ফলে সমুদয় রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ভাঙ্গনের ক্রিয়ার ফলে নানা শক্তি নির্গত হয়। এই ভাঙ্গন অক্সিজেনের সাহায্যে বা তাপ ব্যতিরেকে চলতে পারে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় শ্বাস ও প্রশ্বাস। এই সময়ে গাছের দেহ হতে CO_2 বাইরে আসে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

যে শ্বাস ক্রিয়া অম্লজান (O_2) এর সহায়তায় চলে তাকে বলে সবাত শ্বাস (aerobic respiration) আর যখন অম্লজান ব্যতিরেকে চলে তখন বলে অবাতশ্বাস (anaerobic)। আর এরই ফলে কয়েকটি উৎসেচক (enzyme) এর সৃষ্টি হয়।

আমরা জানি আলোক সংশ্লেষ দ্বারা জল ও CO_2 সংযোগে শর্করার সৃষ্টি হয়। আর শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা এই শর্করা ভেঙ্গে আবার অম্লজান ও জলের সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্বাসক্রিয়া ঠিক আলোক সংশ্লেষ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ার বিপরীত।

$C_6H_{12}O_6+6O_2$ (সবাত ক্রিয়া) $=6CO_2+6H_2O+674$ কিলো ক্যালোরি।

এর রাসায়নিক ক্রিয়া অতি জটিল। তবে দেখা যাচ্ছে ৬ অণু শর্করাকে যদি কোন উৎসেচক দিয়ে ৬ অণু অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করান যায় তবে ৬ অণু CO_2, ৬ অণু জল আর কিছু উত্তাপ সৃষ্টি হবে। আবার যখন অক্সিজেনের অভাব হয় এবং গাছ অক্সিজেন পায় না তখন এই ক্রিয়া চলে।

$$C_6H_{12}O_6 \rightleftarrows \underline{2C_2H_5OH} + 2CO_2 + 21Kg\text{(ক্যালোরি)}$$

ইথাইল এলকোহল বলে।

সুতরাং শ্বাসক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদার্থগুলির বিশেষ প্রয়োজন।

(১) খাদ্য—খাদ্যকে ভাঙ্গতে হবে যদি খাদ্যের অভাব হয় তবে ভাঙ্গবে কাকে। সুতরাং এর অভাবে শ্বাসক্রিয়া চলতে পারে না।

(২) O_2 (অম্লজান) অতি সহজে বেশী পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি হতে পারে। উৎসেচক হিসাবে জল ও অম্লজান সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

(৩) উৎসেচক—গাছের উৎসেচক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

গাছ যে পরিমাণ অম্লজান বা অক্সিজেন টেনে নেয় ও যে পরিমাণ CO_2 বার করে দেয তার মধ্যে একটি অনুপাত রক্ষিত হয। একে বলা হয় শ্বাসহার (Respiratory quotient)।

$$CO_2 : O_2 = ১.$$

মাটিতেও এই ধরণের প্রক্রিয়া সমানে হযে চলেছে। এই শক্তিই মাটিতে সারের কাজ করে।

জল ও খাদ্য চলাচল—পাতার যে সমস্ত কোষ থাকে সেগুলির সাহায্যে জল চলাচল করতে পারে। গাছের কাণ্ড ও শাখা থেকে বোঁটা পর্যন্ত মাটি থেকে জল টেনে নিযে পাতায পৌঁছিযে দেয। এজন্য দেখা যায় পাতা থেকে সব সময বাষ্পমোচন হচ্ছে। খাদ্য তৈরী হয়ে গেলে আবার সেই খাদ্য জলের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চলে যায়।

পাতার বিশেষ কাজ—পাতা এই সমস্ত সাধারণ কাজ ছাড়াও সময় সময় নানা রকমের কাজ করে থাকে। অবশ্য তার জন্য পাতার রূপান্তর ঘটে।

(১) পাতায় খাদ্য জমা থাকে তার ফলে পাতা মোটা হয়ে যায়। যেমন পেঁয়াজের পাতা, পুঁই শাক, ঘৃতকুমারি।

(২) পত্রআকর্ষ—কোন কোন গাছের পাতা অনেক সময় সম্পূর্ণাকারে বা কখনও কখনও অল্প পরিমাণে কোন আকর্ষের অংশে রূপান্তরিত হয়। এরা গাছকে অন্য গাছ আঁকড়ে উঠতে সাহায্য করে।

(৩) অনেক সময় অনেক গাছের পাতা কাঁটার আকার নেয়। এই কাঁটা

দিয়ে গাছ আত্মরক্ষা করে এবং দ্বিতীয়তঃ উদ্ভিদের বাষ্পমোচন কম হয়। যেমন, ফনিমনসার কাঁটা।

(৪) ফাইলোড (Phyllode), বাবলা প্রভৃতি গাছের পাতার ফলকাংশ খসে পড়ে এবং বোঁটাগুলি চ্যাপ্টা আকার নেয়। এই পাতার বোঁটাকে ফাইলোড বলে।

নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য আহরণের জন্য পাতার রূপান্তর— অনেক সময় দেখা যায় কতকগুলি গাছের পাতার আগায় ঠিক ঘটের আকার সৃষ্টি হয়। আর ঘটের ঠিক উপরে থাকে একটা রঙীন ঢাকনি। যখন কোন কীটপতঙ্গ পাতার নীচে পড়বে তখন তার মধ্যকার জারক রস তাকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলবে এবং ঐ প্রাণীদেহ থেকে N_2 সংগ্রহ করে গাছ বৃদ্ধি পাবে।

আর এক রকমের গাছ আছে তাকে বলা হয় পাতা ঝাঁঝি। এদের পাতা সরু সুতার মত। এর পাতা ছোট থলিতে রূপান্তরিত হয়। এই থলিগুলোকে ফাঁদ বলে। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ এখানে এলে জলের সঙ্গে মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর এখান থেকে জারক রস নির্গত হয়ে পোকাটাকে মেরে ফেলে। তারপর ঐ প্রাণীদেহ থেকে গাছ N_2 টেনে নেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাহার কাজ

(Morphology of Flowers)

একটি পুষ্প

উদ্ভিদের শাখা ও প্রশাখার আগায় ফুল ফোটে। এই ফুলের দ্বারা

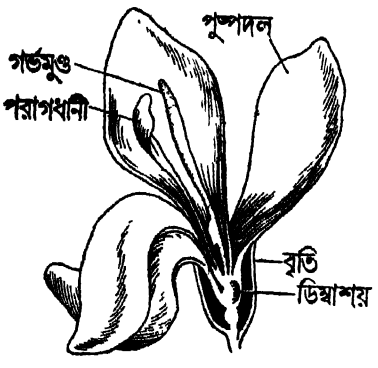


উদ্ভিদের জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কতকগুলি রেণুপত্রের সমন্বয়ে ফুল গঠিত হয়।

বাহিরের পাতাগুলিকে বলে পুংস্তবক (Androcium) আর ভিতরের গুলিকে বলে স্ত্রীস্তবক (Gynocium)। রেণু পত্রের সহিত অন্যান্য পত্র থাকে এগুলিকে বলা যেতে পারে সহকারী পত্রপুট। এগুলি গোলাকার-ভাবে সজ্জিত থাকে। এই আবর্তগুলি ছাড়া ছাড়া থাকে। বহিরাবর্তের পত্রপুটকে বলে বৃতি (Calyx) আর ভিতরেরগুলিকে বলে পুষ্পদল (Corolla)।

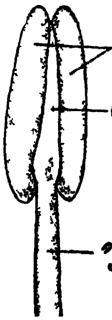
পুষ্পেও চারিটি অংশ থাকে ; যথা— (১) বৃতি (২) পুষ্পদল (৩) পুংস্তবক (৪) স্ত্রীস্তবক। এই চারিটি অংশ একটি কক্ষের উপর সজ্জিত থাকে। সেই কক্ষটিকে বলা হয় পুষ্পাধার Thalamous। দণ্ডটিকে বলা যায় পুষ্পবৃন্ত (Peduncle)।

বৃতি (Calyx) ফুলের একটি বিশেষ অংশ। ইহা হরিৎবর্ণের ও পত্রাকার দেখতে। দলের সর্বনিম্ন অংশে সজ্জিত থাকে। বৃতি পুষ্পকোরকটিকে ঢেকে রেখে জল, বাতাস, উত্তাপ ও কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করে। কোন কোন ফুল রঙ্গীন হয় এবং কীট-পতঙ্গাদি ডেকে এনে জননক্রিয়া সম্পন্ন করায়।



পুষ্পদল—বৃতির উপরে দ্বিতীয় আবর্তে অবস্থিত উজ্জ্বল বর্ণের পত্রাকার অংশগুলিকে বলে পুষ্পদল। এরা ৪ বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত থাকে। এক একটিকে বলে দলভাগ (Petal) সাধারণতঃ দলভাগের নীচের অংশ সরু এবং উপরের অংশ একটু বিস্তৃত হয়। পুষ্পদলের প্রধান কাজ এর উজ্জ্বল রঙ ও গন্ধ দ্বারা কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করা এবং এর ফলে পরাগ সংযোগ হয়।

পুংস্তবক (Androcium)—ঠিক দলের উপর পুষ্পের আবর্তে যে অংশ সজ্জিত থাকে তাকে বলে পুংস্তবক। এর এক একটি ভাগকে পুংকেশর (Stamen) ও উপরের ডিমের মত মোটা অংশটিকে বলে পরাগধানী (Anther)। এই পরাগধানী লম্বা লম্বা ভাগে বিভক্ত থাকে। এক একটিকে বলা হয় পরাগকোষ (Pollen sac)। এই পরাগ কোষের মধ্যে থাকে পরাগ রেণু (Pollen grain)। যেটা দিয়ে পুংদণ্ডের সহিত পরাগধানী যুক্ত থাকে তাকে বলে যোজক।



নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে পবাগধানীব সহিত যোজকেব যোগ থাকে।

(ক) যখন পুংদণ্ড পবাগধানীর যোজকেব নীচে যুক্ত থাকে তখন বলা হয় অধোসংস্থান ; যেমন মূলা।

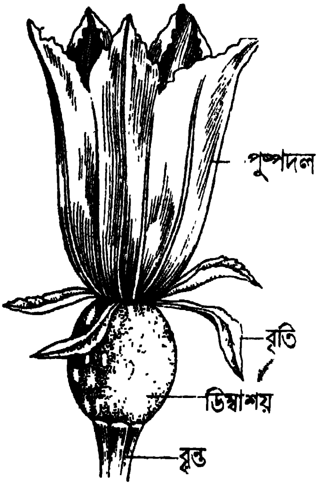
(খ) যখন পুংদণ্ডটি পরাগধানীর যোজকের সহিত উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যুক্ত থাকে তখন বলা হয় পবাগসংস্থান (Adnate) ; যেমন চাঁপা ইত্যাদি।

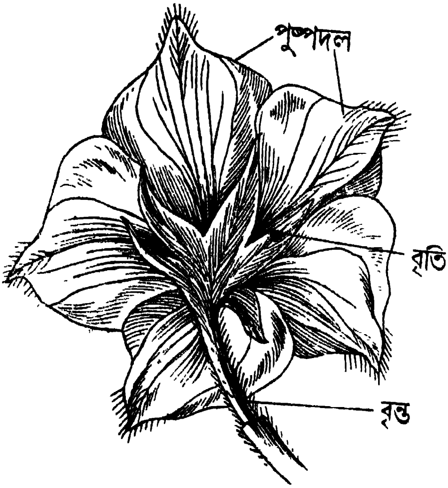
(গ) অনেক সময় দেখলে মনে হয় পবাগধানীর সহিত ৮০°, ৯০° কোণ করে পুংদণ্ড বাহিরে থাকে তখন বলা হয় পৃষ্ঠ-সংস্থান ; যেমন ঝুমকো লতা ইত্যাদি।

(ঘ) পরাগধানী পুংদণ্ডের আগায এমনভাবে যুক্ত থাকে যে সামান্য বাতাসে ঐ পরাগধানী নড়ে ; যেমন কলা, ধান।

স্ত্রী স্তবক—চতুর্থ আবর্তে সজ্জিত অংশটিকে বলা হয় স্ত্রী স্তবক (Gynocium)। এর তিনটি অংশ। সব থেকে নীচের মোটা অংশকে বলা হয ডিম্বাশয (Ovary), তার উপরের সরু দণ্ডকে বলে গর্ভদণ্ড (Style) আর এই গর্ভ দণ্ডেব মাথায থাকে গর্ভমুণ্ড (Stigma)।

সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল—যে ফুলের মধ্যে বৃতি, পুং স্তবক, স্ত্রী স্তবক ও পুষ্পদল থাকে তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ পুষ্প। এর যে কোন একটির অভাব হলে তাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ পুষ্প। যদি কোন ফুলে পুং স্তবক না থাকে তবে তাকে বলে স্ত্রী পুষ্প এবং স্ত্রী স্তবক না থাকলে তাকে বলা হয় পুং পুষ্প। তবে এরা অসম্পূর্ণ ফুল; যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। আগায় অনেক





ফুল আছে যাদের একই ফুলের মধ্যে পুং এবং স্ত্রী স্তবক থাকে এদের বলে উভয় লিঙ্গ ফুল (Hermaphrodite)।

অনেক সময় একটি গাছে কেবলমাত্র স্ত্রী পুষ্প এবং পুং পুষ্প দেখা যায়। যখন কোন ফুলের বৃতি, পুষ্পদলাংস, পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই রকম দেখতে হয়—আবর্তের ঘরে স্ত্রী পুষ্প বা পুং পুষ্প দেখা যায় তখন একে বলা হয় ভিন্নবলী বৃতি। কত দীর্ঘ সময় থাকে তার উপর নির্ভর করে ৫টি ভাগ করা হয়।

(১) ফুল থেকে ফল হওয়ার পরও বৃতি থাকলে তখন বলা হয় স্থায়ী বৃতি।

(২) যখন বৃত্যাংশ পাতার পরে শুষ্ক ও ম্লান হয়ে যায়।

(৩) অনেকগুলি আছে অতি অল্পকাল স্থায়ী হয়; যেমন পপি, পোস্ত ইত্যাদি।



১। ক্রুশাকৃতি ২। লবঙ্গাকৃতি ৩। গোলকাকৃতি ৪। প্রজাপতিআকৃতি ৫, ৮, ১১ নলাকৃতি ৬। ঘণ্টাকৃতি ৯, ১০। উপাকৃতি ১২। জিহ্বাকৃতি।

(৪) বৃতিমাচী—ফুল ধরার সঙ্গে সঙ্গে বৃতি ঝড়ে পড়ে : যেমন গোলাপ, আম।

(৫) একে অন্য থেকে পৃথক থাকে তাঁকে বলা হয় বিভিন্ন বৃতি ; যেমন ধুতুরা, জবা। যখন একই রকমের বৃতি ও বৃত্যাংশ একে অন্য থেকে ছাড়া ছাড়া থাকে তখন বলা হয় বিচ্ছিন্ন বৃতি, যেমন টম্যাটো।

পুষ্পদল—পুষ্পদলের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে তাকে বলা হয় বৃতি সাদৃশ দল বা সমাঙ্গ বৃতি। আর যখন কোন মিল থাকে না তখন বলা হয় অসমাঙ্গযুক্ত বৃতি। সব অংশ বিচার করে পুষ্পদলকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) সুসমমুক্ত পুষ্পদল—

যখন পুষ্পদল চারিদিকে বিকশিত থাকে, ক্রুশের চিহ্নবৎ তখন তাকে ক্রুশাকৃতি পুষ্পদল বলা হয় : যেমন সরিষা, মুলা।

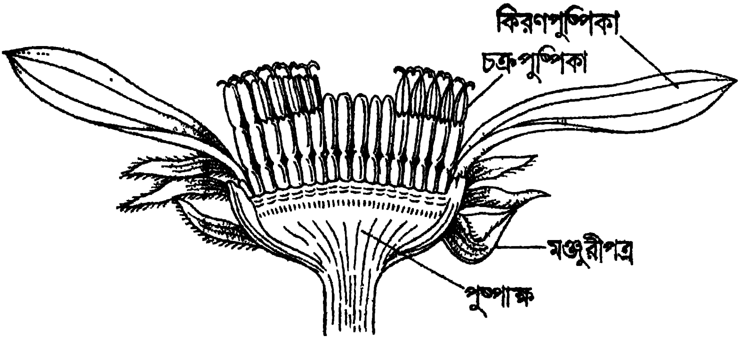
দেখতে অনেকটা লবঙ্গের মত লবঙ্গ আকার পুষ্পদল ; যেমন রিঠা।

গোলাপ ফুলের মত বিকশিত ; যেমন গোলাপ, চা ইত্যাদি।

(খ) সুষম যুক্তদল—

(১) দেখতে অনেকটা নলের মত—নলাকার ; যেমন সূর্যমুখী।

(২) দেখতে অনেকটা ঘণ্টার মত—ঘণ্টাকার ; যেমন কুমড়া।



(৩) দেখতে অনেকটা কলিকার মত—কলিকাকার ; যেমন ধুতুরা, কলসী।

পুং স্তবক—পুং স্তবকে থাকে পুংদণ্ড। পুংদণ্ডের দৈর্ঘ্য সব সময় সমান থাকে না। তবুও এদের বিন্যাসের একটি রীতি আছে। সরিষার ফুলের ৬টি দণ্ডের মধ্যে ৪টি বড় ২টি ছোট। দীর্ঘ ৪টি সমান লম্বা এবং ছোট দুটি। দৈর্ঘ্যে ছোট কিন্তু নিজেরা সমান।

ফুলের বৃদ্ধির সহিত পুংকেশবগুলি পুষ্ট হতে থাকে। ফলে পরাগধানী ফেটে যায। এই ফেটে যাওযা ৪ রকমে ঘটতে পারে। লম্বালম্বি, বাঁকা, ছিদ্র সহযোগে এবং কপাট বিদাবণ পদ্ধতিতে।

স্ত্রী স্তবক—গর্ভপত্র এক বা একাধিক হতে পাবে। যদি একটি থাকে তবে একক গর্ভপত্রী আব যদি ততোধিক থাকে তবে যৌগিক গর্ভপত্রী বলে।

অনেক সময গর্ভপত্রগুলি বিভিন্ন থাকে, বেশী স্ত্রী স্তবক তৈবী করে। যেমন আতা।

অনেক স্থলে আবার গর্ভপত্রগুলি যুক্ত থাকে ; যেমন আম, জাম, ইত্যাদি।

মধ্যশিরার উভাংশ যুক্ত হযে প্রকোষ্ঠেব সৃষ্টি করে। একে বলে গর্ভাধার।

গর্ভপত্রেব বহিঃসন্ধির স্থলে ফুলা অংশ দেখতে পাওযা যায একে বলা হয অমরা (placenta)। একটিমাত্র পাতার থেকে সংযোগস্থান তৈরী হয়ে যে অমরার সৃষ্টি হয় তাকে বলে প্রান্তিক ; যেমন ছোলা, মটব ইত্যাদি।

অনেক সময় প্রকোষ্ঠ থাকে একটি। অমরাগুলি দুটি বা ততোধিক গর্ভ-পত্রের সংযুক্ত কাণ্ডের উপর অবস্থিত থাকে। তখন একে বলে প্রান্তীয—যেমন পেঁপে, শশা ইত্যাদি।

অনেক ফুলে আবার একাধিক প্রকোষ্ঠ থাকে। গর্ভপত্রের পাতার কিনারাগুলি ভাঁজ হযে মাঝখানে এসে মিলিত হয়। এইভাবে বহু কক্ষ তৈরী হয। এখানে অমরার উৎপত্তি হয। যেমন জবা, রজনীগন্ধা ইত্যাদি।

অনেক ফুলে দেখা যায় যাহাদের কোন কক্ষের দেওযাল নেই। সব

ভেঙে গিয়ে একটিমাত্র কক্ষের সৃষ্টি হয়েছে আর অমরাগুলি সৃষ্টি হয়ে কেন্দ্রাকারে সজ্জিত করে রেখেছে। একে বলা যেতে পারে মুক্ত বিন্যাস; যেমন পিঙ্ক।

অনেক ফুলে প্রকোষ্ঠ এবং গর্ভপত্র থাকে। ভিতরের ও পাশের গর্ভ প্রাচীর থেকে অমরা উৎপন্ন হয। যেমন শাপলা, শালুক ইত্যাদি।

অনেক জায়গায় দেখা যায় গর্ভাশযে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ থাকে। গর্ভাশয়ের নীচে তাহার সৃষ্টি হয় এবং গর্ভাশযের নীচে একটিমাত্র ডিম্বক তৈরী হয; যেমন গাঁদা।

ফুল ও তার বিন্যাস (Inflorescence)

বংশরক্ষা জীবের ধর্ম। ফুল থেকে ফল আর ফল থেকে বীজ। কিন্তু এই ফুল একটা বিশেষ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সজ্জিত থাকে। এই যে সজ্জা-রীতি একে বলা হয পুষ্পবিন্যাস। যে অক্ষের উপর পুষ্প সজ্জিত থাকে তাকে বলে পুষ্পদণ্ড (Peduncle)। পুষ্পদণ্ডে প্রতিটি বৃন্তকে বলা হয পুষ্পবৃন্তিকা (pedicel)। যখন এই পুষ্পদণ্ড ছোট বা দীর্ঘ হয তখন একে বলা হয পুষ্পাধার (Receptacle)। পুষ্পদণ্ড ও পুষ্পবৃন্তের আগা সাধারণতঃ একটু মোটা হযে থাকে তখন তাকে বলা হয পুষ্পাক্ষ (Thalamus)।

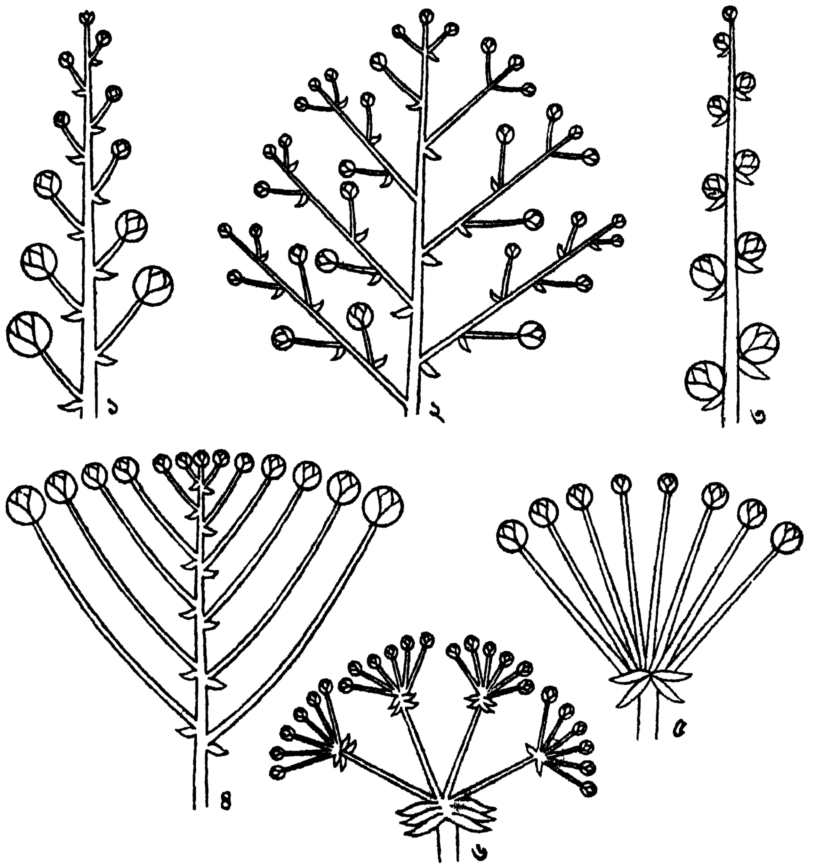
সমুদয পুষ্পবিন্যাস দুটি ভাগে ভাগ করা যায। (১) নিযত পুষ্পবিন্যাস (Definite Racemose) আর (২) অনিযত পুষ্পবিন্যাস (Indefinite Racemose)।

অনিযত পুষ্পবিন্যাস—যে পুষ্প বিকাশনের পদ্ধতিতে পুষ্পদণ্ড অনির্দিষ্ট-ভাবে বাড়ে এবং এর আগায কোন পুষ্প থাকে না তখন একে বলা হয অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস। এই বিন্যাসে পুষ্পগুলি নীচু থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে যেতে থাকে। নানারকমের এই পুষ্পবিন্যাস হতে পারে।

(১) অনির্দিষ্ট বিন্যাস—পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ এবং অনিয়তভাবে বাড়তে থাকে। এদের ফুলের বোঁটা থাকে। নীচের থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে থাকে। যেমন সরিষা, মূলা ইত্যাদি।

(২) যৌগিক অনিযত বিন্যাস—পুষ্পদণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বার হলে তাকে বলা হয় যৌগিক, যেমন, আম, সজিনা।

(৩) শীর্ষবিন্যাস (Spike)—অক্ষটি অনিয়ত ও দীর্ঘ। নীচের দিক



১। অনির্দিষ্ট বিন্যাস ২। শীর্ষবিন্যাস ৩। দ্বিপার্শ্বীয় বিন্যাস ৪। সমবিন্যাস ৫, ৬। পত্রমঞ্জরী।

থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে থাকে এবং ফুলগুলি বোঁটাহীন; যেমন আপাং।

(৪) শীর্ষাঙ্কুবিন্যাস (Spikelet)—ছোট আকারের শীর্ষবিন্যাস। এই প্রকার ফুলে এক বা তার থেকে বেশী ফুল থাকতে পারে। এই ফুলের নীচের দিকে থাকে মঞ্জরীপত্র। সপুষ্পক পত্রের নীচে শল্কবর্মের উপর থাকে শল্কবর্ম (Palea); যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি।

(৫) চমসামঞ্জরী (Spadix) শীর্ষবিন্যাসের রূপান্তরমাত্র। পুষ্পদণ্ড মোটা এবং লম্বা হয়। এগুলি একটা পুষ্পাধারে পত্র দিয়ে আটকান থাকে। যেমন কচু, তাল, নারিকেল, মোস।

(৬) সমভূম মঞ্জরী (Corymb)—পুষ্পদণ্ড অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হয়। নীচের ফুলগুলি লম্বা, ফলে সবগুলি একই রেখা পর্যন্ত লম্বা। যেমন কালকাসিন্দা।

(৭) ছত্রমঞ্জরী (umbel)—প্রধান পুষ্পদণ্ডটি আকারে ছোট। এর উপর সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বহু পুষ্প জন্মায়। প্রতিটি পুষ্পদণ্ডের নীচে একটি করে মঞ্জরীপত্র থাকে। তাকে বলে Compound umbel ; যেমন পেঁযাজ, ধনে, জিরা।

নিয়ত পুষ্পবিন্যাস—এর পুষ্পদণ্ড সমানভাবে বাড়তে থাকে এবং এর আগায একটি পুষ্প জন্মায। এই পদ্ধতিতে ফুলগুলি উপর থেকে নীচের দিকে যেতে থাকে। পুষ্পদণ্ড একটি নির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধির জন্য একে বলা হয় নিযত পুষ্পবিন্যাস। এই বিন্যাসে ফুলগুলি একপাশে থাকলে তাকে বলা হয় এক পার্শ্বীয়, উভয় পার্শ্বে থাকলে তাকে বলা হয় উভয় পার্শ্বীয় এবং সকল দিকে থাকলে তাকে বলে বহু পার্শ্বীয।

এক পার্শ্বীয় মঞ্জরী—প্রধান পুষ্পদণ্ডের শেষ ফুল থেকে অগ্রপুষ্পযুক্ত একটি মাত্র শাখা পুষ্পদণ্ড বার হয। ঐ শাখাদণ্ডের মাথার ওপর ফুলের নীচে আরও শাখাদণ্ড বার হতে পারে। এই রকম একের পর আর একটি দণ্ড বার হয়ে সজ্জিত হয়।

এই প্রকার পুষ্পবিন্যাসে ফুলগুলি বাম বা ডানদিক হতে বাড়ে যেমন হাতিশুড়, তুলা।

আবার প্রধান দণ্ডের আব ফুলের নীচে তুটিমাত্র পুষ্পযুক্ত শাখাদণ্ড বার হয়। প্রতিটি শাখাদণ্ডের আগায় ফুলের নীচে তুটি শাখাদণ্ড বার হয়। এর আগায় একটি করে ফুল থাকে। পর্যায়ক্রমে ডাইনে ও বামে এই ফুল ফোটে ; যেমন বেল, চামেলী ইত্যাদি।

বহু পার্শ্বীয় মঞ্জরী—এই পুষ্প বিন্যাসের প্রধান দণ্ডের আগার ফুলের নীচে থেকে তুই এব বেশী ফুলবিশিষ্ট মঞ্জরী দণ্ড বার হয়। যেমন আকন্দ, মান্দার।

এ ভিন্ন কয়েকটি বিশেষ রকমের পুষ্পবিন্যাস আছে—

(১) মস্তকবিন্যাস—এতে থাকে প্রধান দণ্ড ছোট এবং মোটা। এই অক্ষের উপর কয়েকটি বোঁটাবিহীন ফুল থাকে। সমস্তগুলি মিলিয়ে একটি ফুলের মত দেখায়। শিব মঞ্জরীর মস্তকস্থিত প্রতিটি পুষ্পকে বলা হয় পুষ্পিকা (floret)। প্রতিটি শিবমঞ্জরীর নীচের দিকে থাকে মঞ্জরীপত্র। যেমন সূর্যমুখী, কদম্ব ইত্যাদি।

(২) উডুম্বর (Hypanthodium)—ঐ প্রকার বিশিষ্ট ধরণের পুষ্প-বিন্যাসে পুষ্পদণ্ড শাঁসালো ও গোলাকার হয়। এই মঞ্জরীর মাথায় একটা ফুটা দেখা যায়। এর গুহায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতীয় ছোট ছোট ফুল দেখা যায়। পুরুষ পুষ্পগুলি স্ত্রী-পুষ্পের উপর স্থাপিত হয়। যেমন ডুমুর, বট ইত্যাদি।

(৩) নিয়ত কক্ষ পুষ্প সমাহার (Verticellaster) এই একপ্রকার দ্বিপার্শ্বীয় নিয়ত পুষ্পবিন্যাস। এই ফুলে কয়েকটি বোঁটাহীন ফুল পর্ণকক্ষের পর্ব থেকে জন্মিয়া থাকে। প্রতিটি ফুলের নীচে একটি মঞ্জরীপত্র থাকে ; যেমন রক্তদ্রোণ।

পরাগযোগ

পরাগরেণু পরাগদণ্ড থেকে পরাগগর্ভে চলে আসে। এই পদ্ধতিকে

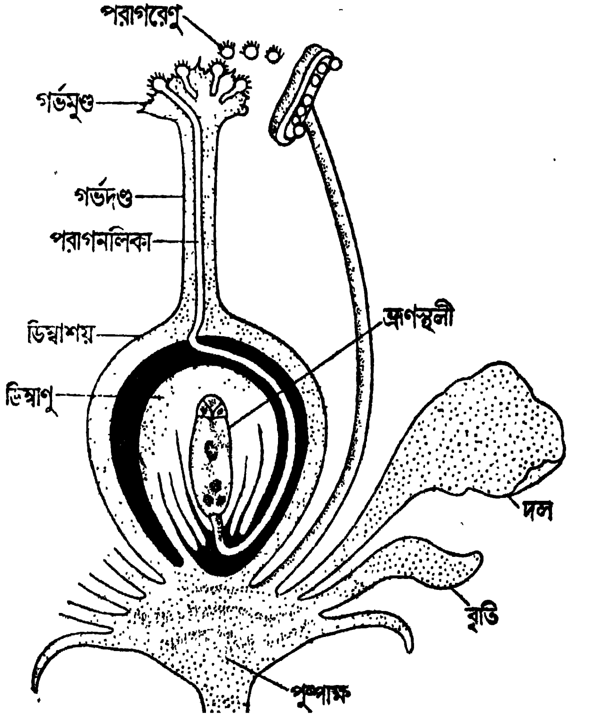
বলা হয় পরাগযোগ। পরাগযোগ দুই প্রকার—যথা, ইতর পরাগযোগ (over pollination) ও স্ব-পরাগযোগ (self pollination)। যদি একই ফুলে পরাগদণ্ড থেকে পরাগরেণু পরাগগর্ভে গিয়ে পড়ে তবে তাকে বলে স্ব-পরাগযোগ। আর যদি একটি ফুলের পরাগদণ্ড থেকে পরাগরেণু অন্য ফুলের পরাগগর্ভে গিয়ে পড়ে তাকে বলা হয় ইতর পরাগযোগ।

বিভিন্ন ফুলেতে এই পবাগযোগের জন্য নানারকম উপায়ের প্রয়োজন হয়। এই বিষয়ে খুব বেশী সাহায্য করে কীটপতঙ্গ। ফুলের রঙে আকৃষ্ট হয়ে যখন কীটপতঙ্গ ফুলের উপব গিয়ে বসে তখন এদের পাখায় কিছু পরাগরেণু লেগে যায়, পরে যখন অন্য কোন ফুলে গিয়ে বসে তখন এই পরাগরেণুগুলি সেখানে যে পরাগদণ্ড বা গর্ভদণ্ড থাকে তার সংস্পর্শে আসে। এভাবে পরাগযোগ হয়। বাতাস দ্বারাও এর কিছু কাজ হয়। বৃষ্টির জলেও অনেক সময় এই কাজ হয়।

কেবলমাত্র ফুলেব বঙে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয় না। ফুলের গন্ধও কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। বর্ষাকালে ঘেঁটু ফুলের গন্ধে গাঁয়ের পথে হাঁটা যায় না। অনেক সময় ছোট ছোট ফুল একত্র সমাষ্টি হয়ে বিশেষ মনোহারী আকার নেয়। এদেব কাজ হলো কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করা।

কীটপতঙ্গ যখন ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায় সে তখন জানতেও পারে না, সৃষ্টির জন্য কত কাজ না সে করছে। পায়ে লেগে যে-সমস্ত রেণু ফুল থেকে বেরিয়ে আসে—সেগুলি অন্য ফুলে পরাগদণ্ডের গায়ে যে রস থাকে তাতে যায়। এইভাবে পরাগযোগ হয় ও বীজ সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়। বাতাসে গাছের ডাল ও ফুল হেলে দোলে, এদিকে যায় কথনও বা অন্যদিকে যায়। এর ফলে একগাছের ডালের সঙ্গে অন্য গাছের ডালের মিতালি হয়। একে অন্যকে একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, আর বাতাসেও পরাগরেণু দণ্ড থেকে চলে আসে। সুতরাং তখন সামান্য আঘাতে স্থানচ্যুত হয়ে অন্য ফুলে গিয়ে পড়তে পারে।

স্বপরাগযোগ থেকে ইতর পরাগযোগ ভাল। কারণ যদিও স্বপরাগযোগে ফল প্রাপ্তি নিশ্চয়ই, কিন্তু ইতর পরাগযোগে যে ফল ও বীজ হয় এবং বীজ থেকে গাছ হবে সে-গাছ খুবই কষ্টসহিষ্ণু হয় ও বাঁচবার জন্য তার লড়াই করবার ক্ষমতা বেশী। কারণ তারা পিতা ও মাতা দুই দিককার থেকে শক্তি পায়। তাদের থেকে ফলও ভাল পাওয়া যায় এবং ফল আকারেও বড় হয়। স্বপরাগযোগ অনেক সময় কাজের হয় না, কারণ অনেক সময় অনেক ফুলে পরাগরেণুর কোন শক্তি থাকে না; যেমন অর্কিড। অনেক ফুলে



* পরাগদণ্ড ও গর্ভদণ্ড একই সময়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে না, তার ফলে ইতর পরাগযোগের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ফুলের আকারের জন্য

স্বপরাগযোগ সম্ভব নয়, যেমন —আমরুল। অনেক সময় পরাগদণ্ড ও গর্ভদণ্ডের মাঝখানে শক্ত আবরণ গড়ে ওঠে। এর ফলে স্বপরাগযোগ হয় না।

পরাগযোগ (Pollination)

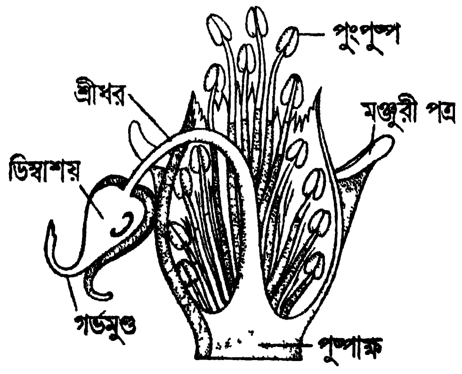
পরাগধানী থেকে পরাগের গর্ভমুণ্ডের উপর পতনকে পরাগযোগ বলা হয়। এরই ফলে ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে নূতন চারার উদ্ভব হয়। পরাগযোগ দুই রকমের—(১) বিপরীত পরাগযোগ (২) স্বপরাগযোগ।

বিপরীত পরাগযোগ—একটি গাছের ফুলের পরাগ অন্য একটি গাছের ফুলের পরাগ-এর সহিত মিলন হলে তাকে বলা হয় বিপরীত পরাগযোগ।

স্বপরাগযোগ—একটি পুষ্পের পরাগধানী থেকে রেণু সেই পুষ্পের কোন গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হলে তাকে স্বপরাগযোগ বলা হয়।

বিপরীত পরাগযোগ—অনেক ফুল আছে যাদের পুং স্তবক নেই আবার অনেক ফুল আছে যাহাতে স্ত্রী স্তবক নেই। সুতরাং এদের বেলায় বিপরীত পরাগযোগ অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিন রকমের ফুল দেখা যায়।



(১) উভলিঙ্গ—স্ত্রী এবং পুং উভয় পুষ্প একই গাছে থাকে; যেমন কুমড়া।

(খ) একলিঙ্গ—স্ত্রী এবং পুং পুষ্প ভিন্ন ভিন্ন গাছে থাকে। যেমন পেঁপে, তাল। যে সমস্ত দ্বিলিঙ্গ ফুল আছে তাদের পুষ্পে পরাগ ও গর্ভমুণ্ড একই সময়ে তৈরী হয় না। ফলে তাদের পরাগ-

যোগের জন্য অন্যান্য ফুলের প্রয়োজন হয়। কারণ ঐ ক্ষেত্রে স্বপরাগযোগ সম্ভব নয়। সেজন্য একে বলা হয় বিষম পরিণতি।

(১) পুং স্তবক গর্ভাশয়ের বহু পূর্বে তৈরী হয়। পরিণত হলে সেখান থেকে রেণু বার হয় কিন্তু গর্ভাশয় তখন পরিণত হয় নি; যেমন—মৌরী, জবা।

(২) গর্ভাশয় আগে তৈরী হয়ে পরিণত হয় কিন্তু পুং স্তবক তখনও উপযুক্ত হয়নি; যেমন—চাঁপা, সরিষা।

অনেক সময় দেখা যায় একই ফুলেব মধ্যে স্ত্রী এবং পুং স্তবক থাকলেও কোন বিশেষ বিশেষ কাবণে তাদের মিলন সম্ভব নয। তাদের মধ্যে প্রধান কাবণ হলো তাদেব রূপান্তর। কারণ কোন একটি আর একটি থেকে দূরে সবে গেলে তাদের আর মিলন হওযা সম্ভব নয। যেমন—ঘেঁটু ফুলের পুং স্তবক বেড়ে গিয়ে গর্ভাশয় থেকে বার হযে যায এবং ঝুলতে থাকে।

দুটি বিভিন্ন পুষ্পে স্ত্রী স্তবক ও পুং স্তবক জন্মালেও এদের দণ্ড বিভিন্ন আকাবেব হওয়াব ফলে মিলন সম্ভব হয না।

প্রথমতঃ, পুংদণ্ডগুলি স্ত্রীদণ্ড থেকে দীর্ঘ হয—পাণিমরিচ, লালচানা, বিট।

দ্বিতীয়ত, পুংদণ্ডগুলি তিন আকাবের হতে পাবে। যেমন—জামরুল, কামরাঙ্গা।

বন্ধ্যা (Self Sterile)—কোন কোন ফুলের পবাগ গর্ভদণ্ডের উপর পড়লেও গর্ভাধান তৈরী হয না। একে বলা যায বন্ধ্যা ফুল।

স্বপরাগযোগ (Self-Pollination) কেবলমাত্র উভযলিঙ্গ ফুলে সম্ভব। অনেক সময় বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হওয়ায় স্বপরাগযোগ সম্ভব হয় না। তখন তারা বিপরীত পরাগযোগ মাধ্যমে ফলে পরিণত হয।

স্বপরাগযোগ সম্ভব হতে গেলে প্রধান দরকার পরাগধানী ও গর্ভমুণ্ডের একই সময়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে কীট-পতঙ্গাদির দ্বারা কিছু পরিমাণে রেণু গর্ভমুণ্ডের উপর নীত হয়। আর এরই ফলস্বরূপ

স্বপরাগযোগ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় পূর্ণতা পেলে পরাগধানী গর্ভদণ্ডের নিকটে আসে। ঐ সময় যদি পরাগধানী ফেটে যায় তবে সহজে পরাগ সংযোগ ঘটে। আবার কতকগুলি ফুলের গর্ভদণ্ড পুংদণ্ড থেকে দীর্ঘতর হয়। ফলে স্বপরাগযোগ সম্ভব হয়। কতকগুলি ফুল আবার অনেক সময় মোটে ফোটে না। গর্ভদণ্ড ও পুংদণ্ড পরস্পর সন্নিকটে থাকে বা একে অন্যকে জড়িয়ে থাকে—এর ফলে স্বপরাগযোগ ঘটে। একে বলা হয় নিরুদ্ধমিলন। যেমন—কালশিরা।

পরাগযোগের বাহক—যে ভাবেই পরাগযোগ অনুষ্ঠিত হউক না কেন এর জন্য বাহকের প্রয়োজন হয়।

(ক) বায়ুপরাগী—যে সমস্ত ফুলের রেণু বাতাসের দ্বারা গর্ভমুণ্ডের উপর নীত হয় তাকে বলা হয় বায়ুপরাগী ফুল। এই সমস্ত ফুল দেখতে আকারে ছোট, বর্ণহীন এবং গন্ধহীন হয়ে থাকে, কারণ কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করবার মত ক্ষমতা এদের নেই। এই সমস্ত ফুলে পরাগধানী ফেটে গিয়ে বহুরেণু বার হয়ে পড়ে এবং এই রেণু বায়ু হিন্দোলে চালিত হয়ে গর্ভদণ্ডের উপর এসে পড়ে। গর্ভদণ্ড তখন পূর্ণতা পেয়ে থাকে। সুতরাং কোনমতে কয়টি রেণু গর্ভাধানে গেলে পরাগ সংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে বহু রেণু নষ্ট হয়ে যায়, তবে প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভাধারগুলি একটু আকারে বড় হয় যেন কোন মতে ক্ষুদ্ররেণু গর্ভাধারে যেতে পারে। যেমন—ভুট্টা, গম ইত্যাদি।

(খ) অনেকগুলি ফুল আছে যাদের পরাগযোগ প্রাণীর দ্বারা ভিন্ন হতে পারে না। নানা রকমের পাখী, কাঠবেরালী, চামচিকা, শামুক এই পরাগ-যোগে সহায়তা করে—যেমন শিমুল ফুলে পাখীতে সাহায্য করে, কদম ফুলে চামচিকা—কচুর ফুলেতে শামুক।

(গ) জলপরাগী—জলের দ্বারা বিশেষতঃ বৃষ্টির জলে অনেক সময় পরাগ-যোগ ঘটে। এই ধরণের ফুলগুলোকে জলপরাগী ফুল বলা যায়। সাধারণতঃ

জলজ গাছের মধ্যে এই ধরণের পরাগযোগ ঘটে, যেমন পান, শেওলা, ঝাঁঝি ইত্যাদি—এই সমস্ত জলজ উদ্ভিদের পুং পুষ্পগুলি মঞ্জরীপত্র দিয়া ঢাকা থাকে এবং ঐ মঞ্জরীদণ্ডটি বোঁটার আকার হয়। আর স্ত্রী পুষ্প দণ্ডের আগায় একটি করে ফুল থাকে এবং মঞ্জরীদণ্ডটি আকারে লম্বা। যখন পুং পুষ্প পূর্ণবয়স্ক হয় তখন দণ্ড থেকে ছাড়া পেয়ে জলে ভেসে বেড়াতে থাকে। আর এই সময়ে স্ত্রী পুষ্পগুলিও পরিণত হয় এবং তাদের মঞ্জরীদণ্ডের কুণ্ডলী অংশ সোজা হয়ে যায়। এই সোজা হওয়ার ফলে পুং পুষ্পগুলি স্ত্রী পুষ্পের সংস্পর্শে আসে এবং মিলন ঘটে। পরাগযোগ সম্পন্ন হয়ে গেলে স্ত্রী পুষ্পের মঞ্জরী দণ্ডটি পুনরায় কুণ্ডলী আকার ধারণ করে এবং জলের নীচে চলে যায়। এদের আকার ছোট, জলের নীচে যে সমস্ত গাছগাছালি জন্মে ও বেড়ে উঠে—কেবলমাত্র তারাই প্রত্যক্ষভাবে পরাগযোগের সহায়তা করে।

(ঘ) পতঙ্গপরাগী—পতঙ্গপরাগী ফুলের আকার একটু বড় হয়। কারণ কীটপতঙ্গ যেন সেই ফুলের মধ্যে ঢুকতে পারে। এদের ফুলের রঙ হয় উজ্জ্বল ও বিভিন্ন বর্ণের, যেন দূর থেকে রঙ দেখে এই ফুল কীটপতঙ্গ চিনতে পারে। অনেক ফুল সুগন্ধি হয়। অনেক ফুলে সুমিষ্ট রস থাকে। আবার আলু পোস্ত, কপি প্রভৃতি ফুলে খাদ্যের মাধ্যমে সুমিষ্ট রস জন্মে। অর্কিড গাছের ফুল রঙ্গীন আর এই ফুলের মধ্যে থাকে মধু ও পরাগ সমষ্টি। এই সমস্ত খাদ্য কীটপতঙ্গও খুব ভালবাসে। সুতরাং পাতার রঙে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ উড়ে এসে মধুর লোভে ফুলের উপর বসে পড়ে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আকণ্ঠ মধু পান করতে পারে ততক্ষণ সে গুন্ গুন্ করে ফুলে উড়ে বেড়ায়। এই ফুলে ফুলে মধু আহরণের সাথে সাথে সে এদের পরাগযোগ ঘটিয়ে থাকে। নানারকম ফুলে নানারকম আকর্ষণ করবার পদ্ধতি আছে। ঝুমকোলতা ফুলের লম্বা উপাঙ্গ দেখে পতঙ্গ চিনতে পারে যে সেখানে মধু পাওয়া যাবে। কতকগুলি গাছ আছে যাদের ফুল খুব ছোট এবং ছোট কীটপতঙ্গ তারদিকে আকৃষ্ট হয়। যে সমস্ত গাছের পাতা উজ্জ্বল সে সমস্ত

গাছের ফুল বা মঞ্জরীপত্র আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে থাকে। ডুমুরের ফুলে পরাগযোগ ঘটায় পিপীলিকা।

পুষ্পমাত্রই কীটপতঙ্গ আকর্ষণ করে। প্রাণী বা গাছগাছড়া সবই পরিণত বয়সে সুন্দর হয় দেখতে। ফুলের সৌন্দর্য বিকশিত হয় পাপড়ির বিচিত্র রঙের মাধ্যমে। এই পাপড়ি পুংকেশর ও গর্ভকেশরের মিলন ঘটাতে সাহায্য করে।

বিপরীত ও স্বপরাগযোগের পার্থক্য—(১) বিপরীত পরাগযোগে যে বীজ উৎপন্ন হয় সে বীজ বেশ সুপুষ্ট। বিশেষতঃ কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে যে বীজ উৎপন্ন হয় সে বীজ খুবই ভাল। এই বীজ থেকে যে চারা হয় সে গাছ বেশী ও বড় ফল দেয়।

(২) বিপরীত পরাগযোগ প্রভাবে যে বীজ তৈরী হয় সে বীজের চারা বিরূপ বা অনুপযোগী জলবহাওয়াতে ভালভাবে বাড়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন আবহাওয়ায় নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পাবে এবং প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়াই করার ক্ষমতা বেশী।

(৩) বিপরীত পরাগযোগের প্রভাবে বহুপ্রকার বীজের উৎপাদন হয়। মেণ্ডেল সূত্র অনুসারে দেখা যায় কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরণের চারা থেকে বিভিন্ন আকারের বীজ তৈরী হয়। এইভাবে বহু জাতের সৃষ্টি হয়।

কৃত্রিম প্রথায় গবেষণাগারে বিপরীত পরাগযোগ ঘটান যায়, কিন্তু সেখানে জল, বাতাস ইত্যাদি পরাগবাহক থাকায় সব সময় ঠিক ফল ফলে না।

স্বপরাগযোগের স্বপক্ষে বিশেষ কিছু বলবার নেই। এই গাছে উভলিঙ্গ ফুল থাকায় ফুল থেকে ফল ধরা স্বাভাবিক, কিন্তু বংশ পরম্পরায় বীজ বা ফল ছোট হয়ে আসে।

গর্ভাধান (Fertilisation)

একটি স্ত্রীজনন কোষ ও একটি পুংজনন কোষ এর মিলন-পদ্ধতিকে বলা হয় গর্ভাধান। পরাগযোগ-পদ্ধতিতে গর্ভরেণু পরাগদণ্ড থেকে গর্ভদণ্ডে

এসে পড়ে, পরাগদণ্ড ছেড়ে আসার আগে এক নিউক্লিয়েট, দ্বি-নিউক্লিয়েটে পরিণত হয়। বড়টিকে বলা হয় টিউব-নিউক্লিয়াস আর ছোটটিকে বলা হয় উৎপাদক নিউক্লিয়াস। পরাগদণ্ডে রস নিষ্কাষণ হলে রেণু অন্তত্বক ও বহিত্বক জেগে উঠে—খুব সরু একটি ফুটা দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি টিউব সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে ঐ নলটি বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ডিম্বাশয়ে এসে ঠেকে। এই রেণুনল (pollen tube) বাডবার সময় নিউক্লিয়াস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলিকে বলা হয় পুংজনন কোষ। রেণুনল বাড়তে বাড়তে ডিম্বনালা পার হযে নিউসেলাস পর্যন্ত আসে তখন এই নলটি ফেটে যায ও তার থেকে দু'টা পুংজনন কোষ বেরিযে পড়ে। একটি পুংজনন কোষ স্ত্রীজনন কোষের সঙ্গে এখানে এসে মিলে এবং জনন-পদ্ধতির কাজ সুরু হয। এরা তখন ডিম্বের আকার নেয ও তার চারিদিকে পাতলা দেওযালের সৃষ্টি করে—একে বলে ডিম্বাণু। তাবপর এখানেই গড়ে উঠে ভ্রূণ। অপর পুংজনন কোষ নল থেকে নির্গত হযে ভ্রূণ থলির মধ্যে আসে ও নিউক্লিযাসের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় জনন-কোষ দিযে বীজ তৈরী হয় না বরং কোষ-সৃষ্টিতে সাহায্য করে। পুংজনন কোষের এই রীতিকে বলা হয গর্ভাধান।

তারপর গর্ভাধানের কাজ চলতে থাকে ধাপে ধাপে, ডিম্বাণু ভ্রূণেতে পরিণত হয তখন এনডোসপার্ম নিউক্লিযাস, এনডোসপার্ম এ পরিণত হয। দুই মুখের যে দুইটি কোষ (antipodal) সে দু'টি নষ্ট হয। নিউসেলাস খালি হয়। অনেক বীজে শূন্য নিউসেলাস থেকে যায। অনেক বীজে এনডোসপার্মও শেষ হযে যায় যাহাতে শস্য থেকে ভ্রূণের উৎপত্তি হত্তে পারে। অনেক বীজে আবার এনডোসপার্ম থাকে, আস্তে বীজের মধ্যকার অন্য অংশগুলি গড়ে উঠে।

ফল

গাছের ফলটিকে বলা যেতে পারে পরিণত ডিম্বাশয়। পরাগযোগ ব্যতীত খুব কমই ফলের সৃষ্টি হয়। ফল তিন রকমের। (১) সহজ ও সরল রকমের

মটর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। (২) ফলের সমষ্টি, যেমন—চম্পা, কাঁঠালি চাঁপা। (৩) যেখানে পুষ্পবিন্যাস থেকে ফল গড়ে উঠে : যেমন—কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

(১) সহজ প্রকৃতিব ফল শুষ্ক হতে পাবে কিম্বা শাঁসালো হতে পারে। অনেক সময শুষ্কফল ফেটে গেলে তার থেকে বীজ বাইবে আসে। এদের মধ্যেও নানাপ্রকাবের ভাগ দেখতে পাওযা যায।

ফলের বিভিন্ন অংশ—ফলেব দু'টি অংশ। ফলত্বক (pericarp) ও বীজ ফলত্বক তৈরী হয ডিম্বকোষেব গাত্র থেকে আব বীজ ডিম্বকেব পূর্ণ অবস্থা। ফলত্বক শুষ্ক বা শাঁসালো হতে পাবে। যখন শাঁসালো হয তখন তিন বকমেব

(১) বহির্ফলত্বক (Epicarp)—ফলেব আবাবণীকে বলা হয খোসা।

(২) মধ্য ফলত্বক—(mesocarp) শাঁস অংশটিকে বলা হয, ইহা রসালো ও শাঁসালো, যেমন আম, জাম, ইত্যাদি।

(৩) অন্তফলত্বক (Endocarp)—নীচেব অর্থাৎ আঁটিব উপবেব আঁশ অংশকে বলে। অনেক জাযগায আবাব শক্ত হয়।

যব, গম, ধান এদেরকে এভাবে ভাগ করা যায না।

বিদারী ফল—অনেক সময দেখা যায কেবলমাত্র ফলত্বক ফেটে গেলে বীজ বার হযে আসে, একে বলা হয বিদারী ফল। আর অনেক ফল আছে তাদের কোন বিদারণ ঘটে না। ফল পচলে চাবা বাব হয। ইহাদিগকে বলে অবিদাবী ফল। ফল ফাটবারও একটা বীতি আছে। যেগুলি তাড়াতাড়ি ফাটে তাহাদিগকে বলে পার্শ্বসঞ্চাবী বিদাবণ—যেমন মোরগ ফুল। অনেক-গুলি ফুটা হয। একটা বা ততোধিক ফুটা দিযে বার হযে আসে তাকে বলে বন্ধ বিদারণ—পপি, ধুঁধুল। অনেক সময দেখা যায কপাটের মত ফেটে গিয়ে বীজ বার হযে আসে। যেমন—ঢেঁড়স।

গর্ভপত্রী ফলের বিদারণ কিন্তু অন্য রকমের। গর্ভপত্রের সংযোগ হলে

ফেটে যায়। একে বলা যায় সন্ধি বিদারণ। সন্ধি বিদারণ আবার দু'রকমের।

(১) পৃষ্ঠ-সন্ধি বিদারণ—মাঝখান থেকে ফেটে যায়—যেমন, কড়াইশুঁটি।

(২) বক্ষঃ-সন্ধি বিদারণ—বুকের মাঝখান থেকে ফেটে যায়। যেমন, আকন্দ।

ফলের শ্রেণীবিভাগ—ফল তিন রকমের (১) একক ফল (২) গুচ্ছিত ফল (৩) যৌগিক ফল, অবিদারী ফল (শাঁসালো)।

সমজাতীয় গ্রন্থন—সমস্ত অংশই শাঁসালো। যেমন—বেগুন, পেঁপে।

অসমজাতীয় গ্রন্থন—বাইরের ভাগ শক্ত বা চামড়ার মত হয়--যেমন কমলালেবু, ফলের বাইরের অংশ নরম—আম, কুল। ফলের মাঝখানে গর্ভপত্র আধাশক্ত—যেমন আপেল।

শুষ্কফল—অবিদারী—সাধারণতঃ এক থেকে দুটি বীজ থাকে। যেমন মাধবীলতা।

ফলের কাজ—ফলের প্রধান কাজ ফল থেকে বীজের সৃষ্টি এবং বীজের প্রধান কাজ গাছের বংশ রক্ষা করা। যে গাছের বীজ সেই গাছের নিকটে মাটিতে পড়ে তবে তার চারা পুষ্টি লাভ করতে পারে না। এদের সংখ্যা বেড়ে গেলে মাটিতে যে খাদ্য থাকবে সেই একই খাদ্য নিয়ে সব গাছের মধ্যে টানাটানি পড়ে যাবে। তার ফলে বৃক্ষ জগতে ভীষণ মারামারি লেগে যাবে। কেবল যারা সবল ও সতেজ তারাই বাঁচতে পারবে, অন্যগুলি শুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়বে।

বিভিন্ন পন্থায় গাছের বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস. জল ও অন্যান্য প্রাণী বীজ ছড়াতে সাহায্য করে। কতকগুলি বীজ আছে যারা আকারে ছোট এবং অনায়াসে বায়ু কর্তৃক বর্ধিত হয়। একস্থান থেকে অন্য স্থানে অনায়াসে যেতে পারে। এদের ফলের চারায় অনেক সময় কাঁটা লেগে থাকে। ফলে প্যারাচুটের মত উড়ে গিয়ে অন্য

স্থানে পড়তে পারে। ছাগলবাটী বীজের গায়ে কাঁটার মত থাকে। সজিনার বীজ চ্যাপ্টা ও ডানার মত থাকে। মাধবীলতা গাছের বীজেরও ডানা বার করা থাকে। যার ফলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে আশপাশে উড়ে গিয়ে পড়তে পারে।

অনেক ফলের গায়ে কাঁটা থাকে তার ফলে কোন প্রাণীর গায়ে লেগে দূরে চলে যেতে পারে। যেমন চোরকাঁটা। আপেল, টোমাটো, আম প্রভৃতি ফল দেখতে খুব সুন্দর হয়। ফলে বাদুড়, পশুপক্ষী ও কাঠবিড়ালী এটাকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় অনেক প্রাণী ফল খেয়ে ফেলে পরে যখন মলের সঙ্গে আবার বীচিটা বেরিয়ে আসে তখন বীজ সঞ্চিত থাকে। যেখানে পড়ে সেখানে চারা বার হয়। খেজুর, জাম ইত্যাদি। এবিষয়ে মানুষ কম সাহায্য করে না। ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর আগে কচুরীপানা ছিল না। শুধু ফুল মনে করে কোন ভদ্রলোক সুদূর দেশ থেকে এই দেশে নিয়ে এসেছিলেন। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে সারা ভারতে ছেয়ে গেছে।

কতকগুলি ফল আছে যারা আপনা থেকে ফেটে যায় এবং চারিদিকে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন দোপাটি। অনেক বীজ আছে যারা জলকণার সাহচর্যে এসে পরে ফেটে যায়। সমুদ্রের বা নদীর চরে যে সমস্ত গাছ হয় তাদের ফল নদীর জলের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। সে সমস্ত বীজের অবশ্য জলে ভাসবার ক্ষমতা থাকে। যেমন- পদ্মফুল।

বীজ ও বীজের গঠন—পৃথিবীর সারা উদ্ভিদকে ভাল করে লক্ষ্য করে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রধানতঃ দুরকমের। (১) সপুষ্পক উদ্ভিদ (Phanarogam), (২) অপুষ্পস উদ্ভিদ (cryptogam)।

সপুষ্পক ফুল দু'রকমের গুপ্তবীজি (Angiosperm) ব্যক্তবীজি (gymnosperm) গুপ্তবীজি বীজগুলি গর্ভপত্র দিয়ে ঢেকে রাখে। ব্যক্তবীজি বীজকে গর্ভপত্র দিয়ে সম্পূর্ণ আটকে রাখে না। বীজের বাইরে একটি ত্বক থাকে তাকে বলে বীজত্বক (seedcoat) এর দুটি দিক আছে। বাইরের দিকটাকে

বলে বহিত্বক (Testa) আর ভিতরের দিকটাকে বলে অন্তর্ত্বক (tegmen)। খুব ভালভাবে দেখলে দেখা যায় এই বীজের এক জায়গায় একটু টোল খেয়েছে, তাকে বলে hilum বা নাভিচিহ্ন।

বীজের ত্বক সরালে দুটি শাঁসাল অংশ দেখতে পাওয়া যায় একে বলে শাঁস। এই শাঁসেব সংলগ্ন থাকে ক্ষুদ্র শিশুটি। যার থেকে চারা বার হবে।

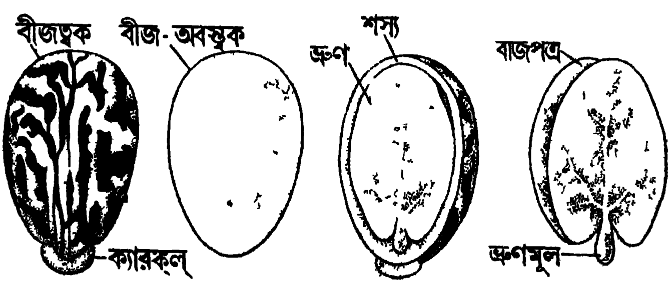
বীজ ভাঙ্গলে কখনও দু'টি ভাগ কখনও বা একক থাকে। এর একটিকে Cotyledon বলে।

(১) একবীজপত্রী (monocot)—যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি।

(২) দ্বিবীজপত্রী (Dicot)—ছোলা, মটব, শিম ইত্যাদি।

এই বীজপত্রেব মাঝখানে একটি সরু দণ্ডেব সহিত ভ্রূণ অবস্থিত থাকে। অঙ্কুবিত হলে এই বীজপত্র থেকে গাছ খাদ্য সংগ্রহ কববে।

বীজপত্রেব মধ্যে যাদেব খাদ্য সঞ্চিত থাকে তাকে বলে অসস্থল (Exalbuminous) আব যখন নির্দিষ্ট শস্যেব মধ্যে খাদ্য মজুত থাকে তখন বলা হয সস্থল (Albuminous)।

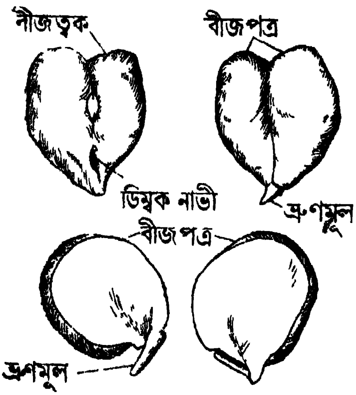


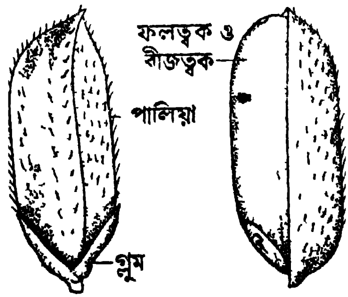
মটর বীজ—বহিরাকৃতি গোলাকার বাইরের ত্বক পাতলা ও আধাস্বচ্ছ। ডিম্বক রন্ধ্র ও নাভী পাশাপাশি। ভ্রূণের দুটি শাঁসালো বীজপত্র। অক্ষের উপরিভাগে ভ্রূণ মুকুল, নীচের দিকে ভ্রূণ মূল। বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে সে কারণ অসস্থল। ভ্রূণ মূল বীজপত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

রেড়ি—এর আকার ঠিক গোলাকার নয়, বলা যেতে পারে ডিম্বাকার। শস্য থাকে সেজন্য বীজকে সস্তল বলা যায়। এর চারিদিকে থাকে পাতলা আবরণী তাকে বলে শস্যাবরণী। এই আবরণী সরালে এবং ভাগ করলে দুটি সমান অংশে বিভক্ত হয়।

রেড়ির বীজের সঙ্গে মটব বীজের তফাৎ এই যে, শাঁসের মধ্যে দুটি জিনিষ আছে, একটি বীজপত্র অন্যটি এলবুমিন।

ধান-চাল—ধানের খোসা ছাড়ালে চাল বার হয়। ধানের একটি মাত্র



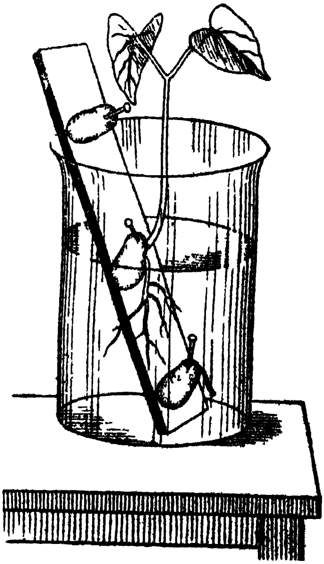


বীজপত্র। এর বাইরে যে শক্ত আবরণ থাকে এটা ফলের কোন অংশই নয়। এর ৪টি ভাগ। গোড়ার কাছে থাকে ২টি অংশ একে বলে গ্লুম। যদি বহিরাবরণ ভেঙ্গে শাঁস বার করা যায় তবে দেখা যায় এর ভ্রূণ সীমান্তে অবস্থিত রয়েছে। এখানে বহিরাবরণও ১ কক্ষ মিলে একটিমাত্র আবরণের সৃষ্টি করেছে। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে ২।৩ দিনেব মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়। ৬ দিনের মধ্যে পাতা সবুজ আকার ধারণ করে।

বীজের দুটি অংশ ও এলবুমিনহীন মটর, কলাই, ছোলা ইত্যাদি। একে বলা হয় দ্বিবীজপত্রী এলবুমিনহীন। আর এক প্রকার বীজ আছে যাদের বীজপত্র থাকে আবাব এলবুমিনও থাকে। যেমন রেড়ি ইত্যাদি। একে

বলা হয় দ্বিবীজপত্রী এলবুমিন। আর এক জাতীয় বীজ আছে যাদের একটিমাত্র বীজপত্র। যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি। সুপ্তশিশু গাছকে ঘুম থেকে জেগে বাইরে আসাকেই বলা হয় অঙ্কুরোদ্গম। বীজে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ জল থাকে। এই জলের প্রভাবেই বীজের মধ্যে প্রাণ ঘুমিয়ে থাকে। এদের ঘুম ভাঙ্গাতে বা অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিষ —যথা উপযুক্ত পরিমাণ জল, উত্তাপ ও অক্সিজেন। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য এর খুব বেশী প্রযোজন নেই।

জল—বীজে জল পড়লে বীজটা ফুলে ওঠে। এইটাই হলো অঙ্কুরোদ্গমের প্রথম সোপান। ফলে বীজের যে বহিরাবরণ থাকে সেটা নরম হয় ও সহজেই ফেটে যেতে পারে। প্রোটোপ্লাজম ঘুম থেকে জেগে উঠেই কাজ সুরু করে। প্রথমেই এনজাইম ত্যাগ করে। এই এনজাইম বীজপত্রে যে সমস্ত খাদ্য জমানো থাকে তাকে তরল ও সহজ পাচ্য করে যাতে এমব্রাইও এগুলি খেতে পারে। এব ফলে সহজেই এখানে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারে ও গাছের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হয়।

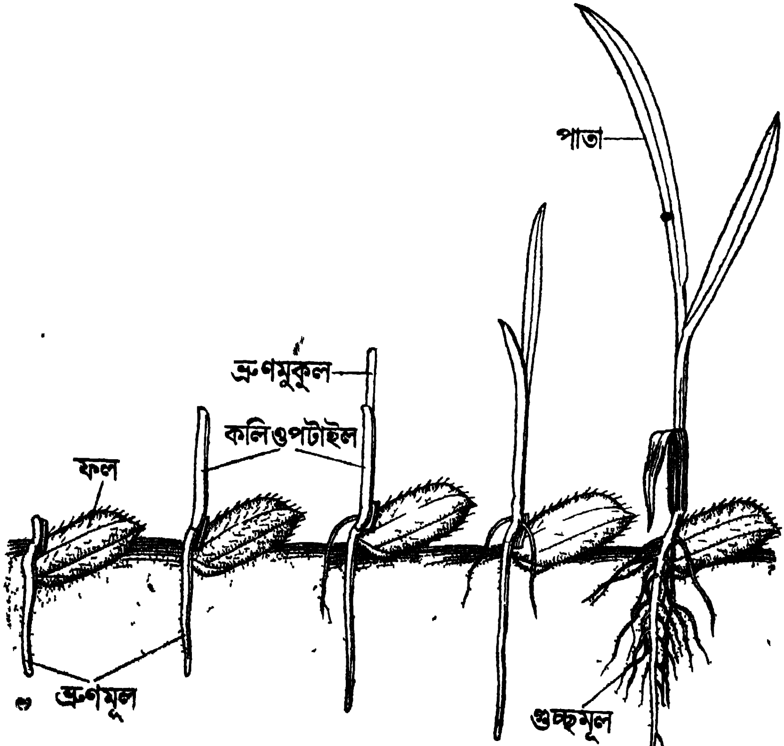


অক্সিজেন—শুষ্কবীজ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে খুব কম। অঙ্কুরোদ্গমের সাথে সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বাড়তে থাকে সুতরাং অক্সিজেনের প্রযোজন হয।

একটি কাঁচের বিকারে অর্ধেক জল ভর্তি করে একটি কাঠের শলা জলের মধ্যে অর্ধেক ডুবিয়ে দেওয়া গেল। তারপর তিনটি বীজ লইয়া একটিকে জলের তলায় কাঠের উপর অন্যটিকে কাঠের উপর যেখানে জলের স্তর শেষ হযেছে এবং অপরটি বাইরে কাঠের উপর বসানো হলো।

দেখা যাবে যে যেটা মাঝখানে আছে সেটাই কেবলমাত্র উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে অঙ্কুর বার করেছে, অন্যগুলি করে নাই।

দ্বিবীজপত্রী বীজের অঙ্কুরোদ্গম—উপযুক্ত আবহাওয়াতে বীজ থেকে চারা বার হয়। প্রথমেই বহিবাবরণ ফেটে যায় ও শিকড়ের অংশটা



বেরিয়ে আসে। এটা বেরিয়ে নীচু মুখী হওয়ার সাথে সাথে বীজপত্র দুটি সোজা হয়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে দুভাগ হয়ে যায়। বীজের কাণ্ডের অংশকে বাড়তে দেয়। বীজের মধ্যে যে কাণ্ডের আগা থাকে সেখান থেকে

দুটি বীজপত্রের মিলন রেখার মাঝখানে বীজ পত্রাধিকাণ্ড বা এপিকটিল থাকে। এপিকটিল চাপ দিয়ে কাণ্ডটা বাড়িয়ে দেয়। তখনও পর্যন্ত শিকড় দিযে গাছ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। বীজপত্র থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। বৃদ্ধির সাথে সাথে বীজপত্র হলদে আকার ধারণ করতে থাকে। পরে সম্পূর্ণ হলদে হয়ে চুপসে যায়। তারপর একদিন গাছের গা থেকে পড়ে যায়। এপিকটিলের চাপে গাছ বাড়তে থাকে ও মাটির উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এ ধরণের অঙ্কুরোদ্গমকে মৃদবর্তী বা হাইপোজিযাল বলে।

ভুট্টা—প্রথমেই বীজ কোষটা ফেটে যায। ফেটে যাওয়ার পর শিকড় যে দিকেই থাকুক না কেন নীচের দিকে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে গাছের কাণ্ডের অংশ উপর দিকে উঠতে থাকে। তখন এর মাথার ঢাকনি থাকে (Sheath)। এর ২।৩ দিন পরে ঢাকনিটা ফেটে যায়। চারা বার হওযার পর প্রায ৮ দিন পর্যন্ত বীজপত্র এদের খাদ্য যোগায। অঙ্কুরোদ্গমের পদ্ধতি ভুট্টার ক্ষেত্রেও মাটির নীচে হয (hypogeal)। ধানেরও ঠিক এমনিভাবে বীজ থেকে চারা বার হয়।

বীজপত্রের কাজ—এলবুমিনহীন বীজে, বীজপত্র খাদ্য জমা করে রাখে। আর সহ এলবুমিন বীজে চারা গাছকে খাদ্য সংগ্রহ করায। এভিন্ন যে সমস্ত গাছ মাটির উপর জন্মায তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পাতার কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে এরাই শিকড ও কাণ্ডকে মাটির তলে ও মাটির উপরে উঠতে সাহায্য করে।

একবীজপত্রের ও দ্বিবীজপত্রের পার্থক্য

দ্বিবীজপত্র	একবীজপত্র
১। দুটা বীজপত্র আছে।	১। একটিমাত্র বীজপত্র আছে।
২। শিকড় বা কাণ্ড বীজের সীমান্তে থাকে।	২। শিকড় বা কাণ্ড বীজের পাশে থাকে।

দ্বিবীজপত্র	একবীজপত্র
৩। শিকড় বা কাণ্ডের আগায় কোন ঢাকনি থাকে না।	৩। শিকড় বা কাণ্ডের আগায় ঢাকনি থাকে।
৪। সহ এলবুমিন ও এলবুমিনহীন হতে পারে।	৪। সাধারণতঃ সহএলবুমিন।
৫। অঙ্কুরোদ্গম মাটির নীচে বা উপরে হতে পারে।	৫। কেবলমাত্র মাটির নীচে অঙ্কুরোদ্গম হয়।
৬। মূল শিকড় থেকে অন্য শিকড় বেরিয়ে আসে।	৬। মূল শিকড় মাটির তলে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখান থেকে অসংখ্য শিকড় বার হয়।

বীজের মধ্যে প্রাণ থাকে কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। এ ঘুমেরও একটি নির্দিষ্ট কাল আছে। আমন ধান প্রভৃতি যদি অনেক দিন গুদাম ঘরে ফেলে রাখা হয় তবে তার চারা বার হবে না। আবার কতকগুলি বীজ আছে তাদের নির্দ্দিষ্ট সময় না হলে সেই বীজ থেকে চারা বার হয় না। কতকগুলি বীজ আছে তাদের পরিপূর্ণতা পেলেই বীজ থেকে চারা বার হয়। বীজের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি থেকে অঙ্কুরোদ্গমের সময় পর্যন্ত যে কাল বীজের পক্ষে সেই কালকে 'বিশ্রামকাল' বা resting period বলা হয়।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, যে গাছ সতেজ হয়ে বেড়ে উঠেছে—তার ফলন ও ফল ভাল হয়েছে এবং তার বীজও ভাল হয়। সুতরাং পরে যখন ঐ বীজ থেকে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকে চারা বার হয় তখন সে চারা সতেজ ও সবল হয়। কিন্তু কোন জীর্ণ-শীর্ণ রোগাক্রান্ত গাছের যে বীজ হয় সে বীজ ভাল হয় না। তা বাদে দেখা যায় সে চারা সতেজ ও সবল হয় নি। সুতরাং বীজের যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত। কোন ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে এদের রক্ষা করলে বীজগুলি ভাল থাকে। যদি ভালভাবে রক্ষা

করা না যায় তবে এদের জীবনীশক্তি কমে যায়। ঠাণ্ডা জায়গায় যদি উপযুক্তভাবে বীজ রক্ষা করা যায় তবুও বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কতকগুলি বীজ আছে যাদেরকে অল্পদিন রক্ষা করা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে সমস্ত বীজের উপরে শক্ত খোলা আছে তাদেরকে অনেকদিন গুদামে রাখলেও তাদের জীবনী শক্তি (viability) নষ্ট হয় না।

চাষীদের অনেক সময় জানার প্রয়োজন হয় বীজের সব চারা বার হবে কিনা। কারণ সেই অনুযায়ী তাকে প্ল্যান করতে হবে। বাইরে থেকে দেখে এদের কিছু বোঝা যায় না। এর জন্য সব থেকে ভাল হয় মাটিতে গুণে বীজ ছড়িয়ে অঙ্কুরোদ্গম দেখে ও গুণে নিতে হবে। এ ভিন্ন ব্লটিং কাগজ জলে ভিজিয়ে তার উপর কিম্বা কাঠের গুঁড়ার উপর বীজ গুণে ছড়িয়ে অঙ্কুরোদ্গম গুণে নেওয়া যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

কোষ ও তার বৃদ্ধি

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope)

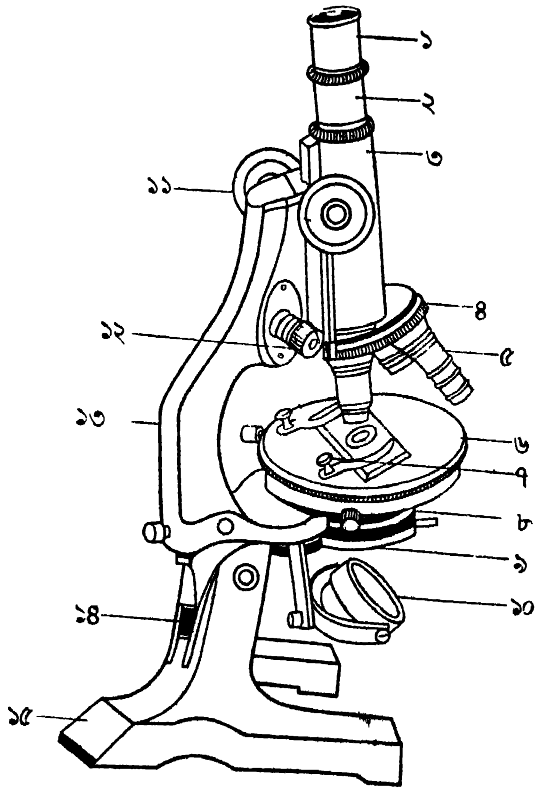
যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন ছোট জিনিষকে বড় করে দেখা যায় তাকে বলা হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র। অনেক জীবাণু আছে যাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না। এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদিগকে দেখা যায়। অণু = ক্ষুদ্র, বীক্ষণ = বি—ঈক্ষ্ + অনট্—বিশেষরূপে দেখা।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান অংশ হলো এর লেন্স। এই কাঁচের যন্ত্র মারফৎ কোন জিনিষকে বড় করে প্রতিফলিত করা হয়। যে জিনিষকে পরীক্ষা করতে হবে তাকে স্লাইডের সাহায্যে ষ্টেজ বা টেবিলের উপর রাখা হয় এইবার যে সীসা বা আয়না থাকে তার সাহায্যে টেবিলের নীচের একটি ছিদ্র মারফৎ এই স্লাইডের উপর আলোকপাত করা হয়। এইবার এর উপর লেন্স ধরা হয়।

একটি লেন্স থাকে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন আর একটি থাকে কম শক্তি-সম্পন্ন। এরা একটা স্বয়মান নালীতে যুক্ত থাকে। প্রথমেই এই নালীটিকে নামিয়ে ঠিক যেখানে স্লাইড আছে সেখানে দেওয়া হলো। এইবার একটি চোখ বন্ধ করে সীসার (eye piece) এর উপর স্থাপন করে দেখতে হবে। যদি ঝাপসা হয় তবে যে পরিমাণ নির্ণয়ক (adjustment Screw) থাকে তাহাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু-নীচু করে ঠিক করতে হয়। কলিমেটার নালীকে এমনভাবে নামাতে হবে যেন তার নীচে স্লাইডকে ধাক্কা না মারে। এ ভিন্ন ইহাতে দুটি বিশেষ লেন্স থাকে। একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অন্যটি অল্প শক্তি-সম্পন্ন, প্রথমে অল্প শক্তিসম্পন্ন লেন্স দিয়ে দেখা উচিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নিম্নলিখিত অংশগুলি আছে—

স্থাপনা বা বেস—(১৫ + ১৪) অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ঘোড়ার ক্ষুরের মত একটি ভারী লোহার দণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। একে যন্ত্রের ভিত্তি বা স্থাপনা বলে। সমগ্র যন্ত্রটি বেশ ভারী। সুতরাং এটি এমনভাবে তৈরী হয় যেন সমগ্র যন্ত্রটি এর উপব দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।



স্টেজ বা টেবিল—(৬) মূল দণ্ডের (Piliar) কাছে একটি গোলাকার টেবিলাকৃতি থাকে। এর মাঝখানে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে আর এই ছিদ্রের পাশে থাকে দুটি আঁটবার ক্লীপ।

আলোক নিয়ামক বা ডায়াফ্রাম—(৯) ঠিক স্টেজের নীচে গোলাকার একটি আলোক নিযামক থাকে ; এর সাহায্যে আলোকপাত কম-বেশী করা হয।

সীসা বা মিরর—(১০) ডাযাফ্রামেব নীচে থাকে সীসা। এমনভাবে যুক্ত থাকে যে ইচ্ছামত একে ঘুবান যায। যেন ঘুরিযে ঠিক ডাযাফ্রামের মাঝখান দিয়ে স্টেজের শ্লাইডের উপব আলো পড়ে।

মূল দণ্ড (arm)—(১৩) যে দিকে টেবিল থাকে তাব অপব দিক থেকে ভারী ইস্পাতের প্রায অর্ধচন্দ্রাকাবে একটি দণ্ড যুক্ত থাকে।

স্বয়মান বা নালী (**draw tube**)—(৩) উপবেব দিকে আধা-গোলাকার দণ্ডটি যেথানে শেষ হযেছে তাব সঙ্গে টেবিলের দিকে এই নালীটি যুক্ত থাকে। একে একটি নিযামক দিযে নামানো উঠানো যায।

আইপীস্—(১) এর উপরে থাকে আইপীস। এইটি একটি খুব শক্তিশালী লেন্স। এটা ঠিক চলমান নালীব উপবে যুক্ত থাকে।

নোজপীস্—(৫) কলিমিটাব নালীর নীচে যুক্ত থাকে ; এতে দুইদিকে দুটো লেন্স থাকে, সুবিধা অনুযাযী ঘুরিযে ঠিক কবতে হয।

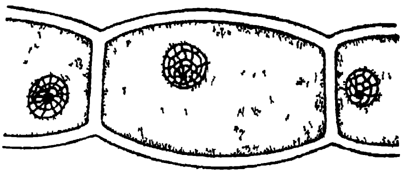
উদ্ভিদের কোষ ও তার গঠন

(Plant cell & their structure)

খালি চোখে গাছেব ভিতরটা দেখা যায় না। এব জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রযোজন হয। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যায বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন আকারের কোষ রযেছে। প্রতিটি কোষ, প্রাচীর দিযে ঘেরা। এই ঘেরা এবং তার অন্তর্বর্তী স্থান নিযে কোষ সৃষ্টি। গাছের দেহ যদি আড়াআড়িভাবে কাটা যায় তবে দেখা যায গাছের দেহ কোষের সমন্বযে তৈরী হযেছে। কোষের চারিদিকের এই প্রাচীরকে বলা হয কোষপ্রাচীর (Cell-wall)। এর মাঝখানে আধা পবিষ্কার—জেলীর মত পদার্থ থাকে

তাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম (Proto-প্রথম plasma-জীবন)। যে সমস্ত গাছের দেহ একটিমাত্র কোষে তৈরী তাদেরকে বলা হয় এককোষী গাছ। যেমন ঈষ্ট, বীজাণু ইত্যাদি। এই একটিমাত্র কোষের মধ্যে এদের জীবন বদ্ধ। এতে এদের শ্বাসকার্য, বৃদ্ধি, খাদ্যগ্রহণ সব কিছুই চলে। এ ভিন্ন আছে বহুকোষী গাছ। একের বেশী কোষ সমন্বয়ে গাছ বেড়ে উঠলে তাকে বলা হয় বহুকোষী।

প্রোটোপ্লাজম কি?— প্রোটোপ্লাজম হলো গাছের প্রাণ। যতদিন গাছ জীবিত থাকে ততদিন এদের কাজ থাকে। এদের কাজ শেষ হলে গাছ মরে যায়। আর কোষপ্রাচীর হলো এর সীমা।



অনেকটা চট্‌চটে, অর্ধস্বচ্ছ, জেলীর মত পদার্থ এই প্রোটোপ্লাজম। এর কোনো রঙ নাই বা গন্ধ নাই। রাসায়নিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জল। অন্যান্য পদার্থ খুবই কম। এতে বিভিন্ন প্রোটিন ও শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে। যদি বাইরে থেকে কোন বৈদ্যুতিক প্রবাহ, অম্লতা (acid) ও উত্তাপ এর সংস্পর্শে নিয়ে আসা যায় তবে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ডিম গরম করলে যেমন সাদা অংশ শক্ত হয়ে যায় তেমনি ইহাও উত্তপ্ত করলে ঘনীভূত হয় (coagulation)।

প্রোটোপ্লাজম একটি মিশ্র যৌগিক পদার্থ। এর সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। অম্ল, উত্তাপ প্রভৃতি রাসায়নিক ক্রিয়া করলে প্রোটোপ্লাজম মরে যায় সুতরাং সঠিক রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যায় না। মোটামুটিভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া যায়—

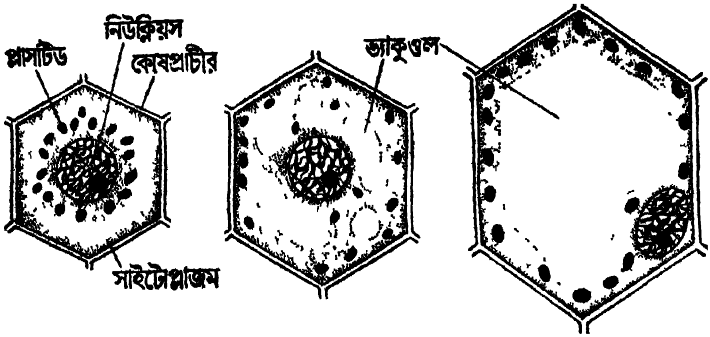
অঙ্গার	৫০—৫৫%	হাইড্রোজেন	১৯—২৪%
অক্সিজেন	৭—৬ %	নাইট্রোজেন	১০—১৭%

প্রোটোপ্লাজম উত্তপ্ত করলে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা ছোট আকার নিয়ে কোষের মধ্যস্থানে ঠাঁই করে নেয়। ইহা ক্ষার জাতীয়।

প্রাণীমাত্রেরই সর্ব কাজের মূলাধার প্রোটোপ্লাজম। প্রাণিদেহে সমুদয় রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করায়। দেহকে সতেজ রাখে, শক্তির বিনিময় ঘটায়।

প্রোটোপ্লাজমের গুণ ও ধর্ম—আগেই বলেছি কোষ প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ। আর এই কোষের মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম। সুতরাং এই কোষ, প্রাচীর ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। এই কোষের সীমানার মধ্যে চলমান থাকে। একে বলে cyclosis আবর্তন। যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা হয় তখন দেখা যায—প্রোটোপ্লাজম কক্ষে ঘুরছে। এর থেকে বলা যেতে পারে প্রোটোপ্লাজম সর্বদাই চলমান।

ঠিক কোষপ্রাচীরের গা ঘেঁসে একই মুখে বা একই দিকে ঘুরে চলেছে.



একে বলা যেতে পারে প্রবাহ গতি। যেমন—পাতাঝাঁঝি, পাঠাশেওলা। আবার অনেক সময় দেখা যায় প্রোটোপ্লাজম কোন বিশেষ গতিপথে গমনাগমন করছে না। আঁকাবাঁকা পথে চলছে। তখন একে বলা হয়—আবর্তন

গতি। জলজ গাছে থাকে প্রবাহ্ গতি আর স্থলজ গাছে থাকে আবর্তন গতি।

নিউক্লিয়াস—নিউক্লিযাস শব্দ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি সকল কাজের ও প্রেরণার মূল হলো নিউক্লিযাস। একে বলা যেতে পারে শক্তির মূল উৎস। কোষের মধ্যে কেন্দ্রে এর অবস্থান। আবার একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় কেন্দ্রের মাঝখানটা একটু বেশী ঘোলাটে—একে বলা হয় নিউক্লিয়োলাস্। নিউক্লিযাসের ভিতরে জেলীরমত পদার্থ থাকে তাকে বলা হয় নিউ-ক্লিওপ্লাজম।

প্লাসটিড—কোষের মধ্যে নিউক্লিযাস ব্যতীত আবও কতকগুলি বর্ণহীন বা ঘোলাটে অংশ দেখতে পাওযা যায় ঐগুলিকে বলা হয় প্লাসটিড। পূর্বতন প্লাসটিড বিভক্তি-করণের ফলে নূতন প্লাসটিডের স্থষ্টি হয়। প্লাসটিড দু'রকমের। লিউকোপ্লাষ্ট ও এমাইলোপ্লাষ্ট। মাটির তলায় যে সমস্ত গাছের অংশ থাকে সেখানে পাওযা যায বর্ণহীন লিউকোপ্লাষ্ট, আর স্থলজ গাছের যে অংশ মাটির উপরে থাকে সেখানে পাওযা যায় রঙ্গীন ক্লোরোপ্লাষ্ট।

বর্ণবিহীন যে প্লাসটিড বা লিউকোপ্লাষ্ট--যাদেরকে গাছের মাটির তলায পাওযা যায় সেগুলি যদি কোনমতে সূর্যের আলোকে আসে তবে তারা নিজেরা ক্লোরোফিল তৈরী করবে এবং ক্লোরোপ্লাষ্টে পরিণত হবে।



প্রোটোপ্লাজমেব মধ্য থেকে নিউক্লিযাস ও প্লাসটিডের অংশ বাদ দিলে যে অংশ থাকে তাকে বলা হয সাইটোপ্লাজম। যখন কোষের প্রথম অবস্থা থাকে তখন কোষ জুড়ে সাই-টোপ্লাজমে ভর্তি থাকে। গাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষেরও আকার বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু সাইটোপ্লাজমের বৃদ্ধি হয় না। ফলে এর উপর যেমন টান পড়ে তেমনি ছোট কোষ ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। পরে আবার ঐ সমস্ত ছিদ্রগুলি যখন বড় ছিদ্রের সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় ভ্যাকুযোল।

- কোষ
  - প্রোটোপ্লাজম
    - প্ল্যাসটিড
    - নিউক্লিযাস
    - সাইটোপ্লাজম
      - লিউকোপ্লাষ্ট
      - ক্রোমোপ্লাষ্ট

এছাড়া কোষের মধ্যে নানা প্রকার নির্জীব পদার্থ থাকে। তার মধ্যে প্রধান হলো শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। গাছের দেহের মধ্যে বিভিন্ন রাসাযনিক ক্রিয়ার ফলে ইহারা তৈরী হয়। এ ভিন্ন পাওযা যায শর্করা জাতীয পদার্থ।

শ্বেতসার জাতীয পদার্থ (Starch grain)—ফরমূলা $(C_6H_{10}O_5)n$।

ইহা মাটির নীচে কাণ্ডে বেশী জমা থাকে। যব, ধান ও গমে প্রচুব পরিমাণ থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিযে দেখলে মনে হয স্তরের পর স্তর সাজানো রযেছে, এর কারণ—এর মধ্যে জলকণা থাকে এবং এইভাবে স্তরীভূত হতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অঙ্গার, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন থাকে।

শর্করা—ইহা শ্বেতসার জাতীয কিন্তু খেতে মিষ্টি। এরা সহজে জলে দ্রবণীয়। গাছের দেহেতে নানা রকমের শর্করা পাওযা যায। একটিকে বলে ইক্ষু জাতীয শর্করা অন্যটির নাম দ্রাক্ষা শর্করা। নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তিত হয়। তখন এর থেকে শক্তি নিষ্কাশিত হয় (energy)।

সেলুলোজ—পরিমাণে কম থাকে। সবুজ সার তৈরীর জন্য যখন গাছ মাটিতে মিশিয়ে দেওযা হয় তখন এর থেকে সার তৈরী হয।

প্রোটিড কণা—এতে নাইট্রোজেন জমা থাকে। সাধারণতঃ O_2, H_2, CO_2 থাকে, অনেক সময় অল্প পরিমাণ গন্ধক ও ফসফরাস দেখতে পাওয়া যায়, ইহা উদ্ভিদের একটি বিশেষ খাদ্য। তৈল বীজে এর পরিমাণ একটু বেশী থাকে। এছাড়া এই কোষের মধ্যে থাকে কিছু পরিমাণ ইনিউলিন, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ (fats and oil), সিষ্টোলিথ, এদের সবারই কিছু না কিছু কাজ থাকে।

কোষপ্রাচীর (Cell-wall)—কোষ মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজম এবং অন্যান্য পদার্থ ও ক্ষরিত বস্তু থেকে তৈরী হয। নূতন কোষ যেমন উৎপত্তি হয তেমনি তার চারিদিকে প্রাচীর তৈরী হবে সূক্ষ্ম হযে। প্রথমে থাকে ভারী কোমল ও নরম। তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং কোষকে শক্ত করে তোলে।

সাধারণতঃ কোষপ্রাচীর তৈরী হয সেলুলোজ দিযে, এর ঠিক রাসায়নিক ফরমূলা দেওযা যায না। সম্ভবতঃ ($C_6H_{10}O_5$). । প্রোটোপ্লাজম তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে কোষপ্রাচীর তৈরী সুরু হয। তখন এতে পেকটোজ থাকে। এর থেকে পেকটেট তৈরী হয। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রাচীর পেকটেট সেলুলোজ দিযে তৈরী হয। পর পর স্তর বাড়ে প্রাচীর পুরু হয। এর ভিতর দিককার স্তর থেকে লিগনিন ও মিউসিলেজ পরিবর্তিত হয। নানাবিধ রঙ তৈরীতে এর ব্যবহার হয।

কোষপ্রাচীরে কযেকটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে তাকে বলে প্লাসমোডিসাটা। এই ছিদ্রের মারফৎ ভিতরের সঙ্গে বাহিরে সংযোগ রাখে।

কোষপ্রাচীর স্তরের পর স্তর স্থিত হযে বাড়তে থাকে। যত উপরের স্তর হয়, তত পাতলা হযে আসে। সুতরাং তখন আর তাদের বাড়ার অবস্থা থাকে না। তখন প্রোটোপ্লাজম থেকে পুনরায় যে ক্ষরণ হয় তারা এই স্তরের নিকটে গিয়ে বর্সে এবং প্রাচীর বাড়াতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কেঁচো, আরশোলা, মশক ও মাছের আকৃতি ও জীবনী

(Study of external : Character and life history of Fish etc.)

প্রাণীবিদ্যা

পৃথিবীর সমুদয় সজীব প্রাণীকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি উদ্ভিদ বা গাছপালা অপরটি প্রাণী যেমন মানুষ, পশু, পক্ষী পোকামাকড় ইত্যাদি। পৃথিবীর মাটিতে, জলে ও বাতাসে প্রাণীরা বাস করে। পৃথিবীতে কত প্রাণী আছে তার সংখ্যা ঠিক করা কষ্টকর। কারণ জলের মধ্যে ও গভীর অরণ্যে যারা বাস করে তাদের তো গোনা যায় না। জলেতে কত রকমের মাছ আছে।

প্রাণীরা সাধারণতঃ দুই রকমের, এক রকম যাদের মেরুদণ্ড আছে, আর একরকম যাদের মেরুদণ্ড নেই। রুই, কাৎলা মাছ, মানুষ, গরু, ঘোড়া, সাপ, ব্যাঙ, পায়রা ও শালিক প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর দেহেতে মেরুদণ্ড আছে সেজন্য এদেরকে বলা হয় মেরুদণ্ডী ; আর চিংড়ি, কাঁকড়া, মশা, মাছি প্রভৃতি প্রাণীদের হাড় নেই, সে কারণে এদেরকে বলা হয় অমেরুদণ্ডী।

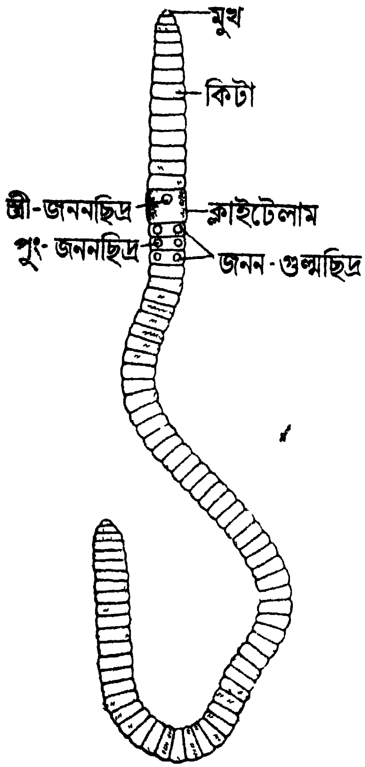
কোন প্রাণী আকারে বড় আবার কোন প্রাণী আকারে এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যায় না। হাতী দেখতে কত বড় আবার এমিবা দেখতে কত ছোট, খালি চোখে এদেরকে দেখাই যায় না। এরা, জলের সঙ্গে মিশে থাকে। জলের সঙ্গে পেটের মধ্যে গেলে পেটে আমাশয় রোগ হয। আর এক রকমের প্রাণী আছে যারা চলাফেরা করতে পারে না গাছের মত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি এগুলি সেই প্রাণীর

কঙ্কাল। জলেতে এক রকমের প্রাণী আছে যাদের দেহ মাংসাশী আর দেহেতে একটিমাত্র ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রপথে সেই প্রাণী খায় ও মলমূত্র ত্যাগ করে। যেমন জেলিফিস, হাইড্রা ইত্যাদি। আর এক রকমের প্রাণী আছে যাদেরকে বলে কৃমি। পশুদেহের যকৃতে বাস করে বলে এদেরকে বলে যকৃত কৃমি Helmenthes। মানুষের অন্ত্রে এক রকমের কৃমি বাস করে। ইহাদিগকে বলে ফিতা কৃমি। মানুষের দেহেতে এক রকম স্বচ্ছ গোল কৃমি বাস করে প্রায় সকল ছোট ছেলেপিলের পেটে এগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। কেঁচোর দেহেতে কোন হাড় নেই। গোল গোল আংটির মত পদার্থ একের পর একটি সাজান। এদের দেহে পুরুষ লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়ই থাকে। একরকমের প্রাণী আছে যাদের দেহ কাঁটা দিয়ে ঘেরা, যেমন সমুদ্রের তারা মাছ। এরা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারে না। এক রকমের প্রাণী আছে যাদের দেহে কোন হাড় নেই, গোলাকার পদার্থ সংযোগে একের পর একের সমন্বয়ে প্রস্তুত। শামুক জাতীয় প্রাণীর দেহ শক্ত আবরণে ঢাকা।

কেঁচোর জীবনকথা (ফেরিটিমা প্রজাতি)

কেঁচো মেরুদণ্ডী প্রাণী। কেঁচো মাটির তলায় বাস করে। গর্তগুলি প্রায় ১৮"-২০" মাটির নীচে পর্যন্ত যায়। কেঁচো আলো সহ্য করতে পারে না, তাই দিনের বেলায় মাটির তলায় গর্তের মধ্যে গিয়ে থাকে, শীত ও গ্রীষ্মকালে মাটির নীচে ৬'।৭' তলায় গিয়ে থাকে রাত্রিবেলায় খাদ্যান্বেষণে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। কেঁচো সারারাত ঘোরাফেরা করে সকালে যখন আবার গর্তের মধ্যে ঢোকে তখন কোন কাঁকর বা পাতার কুচি দিয়ে গর্তের মুখটা ঢেকে রাখে। সাধারণতঃ কেঁচোতে চর্বি ও শর্করা জাতীয় পদার্থ খেতে ভালবাসে। কেঁচো গর্ত খুঁড়ে নীচের মাটি উপরে তোলে ফলে মাটির পরিবর্তন সাধিত হয়। জীবন্ত কেঁচোকে পরীক্ষা করা যায় না কারণ কেঁচো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। একে স্পিরিটে ফেলে দেহ লম্বা করে পরীক্ষা করতে হয়।

এরা নিরীহ, কামড়ায় না। এরা গাছের পচা বীজ, পচা পাতা এবং পোকামাকড়ের ডিম খায়। সব সময় মাটিতে পচা খাবার পায় না, তার ফলে কিছু মাটিও খেয়ে থাকে। এরা সাড়ে তিন বছরের বেশী বাঁচে।



কেঁচোব দেহ লম্বা ও গোলাকাব। প্রায় ৭"।৮" লম্বা হতে পাবে। অগ্রভাগ সরু এবং ছুঁচালো ও পশ্চাৎভাগ বেশ মোটা হয়। কালো সাদা উভয় রঙের কেঁচো দেখতে পাওয়া যায়, গোযাল ঘরেব যেখানে গোবব ও গোমূত্র জমা কবা হয় সেখানে বেশী কেঁচো দেখা যায়। এদেব শবীব মসৃণ ও লম্বা আকাবেব হয়। পিঠেব দিককাব বঙ বাদামী ও একটু ঘন। একটু লক্ষ্য কবলে দেখা যায় এদেব দেহ গাঁটেব পব গাঁট পব পব সাজানোর মত, প্রায় ১০০ থেকে ১২০ পর্যন্ত গাঁইট থাকে। কেঁচোব দেহেব মাথাব দিককার অংশেব যেখানে এক স্থানের একটি গাঁট বেশী লম্বা তাব নাম ক্লাইটেলাম। এদেব সারা দেহে পাতলা, স্বচ্ছ আববণী দিয়ে ঢাকা থাকে একে বলে কৃত্তিকাবরণী। পিঠে একটা লম্বা কাল দাগ থাকে। গোলাকার খণ্ডগুলি একের পর আরেকটি পাতলা প্রাচীর দিয়ে সংযুক্ত।

কেঁচো অনায়াসে মাটির উপর ও নীচে চলাফেরা করতে পারে। কেঁচোর দেহের প্রত্যেক গোলাকার গাঁইটে রোম আছে। ঐ রোমের সাহায্যে কেঁচো চলাফেরা করে। ক্লাইটেলাম ও প্রধান গোলাকার পদার্থে ঐ রোম থাকে

নইলে আর সব গাঁইটে রোম দেখতে পাওয়া যায় না। ক্লাইটেলাম থেকে মাথার দিক অর্থাৎ ছোট দিকটা মাথার দিক আর পিছনের অর্থাৎ পিছনের দিকটাকে বলা হয় পশ্চাদভাগ। ক্লাইটেলামের সামনে মাত্র ১৩টি গাঁট থাকে। কেঁচোর মাথায় একটি মাংসপিণ্ড থাকে একে বলে প্রোষ্টানিয়ম। প্রথম খণ্ডে ও অন্যান্য খণ্ডে যে সকল মুখ দেখা যায় ওকে বলে ঠোঁট। এর দেহের সর্ব শেষে পাওয়া যায় মল দ্বার।

কেঁচো উভয লিঙ্গ। একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ থাকে। ক্লাইটেলামের মাথার দিকে একটি ফুটা দেখা যায। ঐটি স্ত্রীযোনি। ১৮নং গাঁইটে যে অঙ্গ পাওযা যায তাকে বলে পুরুষাঙ্গ। ১৭নং ও ১৯নং গাঁইটে দুই পার্শ্বে দুটি উঁচু স্থান দেখতে পাওযা যায। বাহির থেকে একে ফুটা বলে মনে হয, কিন্তু এগুলি কেঁচোর লিঙ্গ গুল্ম। ৫ম ও ৬ষ্ঠ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম, ৭ম ও ৮ম, ৮ম ও ৯ম গাঁইটের মধ্যে দুটি করে ৮টি ছিদ্র দেখা যায। এতে কেঁচোর শুক্র জমা করা থাকে। কেঁচোর পিঠেতে দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত প্রতিটি গাঁইটের সংযোগমূলে কতকগুলি ফুটা দেখা যায এগুলিকে বলে পৃষ্ঠ ছিদ্র। এদের মধ্য থেকে একবকমের রস বার হয। এই রসযোগে মাটিতে যে সমস্ত বীজাণু থাকে সেগুলি এর সংস্পর্শে এলে মরে যায।

কেঁচোর উপকারিতা—অনেকে কেঁচো দেখেছো। কেঁচো দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কিন্তু মানুষে একে ঘৃণা করলেও মাছ ধরবার সময এটাকে দিযে চার করা হয। তা বাদে কেঁচোব প্রযোজন হয মাটিকে উর্বর করে তুলতে। বর্ষাকালে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায রাস্তার ধারে ও মাঠেতে কেঁচোর ঢিপি রযেছে। এগুলি কেঁচোর পরিত্যক্ত মলমূত্র ভিন্ন আর কিছুই নয। কেঁচোতে গর্ত করে নীচের মাটি উপরে তোলে তার ফলে মাটির রূপ পরিবর্তিত হয। এর সঙ্গে লেগে থাকে কেঁচোর মলমূত্র এগুলি যদি জমিতে ভালভাবে মিশে তবে জমির উর্বরতা বাড়ে। আগেই বলেছি কেঁচো মাটির নীচে ৫´।৬´ পর্যন্ত যেতে পারে। গর্ত কেটে এভাবে

যাওযার ফলে নীচের মাটি আল্‌গা হযে পড়ে। তার ফলে সেখানকার শক্ত মাটিতে গাছ সহজে শিকড় চালাতে পারে। এ ভিন্ন মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয় ও মাটির মধ্যে অক্সিজেন বাড়ে। ডারউইন দেখিযেছেন বৎসরে কোন জমির ১/২ ভাগ মাটি নীচের থেকে উপরে আসে শুধু কেঁচোর দ্বারা।

কেঁচো মাটিকে বিভিন্ন আকৃতিতে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে ফলে, মাটি চাষোপযোগী বিশেষ আকৃতিতে আসে। যেখানে তলার মাটি খুব শক্ত সেখানে যদি কেঁচোর চাষ করা হয তবে সেখানে মাটি শীঘ্রই পরিবর্তিত হবে ও চাষের উপযোগী হবে। এভিন্ন কেঁচো মরে গিযে মাটির সঙ্গে মিশে জমিকে উর্বর করে তোলে।

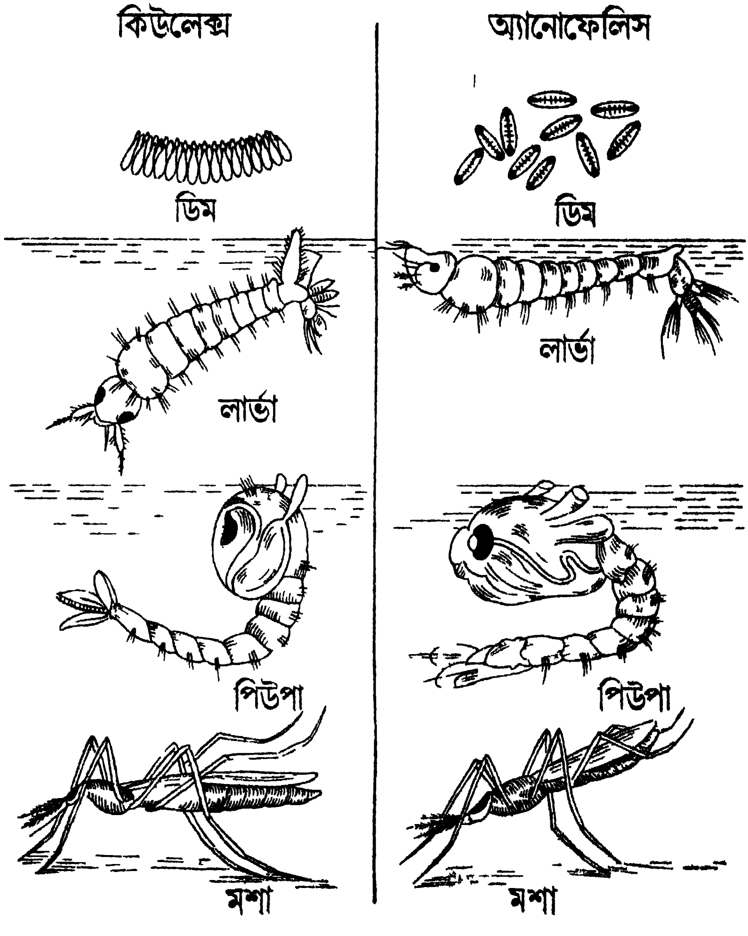
মশকের জীবনকথা

মশার কামড়ের থেকে মশকের ভোঁ ভোঁ শব্দ ভীষণ বিরক্তিকর। রাত্রিবেলা ঘুমাতে গিযে যদি কানের কাছে মশার ডাক শোনা যায তবে সেই রাত্রে ঘুমান দায হযে পড়ে। মশা মাছির মত পতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

মশা পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। ইহারা ম্যালেরিযা ভিন্ন আরও নানা রোগ সংক্রামিত করে। এদের মধ্যে মশকীরা রোগ সংক্রামিত করে। মশার কামড়ে জ্বালা করে।

মশার দেহে দুই পাশে দু'টি ডানা আছে। সেজন্য এ'কে দ্বিপদ পতঙ্গ বলে। মশার মাথা গোলাকার, মাথার দুই পাশে দুটা শিং-এর মত আছে একে বলে প্রত্যাক্ষি। ঠিক এই দুটার মাঝখানে থাকে সরু চোঙ্গের মত। এটা কোনো প্রাণীর গাযে বসিয়ে দিয়ে মশা সেই প্রাণীর দেহ থেকে রক্ত চুষে নেয। পুরুষ মশার গা রোমে ঢাকা, দেখতে অনেকটা ব্যাঙের মত। কিন্তু স্ত্রী-মশার এসব থাকে না। পুরুষ মশা রক্ত খায় না। সাধারণতঃ এরা গাছের গা থেকে রস টেনে খায়। স্ত্রী-মশা কোন পশু বা মানুষের দেহেতে চোঙ ঢুকিযে দেয় এবং তা দিযে রক্ত চুষে খায।

মশার বুক কুঁজো অর্থাৎ বাঁকা। বুকের তিনটি অংশ। প্রতিটি অংশে এক জোড়া করে পা থাকে। এর মাঝখানেব অংশে থাকে এক জোড়া ডানা।



মশা ভোঁ ভোঁ শব্দ মুখ দিযে করে না। যখন উড়তে গিয়ে পাখা বাতাসে নড়ে তখন এই পাখা থেকে শব্দ উঠে। যখন কোন জাযগায় বসে তখন এ শব্দ শোনা যায় না।

মশার পেট সরু ও লম্বা। পেট ও বুকের পাশে সমান ছিদ্র থাকে।

তিন রকমের মশা দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে এনোফেলিস্ জাতীয় মশা মানুষের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত করে। যে সমস্ত মশা গোদের (পা-ফুলা) রোগের বীজাণু ছড়ায় তাদেরকে বলা হয় কিউলেক্স। আর এক রকমের মশা আছে যার কামড়ের ফলে আমাদের ডেঙ্গু জ্বর হয় এর নাম এডিস। আমাদের প্রথম দুই জাতীয় মশার সহিত বিশেষ পরিচয় থাকার প্রয়োজন। কারণ এদের দংশনের ফলে ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া রোগ বিস্তারলাভ করে। কিউলেক্স জাতীয় মশা যখন কোথাও বসে তখন তার দেহ যার উপর বসেছে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এনোফেলিস জাতীয় মশা যার উপর বসে তার সহিত তার দেহ সমান্তরাল তো থাকেই না বরং একটা কোণের সৃষ্টি করে। এদের পশ্চাৎ দিকটা উঁচু দিকে থাকে।

মশকীরা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর রক্ত পান করে বংশবৃদ্ধি করে কিন্তু মশকরা ফুলের ও গাছের রস পান করে বাঁচে।

মশার রূপান্তর—মশার জীবনেতিহাসে সাধারণতঃ চারিটা অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম ডিম, দ্বিতীয় লার্ভা বা শুক, তৃতীয় পিউপা এবং চতুর্থ একটি পূর্ণাঙ্গ মশা। একটু লক্ষ্য করলে আমাদের পরম শত্রুদের যেমন পার্থক্য ধরা যায়, তেমনি এদের বিভিন্ন অবস্থা দেখতে পাওয়া যায় ও তাদের বিভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়।

কিউলেক্স মশা একটু জল পেলেই সেখানে ডিম পেড়ে যায়। এরা কোন বড় পুকুর বা হ্রদে ডিম পাড়তে যায় না। কিন্তু এনোফিলিস জাতীয় মশা পরিষ্কার জল না পেলে ডিম পাড়তে চায় না। অবশ্য এই দুই জাতীয় মশাই ভোর রাতে ডিম পাড়ে। কিউলেক্সের ডিমগুলি একে অন্যের গায়ে লেগে মাছের ডিমের মত জলে ভাসতে থাকে কিন্তু এনোফেলিসের ডিম ছাড়া ছাড়া থাকে। ডিমগুলি ফেটে গিয়ে কৃমির মত লার্ভা বেরিয়ে আসে।

লার্ভার চোখ থাকে কিন্তু পা থাকে না। এরা জলের মধ্যে চলে-ফিরে বেড়ায়। যখন এরা চলে তখন অনেকটা লেজের দিককার জোরে চলে। জলের মধ্যে নানা বীজাণু খেয়ে এরা বেড়ে ওঠে। কেবলমাত্র জলেতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে এরা বাড়তে পারে না। তাই মাঝে মাঝে জলের উপরে উঠে আসে। এদের বাতাস থেকে অক্সিজেন নেবার পদ্ধতিও বিভিন্ন। শ্বাস নেবার সময় এনোফিলিস জাতীয় লার্ভা জলের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যায় কিন্তু কিউলেক্স জাতীয় লার্ভা উঁচু-নীচু অবস্থায় ঝুলতে থাকে এবং শ্বাস যন্ত্র দুটি জলের থেকে উপরে থাকে। এরা বিভিন্ন পর্যায়ে বেড়ে উঠার সাথে সাথে জীবনে তিনবার খোলস পরিত্যাগ করে। লার্ভা অবস্থায় এরা বেশীদিন থাকে না। সাধারণতঃ ৭।৮ দিনের মধ্যে এরা লার্ভা অবস্থা কাটিযে পিউপার আকার নেয। ছোটবেলায় অনেক পতঙ্গকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যায় কিন্তু মশক পিউপা অবস্থায় ভীষণ চঞ্চল হয। পিউপাগুলিকে দেখতে আঁকাবাঁকা ধনুকের মত। সামনে মাথা ও বুক একসঙ্গে মিশে গিযে গোলাকার ধারণ করে এবং পিছনের সরু অংশ উদরায বা খণ্ড খণ্ড আকার ধারণ করে। এই সমযে কিউলেক্স জাতীয মশার শ্বাসযন্ত্র নীচের থেকে মাথায চলে যায়। এনোফিলিস জাতীয় মশার শ্বাসযন্ত্র এই সমযে তৈরী হয ও তিন দিনের মধ্যে শ্বাসযন্ত্র জলের উপরে চলে যায। এই সমযে একবার খোলস ত্যাগ করে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয। খোলস ছেড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে আরম্ভ করে না। খোলসের উপর বসে বেশ খানিকটা জিরিযে নিতে হয—তারপর উড়ে পালায। একটা মশা সারা রাতে প্রায় ১ মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।

মাছ

জলেই প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল তাই এটা মনে করা মোটেই অন্যায় হবে না যে জলেই বৃহদাকার প্রাণী দেখতে পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে

আছে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অবশ্য প্রথম যখন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল তখন কোন মাছের হাড় ছিল না। অমেরুদণ্ডী প্রাণী ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পর্যবসিত হয়েছে।

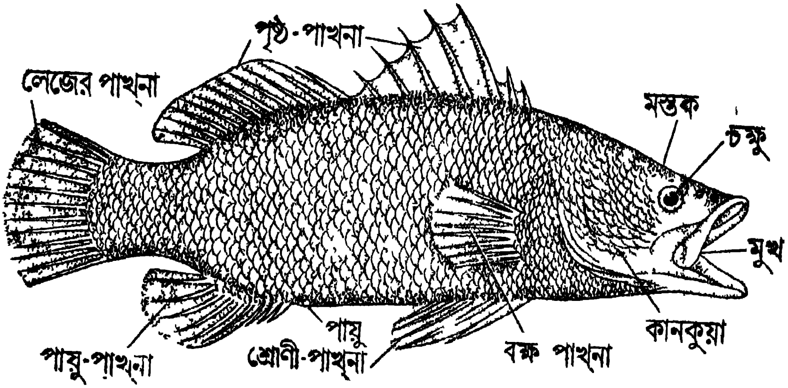
ভাতের পাতে একটু মাছের ঝোল না হলে বাঙ্গালীর খাওয়াই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাছ ব্যতিরেকে বাঙ্গালীর ভাত খাওয়া ভাল হয় না। কত রকমের মাছ না আমাদের দেশের পুকুরে, নদীতে বা সাগরে দেখা যায়। আমাদের দেশের পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল, মরুলা, চিতোল, পুঁটি, কালবোস, সিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদি এবং নোনা জলে পারশে, ভেটকি, গলদা চিংড়ী, বাগ্দা চিংড়ী, টেংরা, বোয়াল, বাণ প্রভৃতি মাছ দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে যে হাঙ্গর দেখতে পাওয়া যায় তাহা এক রকম মাছ। তিমি খুব বড় আকারের এক রকম মাছ। আর এক রকমের মাছ আছে সমুদ্রেতে যারা উড়তে পারে। এগুলিকে সমুদ্রের জলে উড়তে দেখলে খুব আনন্দ হয়।

মাছের দেহ—পশুদের গায়ে যেমন লোম থাকে সেইরকম মাছের গায়ে থাকে আঁইস। মাছের সারা দেহ মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আঁশ দিয়ে ঢাকা। তবে টেংরা, সিঙ্গি, মাগুর ও হাঙ্গর জাতীয় মাছের গায়ে কোন আঁইশ নেই। যে মাছে আঁইশ আছে সে মাছের গায়ে নীচের থেকে উপরে আঁইসগুলো একের পর এক একটি সাজানো। এই আঁইশগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে এদের চলতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। ঐ আঁইসগুলির উপরে এক রকম লালা থাকে। এর ফলে কেহ সহজেই জলের মধ্যে হাত দিয়ে মাছ ধরতে পারে না। চিংড়ী মাছের আঁইশ নেই, আছে খোলা। মাগুর সিঙ্গি প্রভৃতি মাছের আঁইশ না থাকলেও এদের গায়ের উপর লালা থাকে।

মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী, স্থায়ী বাসস্থান এদের জলাশয় কিন্তু কেহ কেহ উড়তে পারে আবার কেউ কেউ ডাঙ্গায়ও চলতে পারে। স্বার্থপরতায়

মাছ প্রাণীজগতে অদ্বিতীয়। ইহারা তৃণভোজী ও মাংসাশী দুই রকমের আছে।

মাছের মাথার উপর দুটো চোখ থাকে। ঠিক তারপর আছে কানকো দিয়ে ঢাকা দুটি শ্বাসযন্ত্র। মাছের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাখনা আছে। আমরা যেমন দাঁড় দিয়ে নৌকা চালাই মাছও এই পাখনার সাহায্যে জলের মধ্যে চলাফেরা করে। প্রায় সব মাছেরই কানকোর নীচে এক জোড়া পাখনা থাকে আর লেজের আগে এক জোড়া পাখনা থাকে। লেজে যে পাখনা থাকে এটা দিয়ে নৌকার মত মাছ দিক পরিবর্তন করতে পারে। মাছের পটকা ফাটাতে খুব চমৎকার লাগে। এটা পেটের মধ্যে থাকে এবং



সব সময়েই বায়ুতে পূর্ণ থাকে। মাছ যখন ভাসে তখন এই পটকার মধ্যে একটুও জল থাকে না। মাছের যদি ইচ্ছা হয় জলের তলায় ডুবে যাবে তবে মাছ এই ফুলকা জলে ভর্তি করে এবং তখন মাছের দেহ ভারী হয়ে যায় ও অনায়াসে জলের তলায় মাছ তলিয়ে যায়। ইহা অনেকটা সাবমেরিণের মত। মাছের দেহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর দেহেতে সাদা দাগ আছে। এ দিয়ে মাছ স্পর্শানুভব করে। মাছ শ্যাওলা, পোকামাকড় খায়।

মাছের শরীরের মাথার দিক আর লেজের দিক সরু। শরীরে তিনটি

অংশ। মাথা, ধড় ও লেজ। রুই মাছের মাথা কোণাকৃতি আর ভেটকি মাছের মাথা চ্যাপ্টা। মাথার আগার দিকে দুটি চোখ আছে, মুখ আকারে বেশ বড়। ভেটকি মাছ ছোট ছোট মাছও খায়, চোখের ঢাকনি নেই। দেহে সাতটি পাখনা, প্রতি পাখনায় শক্ত কাঠির ন্যায় হাড আছে। পিঠের পাখনায় ত্রিভুজাকৃতি ৭টি কাঁটা আছে। পেটের নীচে থাকে একটা পাখনা ও পায়ু। পায়ুর নিকটে থাকে পায়ু পাখনা। পায়ু দিযে মলমুত্র ত্যাগ করে।

বর্ষাকালে প্রায় সব মাছেই ডিম পাড়ে। ডিমের উপরে একরকম রস ছড়িয়ে দেয। তারপর আর কেউ এর খোঁজ রাখে না। একটা মাছের পেটে ১০ লক্ষ ডিম থাকে। কিন্তু সব ডিম থেকে বাচ্চা বার হয না, অনেক ডিম নিজেরাই খেযে ফেলে আবার অনেক ডিম নষ্ট হযে যায।

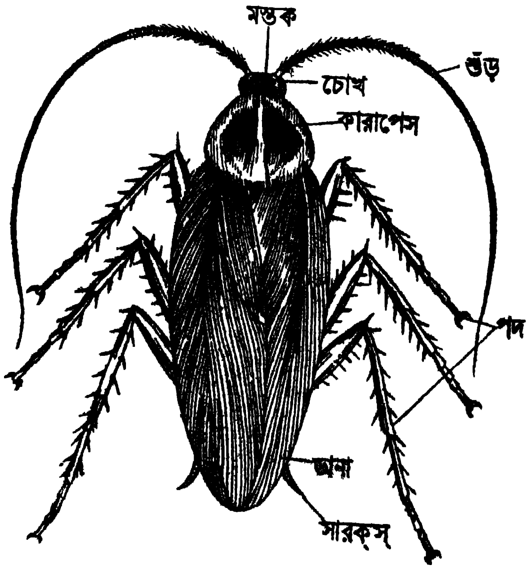
মাছের সেরা রুই মাছ। যেমন দেখতেও চমৎকার তেমনি বড় ছোট সকল রকমের মাছ পাওযা যায। রুই মাছের দেহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায। প্রথমে মাথা, দ্বিতীয় দেহ ও তৃতীয় লেজ। রুই মাছের পেটের লিটন অর্থাৎ নীচের দিকটা বেশ সাদা আর উপরের দিকটা একটু কালো।

সমস্ত দেহটা অর্থাৎ দেহকাণ্ড আঁইশ দিযে ঢাকা। মাথাটা বেশ বড় মুখের কাছটা একটু চ্যাপ্টা। দুটো ঠোঁট আছে। বয়স অনুযাযী মুখের হাঁ ছোট-বড় হয। এদের মুখের গর্তের দুই দিকে দুটো শিং-এর মত থাকে। এদিয়ে রুই মাছ অনাযাসে অনুভব করতে পারে। ট্যাংরা মাছের মাথায উপরে দুটো লম্বা লোম আছে। মাথার উপরে, মুখ থেকে একটু নীচে থাকে নাসারন্ধ্র। যদিও নাম এর নাসারন্ধ্র তবুও এ দিযে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে না। দুটো চোখ কিন্তু চোখের কোন পাতা নেই। এর পরেই মাছের কানকো। মাছের শ্বাসক্রিয়ার জন্য মাছ এ-দুটোকে খোলে ও বন্ধ করে। কানকোর ভিতর থাকে ঝিল্লী। মাছ মুখ দিযে জল টানে আর কানকো দিযে জল বার করে।

আরশোলা (Cockroach)

ছেলেরা না হোক অনেক মেয়েরা আছেন যাঁরা আরশোলা দেখলে ভয় পান এবং যেখানে আরশোলা দেখা যায় সে স্থান ছাড়বার জন্য মরি কি পড়ি করে স্থান ত্যাগ করেন। এতে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তা হলেও তাদের দুঃখ কম।

এদের বাস হলো অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে জায়গা। বিশেষ রান্নাঘরের কুলুঙ্গি, মুদিখানার দোকানের এঁদো অংশে, ভাঁড়ার ঘরের বিভিন্ন ঢাকা স্থানে এরা বাস করে। এদের মাথার উপর দুটো শুঁড়ের মত থাকে সে দুটো নাড়তে দেখলেই শিশুদেরও বেশ ভয় লাগে! এরা সব কিছু খায় আর

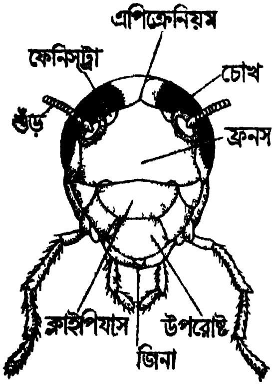


পরিমাণেও বেশী। দিনের বেলায় দেখা যায় না, সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে এরা চরতে বার হয়।

এদের দেহ চ্যাপ্টা। উপরটা একটা পাতলা চর্মাকারের খোলা দিয়ে

ঢাকা। ডিম থেকে বাচ্চা বার হয়, আর একটি পূর্ণবয়স্ক আরশোলাতে রূপান্তরিত হতে বেশ বারকয়েক খোলস পাল্টায়।

সমস্ত দেহটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মাথা, বুক ও পেট।



মাথাটা সারা দেহের সঙ্গে একটা সরু গলা দিযে জোড়া। সেজন্য মাথাটাকে এপাশে ও ওপাশে ঘোরাতে পারে। শুঁড়ের নীচে থাকে দুটো চোখ। শুঁড় ও চোখের মাঝখানের অংশে দুটি গোলাকার দাগ দেখা যায়—একে বলা হয ফেনেস্ট্রা। দুই শুঁড়ের মাঝখানের জাযগাটাকে বলে ফ্রন্স। ফ্রন্সের সামনের অংশটাকে বলে ক্লাইপিযাস। ক্লাইপিযাসের সামনে একটু মাংসপিণ্ড ঝুলে থাকে—একে বলে লাব্রাম। মাথার যে অংশ পেটের দিকে সেখানে একটা ছিদ্র থাকে সেটাকে মুখ বলে। মুখের দুপাশে দাঁতের মত শক্ত মাড়ি থাকে। একে বলা হয ম্যানডিবল।



এদের বুককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। সামনের, মাঝের ও পিছনের বুক। (pro-meso-meta-thorax)। সব অংশ আবরণ দিয়ে ঢাকা। মাঝের ও পিছনের বুক থেকে ডানা বার হয়। প্রথম জোড়া নামে ডানা

কিন্তু ওড়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না। ইহা শক্ত। দ্বিতীয় জোড়া দিয়ে আরশোলা ওড়ে।

আরশোলা যখন চলে তখন সব ডানা কাজ করে। কিন্তু যখন স্থির হয়ে বসে তখন প্রথম জোড়া দ্বিতীয় জোড়াকে চেপে রাখে। বুকের তিনটি অংশ থেকে তিনটি উপাঙ্গ বার হয়।

আরশোলার পেটটা মোটা। এতে দশটি অংশ থাকে। স্ত্রী আরশোলার পেট পুরুষ আরশোলার থেকে মোটা। পেটের সপ্তম খণ্ডটি বিস্তৃত। পুরুষ আরশোলার ৯ম খণ্ডে দুই দিকে গাঁটহীন উপাঙ্গ দেখা যায়। দশম খণ্ডে ছোট ছোট উপাঙ্গ দেখা যায়। এদের বলে এনাল সারকস্। আর এরই মাঝে থাকে পায়ু ছিদ্র।

আরশোলার দেহে দশ জোড়া ছিদ্র থাকে, এদেরকে বলে শ্বাস ছিদ্র। পুরুষ আরশোলার নবম ও দশম খণ্ডের মাঝে পাশের দিকে জননেন্দ্রিয় থাকে। স্ত্রী আরশোলার অষ্টম খণ্ডের পেটের দিকে ধারে জননেন্দ্রিয় থাকে।

আরশোলা ভালভাবে দেখতে পায় না। কান এবং চোখ দুটি রঙ্গীন চটচটে পদার্থে ভর্তি, কেবল জিনিষের ঝাপ্সা ছবি দেখতে পায় এবং তাই দিয়ে বুঝতে পারে। শুঁড় দিয়ে এরা অনুভব করে এবং গন্ধ দিয়ে বুঝতে পারে কোন্ বিশেষ বস্তু তাদের সামনে এসেছে। এদের গাঁটে নানা রকমের বুঝতে পারে এমন রোম আছে।

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[জৈব রসায়ন]

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড

(দশম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

গাছ ও জল

(Water, its importance in plant life, absorption of water and transpiration)

গাছ ও জল—গাছের দেহ যদি রাসাযনিক প্রক্রিযায বিশ্লেষণ করা যায তবে দেখা যায যে এর থেকে দুই জাতীয পদার্থ পাওযা যায। (১) বাষ্পীয় ও (২) ধাতব।

বাষ্পীয পদার্থের মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদি বাযবীয, আর পটাসিযাম (K) ক্যালসিযাম (Ca) ম্যাগনেসিযাম (Mg) লৌহ (Fe) ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ বর্তমান। এই কযটি মৌলিক পদার্থ গাছেব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রযোজন। কেবলমাত্র ঐগুলি জলের সহিত মিলিযে গাছ উৎপন্ন কবা যেতে পাবে। নিম্নে তাহার ফরমুলা দেওযা হইল—

পরিশুদ্ধ জল—১ লিটার

পটাসিযাম নইট্রেট—১ গ্রাম

ম্যাগনেসিযাম ফসফেট—০'৫ গ্রাম

ক্যালসিযাম সালফাইড—০'২৫ গ্রাম

বরিক ক্লোরাইড—কযেক ফোঁটা মাত্র।

বাতাস থেকে গাছ সংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড। গাছের দেহের প্রায শতকরা ৭০ ভাগ কার্বন। প্রোটোপ্লাজম, কোষপ্রাচীর ও খাদ্য প্রস্তুত করতে এদের প্রযোজন আছে।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের সঙ্গে বা জলের আকারে গাছের দেহে ঢোকে এবং খাদ্য ও প্রোটোপ্লাজম তৈরী করতে সাহায্য করে।

মাটি থেকে গাছ জলের সহযোগে নাইট্রেট বা কোন এমোনিয়াম জাতীয় মিশ্র পদার্থ সংগ্রহ করে। বাতাস থেকে গাছ N_2 নিতে পারে না। কিন্তু লেগুমিনাস জাতীয় গাছ শিকড়ের নডুল বীজাণুর সাহায্যে বাতাস থেকে N_2

টেনে আনে। যে সমস্ত গাছ পোকা-মাকড় খায় তারা পোকা-মাকড়ের দেহ থেকে N_2 সংগ্রহ করে।

গাছ মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে জলের সহযোগে মিশ্র সালফেট আকারে। ফসফেট আকারে ফসফরাস গাছের দেহে গিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরীতে সাহায্য করে। পটাসিয়াম গাছের দেহে শর্করা জাতীয় পদার্থ ও প্রোটোপ্লাজম তৈরীতে সাহায্য করে।

ম্যাগনেসিয়াম মিশ্র আকারে মাটি থেকে জলের সহযোগে গাছের দেহে আসে। এরা সবুজকণা তৈরীতে সাহায্য করে।

ক্যালসিযাম প্রযোজন হয কোষপ্রাচীর শক্ত করতে। এটা মিশ্র আকারে গাছ মাটি থেকে সংগ্রহ করে।

জলগ্রহণ—যে সমস্ত গাছ মাটিতে বৃদ্ধি পায তারা শিকড়ের অনুলোমের সহযোগে মাটি থেকে জল টেনে নেয। গাছের শিকডের বৃদ্ধির সময়ে অনুলোমগুলি দুই মৃত্তিকা কণার মধ্যবর্তী স্থানে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে যে জল থাকে সেই জল-মিশ্র ধাতব পদার্থসমূহ জলের সহযোগে গাছের শিকড়ে প্রবেশ করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয অস্‌মোসিস পদ্ধতি।

দুইটি বিভিন্ন পরিমাণ ঘন তরল পদার্থ একটি আধা প্রবেশ্য ছাঁকনির দুই দিকে রাখা গেল। দেখা যাবে একদিক থেকে অন্যদিকে জল এসে অন্যকে তরলীভূত করে ফেলে। একে বলা হয অস্‌মোসিস। যতক্ষণ পর্যন্ত না একদিককার তরল পদার্থের ঘনত্ব অন্য দিককার তরল পদার্থের ঘনত্বের সমান হয়, ততক্ষণ এইভাবে কাজ চলতে থাকে। দেখা যায তরল পদার্থ ঘন পদার্থের মধ্যে তাডাতাড়ি যেতে পারে। অস্‌মোসিস দুই প্রকারের। যখন তরল পদার্থ ঘন পদার্থের সঙ্গে মিশে তখন একে বলে এন্ডো-অস্‌মোসিস। আর যখন ঘন পদার্থ ধীরে ধীরে তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে তখন একে বলে এক্‌টো-অস্‌মোসিস।

মাটির মধ্যে জল অন্যান্য ধাতব পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়ে উপরে উঠে

আসে। এই দ্রব্য খুবই তবল অবস্থায় থাকে। অম্নলোমের মধ্যে থাকে শর্করা ও ঐ জাতীয় পদার্থ। এই দুইয়ের মাঝখানে থাকে অম্নলোমের সেলুলোজ ও কোষপ্রাচীর। ফলে অস্‌মোসিস ক্রিয়া সুরু হয়। এই আধা প্রবেশ্য স্তর দিযে মাটির থেকে জল অম্নলোমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই যে আধা প্রবেশ্য স্তর, এর একটা পছন্দ আছে। সবাইকে ঢুকতে দেয না। প্রাইমোরডিয়াম ইউট্রিকেল নামক পদার্থ তখন আধা প্রবেশ্য স্তরে এসে পড়ে এবং সবাইকে ঢুকতে দেয না।

যখন সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যায তখন কোষপ্রাচীরের উপর চাপ পড়ে এবং প্রাচীর বেড়ে যায। এই অবস্থাকে বলা হয টারজিডিটি (turgidity)।

প্রশ্বাস—গাছ মাটি থেকে খুব বেশী পরিমাণে জল টেনে নেয়। ধাতব পদার্থ জলেতে খুব কম থাকে, এই জলের কিযদংশ প্রোটোপ্লাজম-এ দরকার হয। বাকি সমস্ত জলটাই পাতার মধ্য দিয়ে বার হযে যায। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায অনেক সময় বৃষ্টি বা কোথাও কোন জলের সম্ভাবনা নেই অথচ পাতার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি জল। গাছ পাতার সাহায্যে এই জল দেহ থেকে বার করে দিযেছে। অথবা যেমন মূত্রাকারে বা ঘামের মাধ্যমে প্রাণীদেহ থেকে জল নিষ্কাশিত হয, গাছ তেমনি জল বার করে দেয পাতার মাধ্যমে।

একটা টবে একটি গাছ নিযে রবারের দ্বারা ঢেকে দেওয়া হলো। তিন চার ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে, এই রবারের ভিতরের দিকে ফোঁটা ফোঁটা কয়েক বিন্দু জল। এই জল গাছ পাতার মাধ্যমে বার করে দিয়েছে।

পাতার মাধ্যমে গাছের এই জল বার করে দেওয়ার পদ্ধতি কাজ করে। কিন্তু শাখা প্রশাখায় লেন্টিসেলের মাধ্যমে চলাফেরা করে। সেজন্য এদেরকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয। পাতার ফুটা দিয়ে বেশী জল বার হয়ে যায়। কারণ পাতার নীচের দিকে বহু ছোট ছোট ফুটা থাকে। পাতার নীচের দিককার, ফুটা উপরের দিককার ফুটা থেকে বেশী জল বার করে দেয়।

দুই খণ্ড পাতলা কোবাল্ট ক্লোরাইড কাগজ নিয়ে একটি গাছের পাতার

উপর দিকে ও অপরটি নীচের দিকে দেওয়া গেল। এবার মাইকা দিয়ে পাতা দুটি ঢেকে দেওযা হলো। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে, নীচের পাতাখানি ঈষৎ লালচে হয়েছে কিন্তু উপরের পাতাটি নীল রয়ে গেছে তখনও লাল্‌চে হয নি।

পাতা দিযে জল বার করে দেওয়ার সাথে সাথে কোষের মধ্যস্থিত কোষ-রস ঘন হয়ে যায়। এখন এই কোষরস নিকটস্থ জাইলেম (xylem) থেকে জল গ্রহণ করে। জাইলেম জল পায শিকড় থেকে। সুতরাং যে জল বার হয়ে যায তার শূন্য স্থান পূরণ করে শিকড় থেকে জল এনে। গাছের দেহে বহু মেসোফিল কোষ থাকে—সবার যখন জলের প্রযোজন হয তখন শিকড় থেকে জল টেনে নেয। একে বলে প্রশ্বাস প্রবাহ।

প্রশ্বাস নির্ভর করে বা বৃদ্ধি পায—(১) আলোর সংযোগে প্রবাহ বাড়ে। আলোর তেজ যত বাড়বে ততই প্রবাহের বেগ বাড়বে। (২) বাতাসের জলকণা বেশী থাকলে এই প্রশ্বাসের বেগ বৃদ্ধি পাবে। (৩) উত্তাপের সঙ্গে প্রবাহের বেগ বৃদ্ধি পায। যত উত্তাপ বাড়বে ততই প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। (৪) চাপের তারতম্য অনুসারে প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হয। (৫) বাতাসের বেগ বৃদ্ধি হলেও প্রবাহের গতি বাড়ে।

এই প্রবাহের গতি ইচ্ছানুসারে কমান যায। (১) ছোট ছোট পাতার সৃষ্টি হলে। (২) দেহে ল্যাটেক্স বা রসের সৃষ্টি হলে। (৩) পাতাগুলি কাঁটায় পরিবর্তিত হলে। (৪) কিউটিকেলগুলো পুরু ও স্টোমাটাগুলি বা পাতার ফুটাগুলি গর্তের মত করে। (৫) সবার উপর পাতাগুলি মুড়িযে দেয়।

প্রশ্বাস গাছের নিতান্ত প্রযোজন। কারণ এই পদ্ধতি দিযে গাছ দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় জল বার করে দেয়। কোষরসসমূহ ঘনীভূত হয়ে গেলে নীচের দিককার জল টানে, এর ফলে একটা টানা ক্রিয়া (suction) কাজ করে, পাতার খাদ্য তৈরীতে কাঁচা মাল হিসেবে জল ব্যবহৃত হয়। সবার উপরে গাছকে ঠাণ্ডা রাখে।

ক্ষয়সাধন—প্রাণিই হউক আর গাছই হউক প্রত্যেকের দেহে অনবরত রাসায়নিক প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। আর এরই ফলে দেহের মধ্যে নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আর এই ভাঙ্গাগড়ার ফলে কোষমধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজমও ভাঙ্গছে আবার জোড়া লাগছে। এরই ফলে বহু অপ্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরী হয় এবং তারা শরীর থেকে বার হয়ে আসে। আর এর ফলে বহু শক্তির অপচয় হয়। এই ভাঙ্গাগড়া ব্যাপারটিকে বলে ক্ষয়সাধন ও ক্ষয়পূরণ পদ্ধতি।

একটা পদ্ধতিতে দেহের মধ্যে সব জিনিষ গড়ছে। তাকে বলে গঠন পদ্ধতি (anabolism) আর একটি পদ্ধতিতে ভাঙ্গছে তাকে বলে ক্ষয়সাধন (catabolism)। গঠন পদ্ধতির মারফৎ যে সমস্ত পদার্থ গঠিত হয় তারা গাছের বিভিন্ন অংশে যুক্ত হয়ে গাছের মধ্যে রয়ে যায়। গঠন সাধনের একটি খুব বড় জিনিস দেহেতে শর্করা উৎপাদন করা। একে বলে সালোক অম্লশ্লেষণ (Photosynthesis), তৈলজাতীয় পদার্থ সম্পাদনা ইত্যাদি। ক্ষয়সাধন পদ্ধতির মাধ্যমে নানাজাতীয় মিশ্র জৈব পদার্থ ছোট ছোট সরল পদার্থে পরিণত হয়। এদের মধ্যে প্রধান হল হজমক্রিয়া (dig stion) বা শ্বাস-প্রশ্বাস (respiration)।

যে পদ্ধতিতে গাছ পাতায় আলোর সাহায্যে বাতাসের CO_2 ও মাটি থেকে টেনে আনা জলের সহযোগে খাদ্য প্রস্তুত করে তাকে বলে আলোক সংশ্লেষণ। আমরা অগ্নি সহযোগে খাদ্য তৈরী করি। তেমনি গাছও সূর্যের আলোতে খাদ্য তৈরী করে পাতায়, কয়েকটা ক্ষুদ্র গাছ ছাড়া, প্রতি গাছের পাতায় সবুজকণা থাকে (chlorophyl)। সজীব কোষের মধ্যে তেলা পদার্থ হিসাবে প্রতিটি কোষে সবুজকণা থাকে। কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণে একটা মিশ্র যৌগিক পদার্থ। অনেক সময় লোহের উপস্থিতিতে এই সবুজকণা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়। ক্লোরোফিলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। (১) সবুজকণা ক (নীলসবুজ), (২)

আর সবুজকণা খ (হলদে সবুজ)। এতে থাকে দুই রকমের হলুদকণা, নাম—ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল। এমাইল এলকোহল সহযোগে সহজে গাছ থেকে সবুজকণা-দ্রব হয়ে উত্তাপ সহযোগে নিষ্কাশন করা যায়। সবুজকণার প্রধান কাজ শর্করা জাতীয় জিনিষ প্রস্তুত করা।

গাছের বৃদ্ধি—আমরা জানি প্রাণীমাত্রেই বৃদ্ধি পায়। আর এটা প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। প্রাণীদের সর্বাঙ্গ ব্যেপে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গাছের বৃদ্ধি একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। গাছের বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রয়োজনীয়।

(১) **খাদ্য,** খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। কারণ খাদ্যের প্রভাবে প্রোটোপ্লাজম তৈরী হয় ও কোষপ্রাচীর প্রস্তুত হয়।

(২) **জল**—বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জল। জল দিয়ে প্রোটোপ্লাজম তৈরী হয় আর জলের সহযোগে অন্যান্য খাদ্য আসবে মাটি থেকে।

(৩) **অক্সিজেন**—অক্সিজেন গাছের দেহের মধ্যে জারক প্রথার সাহায্যে শক্তি দেবে।

(৪) **উপযুক্ত উত্তাপ**—উত্তাপ পরিমাণমত হওয়ার প্রয়োজন। কারণ খুব উত্তপ্ত স্থানে বা ঠাণ্ডা জায়গায় ভাল গাছ জন্মে না।

(৫) **আলো**—প্রোটোপ্লাজমের সকল অবস্থার জন্য আলোর প্রয়োজন।

গাছের বৃদ্ধি কোন নিয়মমাফিক প্রথায় চলে না। প্রথমে বৃদ্ধি মন্থর থাকে পরে বৃদ্ধি পায়, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পেয়ে আবার মন্থর হয়ে যায়, পরে আবার একদম থেমে যায়। যতদিন বৃদ্ধি পায় ততদিন একে বলা হয় বৃদ্ধি-কাল। এই বৃদ্ধিকালের মধ্যে আবার দিবারাত্রি হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিও কম-বেশী হয়। এটা খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় শিশু কাণ্ডে। সূর্যাস্তের থেকে বৃদ্ধি সুরু হয় আর সারারাত বৃদ্ধি চলে, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সব থেকে বেশী বৃদ্ধি পায়, তারপর সূর্যের আলোকে হঠাৎ বৃদ্ধি থেমে যায়। গাছের আগাটাই কেবল বৃদ্ধি পায়। এপেক্স-এর তলায় থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অঙ্গার আত্তীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাস

(Carbon assimilation and respiration)

অঙ্গার আত্তীকরণ—প্রাণীমাত্রেই খায় কারণ তাদের বৃদ্ধি আছে। কিন্তু কেমন করে খায়? গাছের তো প্রাণীদের মত দাঁত নেই। শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ থেকে দেহের কোষমধ্যস্থিত ক্লোরোপ্লাষ্ট জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সহযোগে খাদ্য প্রস্তুত করে গাছেরা খায়। অবশ্য খাদ্য-প্রস্তুতের জন্য দরকার আলোর। (এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে)।

আলোক-সংশ্লেষ গাছের সবুজ অংশের একচেটিয়া। মাটির উপরের সমস্ত সবুজ অংশ অঙ্গার আত্তীকরণ করলেও, চ্যাপ্টা পাতাই হলো এর প্রকৃষ্ট স্থান। ইহা নির্ভর করে পাতার আকার, পাতার বেধ এবং সূর্যের আলোর পরিমাণের উপর। কোষের মধ্যে থাকে ক্লোরোপ্লাষ্ট। এই ক্লোরোপ্লাষ্ট—সূর্যের আলোক থেকে শক্তি টেনে আনে। তারপর গাছের দেহে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। তখন এই শক্তি শ্বেতসার ও শর্করাকে ভাঙ্গতে পারে।

যে পরিমাণ আলো গাছের পাতায় পড়ে তার মধ্যে কেবলমাত্র ০·৩%—৫% পরিমাণ গাছ কাজে লাগায়। পৃথিবীর উপরিভাগে সবুজ গাছই কেবলমাত্র সূর্য থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত করে এবং জমা করে রাখে। যদি গাছ নিজের দেহে শক্তি জমা করে না রাখতো তবে পৃথিবীতে মানুষের বাস অসম্ভব হয়ে পড়তো। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মানুষ অনেক দ্রব্য উদ্ভাবন করে চলেছে, জেনেছেও অনেক। কিন্তু আজও পর্যন্ত মানুষ পরীক্ষাগারে এক অণু শর্করা তৈরী করতে পারেনি—CO_2, H_2O থেকে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চলেছি, উপগ্রহে

বাসোপযোগী জমি বিক্রী হয়ে গেল কিন্তু মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান আজও পরীক্ষাগারে এক অণু শর্করা তৈরী করতে পারেনি, যেদিন পারবে সেদিন খোদার উপর খিদমদগারীতে মানুষ এক পা এগিয়ে যাবে।

পদ্ধতি—মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে গাছ জল টেনে নিয়ে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পাতায় এনে জমা করে। পাতার উপর যে সমস্ত ফুটা থাকে ভিতরের চাপে তাদের মুখ খুলে যায় এবং এই ফুটা দিয়ে CO_2 ভিতরে ঢোকে। CO_2 থেকে জলের সহযোগে কার্বনিক অম্ল (Carbonic acid) তৈরী হয় এবং কোষপ্রাচীরকে প্রবেশ্য অবস্থায় পরিবর্তিত করে। সূর্যের আলোর সংযোগে ৬ অণু CO_2 ও ৬ অণু জল মিলিত হয়ে শর্করা তৈরী করে।

$6CO_2+6H_2O+$ উত্তাপ (৬৭৪ ক্যালোরি) $=C_6H_{12}O_6+6O_2.$

প্রথমে $CO_2+H_2O=CH_2O$ (ফরমালডিহাইড) $+O_2.$

ফরমালডিহাইড বিষাক্ত, সেজন্য অতি শীঘ্রই ৬ অণু নিজেরা যুক্ত হয়ে পড়ে, তৈরী করে $6CH_2O=C_6H_{12}O_6$। তারপর আবার আলোকের অভাবে ক্লোরোপ্লাষ্ট সহযোগে শ্বেতসার তৈরী হয়।

$(C_6H_{12}O_6)n-(H_2O)\ n=(C_6H_{10}O_5)\ n$ শ্বেতসার।

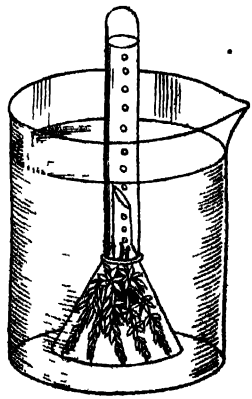
দিনের বেলায় সূর্যের আলোকে শর্করা প্রস্তুত করে আর রাতের বেলা আলোবিহনে এই শর্করা শ্বেতসারে পরিণত হয়। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় কোনমতেই ফরমালডিহাইড মধ্য অবস্থায় তৈরী করা যায় না, খুব সম্ভবতঃ এই সময়ে কোন ফসফরাস জাতীয় মিশ্র পদার্থ তৈরী হয়। খুব সম্ভবতঃ গাছের পাতার মধ্যে CO_2 ঢুকে C ও O_2তে ভেঙ্গে যায় এতে অনুপাত থাকে $C:O_2=9$। অনেকে বলেন CO_2 অক্সিজেন এনে দেয় কিন্তু দেখা যায় জল থেকে অক্সিজেন পাওয়া যায়, সুতরাং আলোক-সংশ্লেষকে জারক ও বিজারক (oxidation—reduction) প্রথা বলা চলে। কারণ CO_2 থেকে O_2 চলে যাচ্ছে সেইজন্য বিজারক প্রথা বলা চলে।

$$CO_2 + 4H_2O = CH_2O + 3H_2O + O_2.$$

পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই পদ্ধতিতে ফরমালডিহাইড তৈরী হয় না ; তবে oxidation ও reduction সমভাবে কাজ করে।

[আলোক-সংশ্লেষ, জাবক ও বিজারক প্রথা CO_2 ও H_2O এর সংযোগে চলে। আজকাল সকলে এই মতের বশবর্তী যে H_2 সংগ্রাহক যে কোন মিশ্র পদার্থ এই কাজ চালাতে পারে। CH_2O ফরমালডিহাইড নয় উহা এক জাতীয় অতি সাধারণ শর্করা মাত্র।]

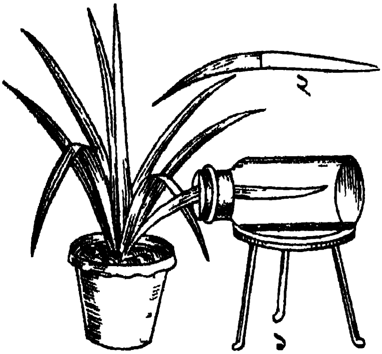
পরীক্ষা—একটা বিকারের অর্ধেক জল ভর্তি করে কতকগুলি জলজ গাছ তার মধ্যে নেওয়া হলো এবং একটা ফোঁদেল দিযে গাছটাকে ঢেকে দেওযা হলো। ঐ ফোঁদেলের মাথায একটা পরীক্ষা নালী জল ভর্তি করে উপুড করে দেওযা গেল, দেখা যাবে ধীরে ধীরে বুদ্বুদ উঠে আসছে এবং জল নেমে যাচ্ছে। এইভাবে সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায যে এটা O_2। যদি কলের জল দেওযা হয তবে CO_2 অভাবে O_2 নিষ্কাশিত হবে না।



আলোক-সংশ্লেষ কযেকটি আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক বিষযের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে বাতাস থেকে CO_2, জলের সরবরাহ, আলো ও উত্তাপ প্রধান। এদের সমবেত চেষ্টায আলোক-সংশ্লেষ ঘটে, আর আভ্যন্তরিক বস্তু হলো ক্লোরোফিল। এ গুলো ক্লোরোপ্লাষ্টের সবুজ রঙ উৎপাদক।

CO_2 =বাতাসে খুবই অল্প পরিমাণ এই বাষ্প থাকে। প্রায় ১০,০০০ ভাগে ৩ ভাগ মাত্র। অনেক সময শিল্পাঞ্চলের বাতাসে CO_2 একটু বেশী পরিমাণে থাকে। কিন্তু গাছের দেহে যে পরিমাণ কার্বনজাতীয় পদার্থ আছে তার অর্দ্ধেক গাছ পায এই বাতাস থেকে ; CO_2 ব্যতিরেকে আলোক-সংশ্লেষ সম্ভব নয়।

পরীক্ষা—অঙ্গার বাষ্প (CO_2) ব্যতিরেকে আলোক-সংশ্লেষ হতে পারে না। একটা বোতলে কিছু কস্‌টিক পটাশ নিয়ে ভাল করে ছিপি এঁটে তার পর পাতার একটি অংশ বোতলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো, পরে ভাল করে এঁটে দেওয়া হলো। এইবার ভাল করে মোম দিয়ে ফুটা ফাটা এঁটে দেওয়া হলো। সারাদিন বোতলটি সূর্যের আলোতে রাখা হলো। বাহিরের অংশে বাতাস থেকে CO_2 নিয়ে গাছের কাজ চলে। কিন্তু ভিতরের অংশে CO_2 বাষ্প কস্‌টিক পটাসএর সঙ্গে ক্রিয়া করায় CO_2 এর অভাব হলো। দেখা যাবে দুই অংশের রঙ বিভিন্ন।



জল-সরবরাহ—এর বিশেষ প্রযোজন আছে। কারণ এর সহযোগে শর্করা তৈরী হয়। এর পরিমাণ কম হলে আলোক-সংশ্লেষের পরিমাণ কমে যায়।

আলোক—সূর্যের আলো দেয় উত্তাপ। যতটা পরিমাণে আলোক গাছের পাতায় পড়ে সমস্তটা অবশ্য গাছের কাজে লাগে না, কিন্তু গাছ সারা দেহে এইগুলি জড়ো করে রাখে। সূর্যের ৭টি রঙের মধ্যে লাল ও নীল রঙ ক্লোরোপ্লাষ্ট অনায়াসে ধরে ফেলে। উচ্চ জাতের গাছের দেহে আলোক ব্যতিরেকে ক্লোরোফিল তৈরী হয় না, কিন্তু অনেক ছোট ধরণের গাছ আছে যারা সূর্যের স্তিমিত (diffused) আলোতে কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

উত্তাপ—সকল উত্তাপে আলোক-সংশ্লেষ চলতে পারে, তার মধ্যে ৩৭°সে. উত্তাপ এই আলোক-সংশ্লেষের প্রধান সহায়ক।

ক্লোরোফিল—গাছের দেহে সবুজ কণা আছে, যার জন্য একে সবুজ দেখায় এবং এর মধ্যে থাকে কোষের প্লাসটিড। এটা একটা যৌগিক মিশ্র পদার্থ। এরা প্রকৃতভাবে দুইটি জিনিষ মিশ্রণে তৈরী হয়েছে—ক্লোরোফিল A-এর রঙ নীলে সবুজ আর ক্লোরোফিল B-এর রঙ হলুদিযা সবুজ। এই হলদে অংশটিকে বলে ক্যাবোটিন। এলকোহলের সঙ্গে মিলিয়ে ফুটিয়ে গাছের থেকে ক্লোরোফিল বার করা যায।

গাছেও প্রোটিন পাওযা যায। এরা প্রোটোপ্লাজমের বিশেষ অংশ। কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ছাড়া এতে আছে নাইট্রোজেন। অনেক সময সামান্য পরিমাণ সালফার ও ফসফরাস পাওযা যায। সব পদার্থে একই জাতীয় প্রোটিন থাকে না। গমের প্রোটিন C_{685}, H_{1068}, N_{196}, O_{211}, S_{57} ভুট্টা—C_{736}, H_{1161}, N_{184}, S_{3}, মাটি থেকে সংগ্রহ করে S. N. P. সালফেট, নাইট্রেট ও ফসফেট আকারে এবং জাইলেমের মাধ্যমে উপরে টেনে নিয়ে আসে। আলো ব্যতিরেকে পাতায় শর্করা থেকে প্রোটিন তৈরী হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এমাইনো এসিড তৈরী হয। প্রোটিন এমাইনো অম্ল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বিশেষ প্রকার খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি—এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাবলম্বী জাতের গাছের খাদ্য আহরণ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আরও অনেক রকমের গাছ আছে যারা খাদ্য নিজেরা তৈরী করে না।

পরভোজী (Parasite) অন্য গাছের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অনেক ফ্যাঙ্গাস জাতীয বীজাণু আছে তারা সুস্থ সবল গাছের বিশেষ ক্ষতি করে, তারা খুব সরু, তারের মত (Filament) অন্য গাছের দেহে এগুলি ঢুকিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা খাদ্য টেনে নেয়। সপুষ্পক পরভোজীতে ক্লোরোফিল থাকে না। সুতরাং তারা সম্পূর্ণভাবে অন্য গাছের আতিথেয়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে, যেমন বাল্কেশিয়া। আর এক রকম গাছ আছে তারা অন্য গাছের শাখা জড়িয়ে গড়ে উঠে। এদের থেকে এক জাতীয় সরু শিকড় বার হয়,

তার দ্বারা তারা গাছ থেকে খাদ্য টেনে নেয়। এই শিকড়গুলিকে বলে **আকর্ষক** (haustoria)।

আর এক জাতের গাছ আছে তারা সবুজ নয়। তারা অন্যান্য পচা ডালপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। যেমন মোল্ড বীজাণু ও ব্যাঙের ছাতা। এরা পচা পদার্থ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আর এক জাতের সবুজ পরভোজী আছে যারা আধপচা ডালপালা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে।

সিমবায়োসিস—যখন দুই বা ততোধিক বিভিন্ন বীজাণু একত্র মিশ্রিত হয়ে কাজ করে তখন তাকে বলা হয় সিমবায়োসিস্ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বীজাণু শিকড়কে আক্রমণ করে এবং সেখানে একটু ফুলে উঠে। সেখানে বীজাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন জাতীয় মিশ্র পদার্থে পরিণত হতে সাহায্য করে। এরা কেবলমাত্র বাতাস থেকে N_2 টেনে আনতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন সরু রোম (root hairs)। বনের মধ্যে এক জাতীয় গাছ দেখা যায় যাদের শিকড়ের চারিদিকে ফ্যাঙ্গাস জাতীয় বীজাণু শিকড় ঘিরে রেখে দেয়। এই সব শিকড়ে রোম থাকে না। এদের থাকে ফ্যাঙ্গাস জাতীয় হাইফা। এরা এই রোমের কাজ করে। এদেরকে বলা হয় মাইকোরিজা।

অনেক গাছের এই নডুলগুলো একটু লাল দেখা যায়। অনেকে বলেন এর মধ্যে হেমোগ্লোবিন থাকায় এমনি রঙ হয়েছে।

খাদ্য সঞ্চালন—জলের সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে শিকড়ের সাহায্যে গাছের দেহে ঢুকে পড়ে তারপর নানা জাইলেমের মাধ্যমে পাতায় নীত হয় এবং এখানে খাদ্য প্রস্তুত হয়। গাছ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য তৈরী করতে পারে। তখন অতিরিক্ত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখে। যখন প্রয়োজন হয় তখন এই জমানো খাদ্য গাছ গ্রহণ করে। সুতরাং খাদ্য চলাচলের একটা পথ থাকা দরকার। অতি সাধারণ সহজ-দ্রব খাদ্য সহজেই

অদ্রব হয়ে পড়ে এবং এক জায়গায় জমা হয়। অনেক সময় শিকড় স্ফীত হয়ে খাদ্য জমা রাখে, অনেক সময় বীজে খাদ্য জমা থাকে।

খাদ্য মিশ্র যৌগিক অবস্থায় জমা থাকে। যে খাদ্য গাছ খেতে পারে না তাকে আবার সহজ তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করতে হয়। এই সহজ সরল অবস্থায় পরিবর্তন করাকে গাছের হজম শক্তি বলা হয়। যেমন শ্বেতসার পুনরায় আলোক সাহায্যে শর্করাতে পরিণত হয়। জলের সহযোগে বিভিন্ন খাদ্য খাদ্যের রাসায়নিক পদার্থে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন একে বলা হয় হজম পদ্ধতি (digestion)। জলের সহযোগে এটা সম্ভব হয়। আর এই জল গাছ পায় বিভিন্ন enzyme বা উৎসেচক থেকে। এই উৎসেচকগুলি সহজেই মিশ্র যৌগিক পদার্থ ভেঙ্গে সরল ও সহজ পদার্থে পরিণত করতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকটি সহজ উৎসেচক হলো—(১) ডায়াসটেজ। এরা শ্বেতসারকে শর্করাতে পরিণত করে (২) প্রোটেজ—এরা প্রোটিনকে এমাইনো এসিডে পরিবর্তিত করে। (৩) লাইপেজ—চর্বিকে চর্বি জাতীয় অম্লতায় পরিণত করে।

শ্বাস ও প্রশ্বাস (Respiration)—জীবনের বিভিন্ন শক্তির জন্য প্রাণীমাত্রেই ঋণী সূর্যের কাছে। অঙ্গার আত্তীকরণের সময় সূর্য থেকে শক্তি টেনে নিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশে জমা করে রাখে। শ্বাস প্রশ্বাসের সময় স্থিতিশীল শক্তি (Potential) চলমান (Kinetic) শক্তিতে পরিণত হয়। পাতায় যে ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মারফতে পাতার মধ্যে অক্সিজেন ঢুকে পড়ে তারপর সেখানে থেকে বিভিন্ন কোষ মধ্যবর্তী স্থানের মধ্য দিয়ে জীবন্ত কোষের নিকটে আসে। এরই ফলে শর্করা ভেঙ্গে CO_2 ও জলকণার সৃষ্টি হয়।

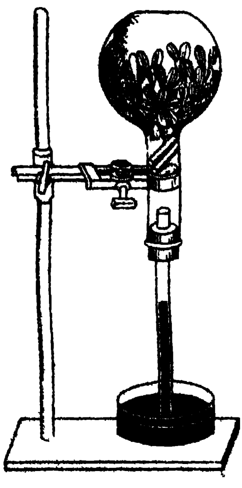
$$C_6H_{12}O_6+6O_2=6CO_2+6H_2O+\text{শক্তি ৬৭৪ ক্যাঃ।}$$

কেবলমাত্র শর্করা নয়, এ ভিন্ন অন্যান্য পদার্থও এই সময়ে অক্সিজেনের সহিত ক্রিয়া করে। CO_2 ও অন্যান্য বাষ্প পাতা থেকে বার হয়ে যায়, রাত্রিতে যখন পাতার ছিদ্রগুলো বন্ধ থাকে তখন বিভিন্ন বাষ্প একে অন্যে পরিবর্তন করে।

সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাস একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যেটা সব সময় প্রাণীমাত্রতেই দেখা যায় এবং এর প্রভাবে শর্করা ভেঙ্গে যায় বা অন্যান্য যে সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত আছে সেগুলি নির্গত হয়। এ শ্বাসপ্রশ্বাস-পদ্ধতিতে গাছ অক্সিজেন টেনে নেয় ও CO_2 নির্গত করে। এটা একটা রাসায়নিক পদ্ধতি যার প্রভাবে শক্তি নির্গত হয় এবং যার উপর নির্ভর করে, জীবনের যাত্রা সুরু হয়।

রাত্রি দিন গাছের শ্বাসপ্রশ্বাস চলে। তবে গাছের শিকড়ের আগায়, কচি ডাঁটার ডগায় ফুল প্রভৃতিতে এর কাজ তীব্রতর হয়। দিনেরবেলা শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে অঙ্গার আত্তীকরণ ও আলোক-সংশ্লেষণ বেশী পবিমাণে হয। কিন্তু অঙ্গার আত্তীকবণে যে অক্সিজেন নির্গত হয তা দিযে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে যে পরিমাণ CO_2 নির্গত হয সেই পরিমাণে বাষ্প আলোক-সংশ্লেষে কাজে লাগে ও ফলে দেখা যায দিনেরবেলা শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণভাবে আলোক-সংশ্লেষেব প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায় কিন্তু রাত্রিতে এব প্রাধান্য থাকে।

প্রমাণ—কতকগুলি অঙ্কুর যোগ্য বীজ ও ফুল একটি ফ্লাস্কে নেওযা গেল।



কোন রকমে যেন সবুজ কোন অংশ এর মধ্যে না থাকে। এইবার ভাল করে ফ্লাস্কের ছিপি আঁটা হলো। এইবাব ১।২ কস্‌টিক পটাশ যষ্টি এব মধ্যে দেওযা হলো। সামান্য তুলাব টুকরাও এর মধ্যে দেওযা হলো যেন এগুলিকে আটকে রাখে। এইবার উপুড করে একটি কাচের নল এই ছিপির মধ্য দিযে নিয়ে পারদপূর্ণ কাচের পাত্রে এনে মিলিয়ে দেওয়া হলো। কযেক ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে পারদ উপরে উঠেছে। পরে দেখা যায় যে আরও পারদ উপরে উঠবে।

আলোক-সংশ্লেষণ	শ্বাসপ্রশ্বাস
১। এই পদ্ধতি গঠনমূলক। এর প্রভাবে গাছে খাবার তৈরী হয়।	১। এই পদ্ধতি ধ্বংসমূলক, যার ফলে খাদ্য সামগ্রী ভেঙ্গে যায় এবং গাছের ওজন কমে যায়।
২। ক্লোরোফিলের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে।	২। রাত্রিদিন শ্বাসপ্রশ্বাস কাজ করে চলে। আলোক ক্লোরোফিলের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না।
৩। সৌর শক্তি জমা করে রাখে।	৩। শক্তি নির্গত হয়।
৪। CO_2 ও জল সহযোগে কার্বো-হাইড্রেট তৈরী হয়।	৪। অক্সিজেন সহযোগে জারক প্রথা (Oxidation) চলে।
৫। আলোক-সংশ্লেষের— $6CO_2+6H_2O+energy=C_6H_{12}O_6+6O_2$.	৫। $C_6H_{12}O_6+6O_2=6CO_2+6H_2O+energy$.

গাছের খাদ্য—যদি রাসায়নিক পদ্ধতিতে গাছের কোন অংশ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যায় এর অনেকটা অংশ তৈরী হয়েছে জল দিয়ে।

গাছেরা খায় যেমন আমরা খাই। আমরা খাই হাত দিয়ে গাছ খায় শিকড় দিয়ে। গাছের দেহ তৈরী হয়েছে কোষের সমন্বয়ে। কোষবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন খাদ্যের।

যদি গাছের কতকটা অংশ নিয়েপরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যায়, এটাকে পুড়িয়ে খানিকটা ছাই পাওয়া যায়। এর পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। এইবার যদি রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে পাওয়া যাবে K, Ca, Mg, Fe, Na, S, P, Cl, Si। এ বাদে খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যাবে Mn, B, Zn, Cu, Mo, (এ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

নপের দ্রবণ (Knop's solution) ঃ

পটাসিয়াম নাইট্রেট KNO_3 ১ ০ গ্রাম।

পটাসিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট KH_2PO_4 ১·০ গ্রাম।

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট $MgSO_4$ ৩·০ গ্রাম।

ফেরিক ক্লোরাইড $FeCl_3$—২।৩ ড্রপ।

জল— ৬ লিটার।

উপরিলিখিত ফরমূলা দিয়ে যদি কোন মিশ্র তরল পদার্থ তৈবী করে সেখানে কোন গাছ লাগান যায তবে গাছ সতেজ হযে গড়ে উঠবে।

বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্প নিযে গাছ গড়ে উঠবে। যদিও বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্পের পরিমাণ কম তবুও তাদেব প্রযোজনীয প্রায় অর্ধেক কার্বন জাতীয পদার্থ এইখান থেকে পাওযা যায। O_2 এবং H_2 জলের সঙ্গে আসে, আব নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কেবল O_2 আসে। এরা গাছকে শক্তি দেয। নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিন তৈরী হয। বাতাসে শতকরা ৭৭ ভাগ N_2 আছে কিন্তু গাছ এর এক কণাও নিতে পাবে না। কোন শক্তির প্রভাবে এই N_2 যখন মাটিতে পড়ে বিভিন্ন প্রক্রিযায গাছের গ্রহণ-যোগ্য হয, তথনই কেবল গাছ সেই পদার্থ নিতে পারে। অনেক সময় গাছ সালফেট আকারে কিছু সালফার গ্রহণ কবে। প্রোটোপ্লাজম ও প্রোটিন তৈরীতে এব প্রযোজন আছে। মাটিতে ফসফেট আকারে গাছ ফসফরাস গ্রহণ করে। এর প্রয়োজন আছে নিউক্লিযাস ও প্রোটিন তৈরীতে। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল আর প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে। যদি গাছের শরীরে অম্লতার পরিমাণ বেশী হযে যায তবে ক্যালসিযাম তাকে নিবপেক্ষ করে। লোহা কোন মিশ্র পদার্থ তৈরী করে না কিন্তু অনেক মিশ্র পদার্থ তৈরী করতে সাহায্য করে। লোহা না থাকলে গাছের রস শুকিয়ে যায।

জল-নিষ্কাশন (Transpiration)—নিজের প্রয়োজনমত গাছ জল গ্রহণ করে, তারপর বেশী জল পাতার উপরের ফুটা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় জল-নিষ্কাশন। পাতার ফুটা দিয়ে বেশীর ভাগ জল বার হয়ে যায়। রাতের বেলা শর্করা থেকে শ্বেতসার তৈরী হলে জল নিষ্কাশিত হয়।

বৃদ্ধি ও গতি (Growth & movement)—জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো বৃদ্ধি। এটা একটা মিশ্র যৌগিক পন্থামাত্র। অনেক সময় দেহের মধ্যে যে সমস্ত খাদ্যজাতীয় পদার্থ আছে সেগুলি ভেঙ্গে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তারই ফলে গাছের বৃদ্ধি হয়। গাছের দেহে ভাঙ্গন ও গঠন ক্রিয়া সমভাবে চলে। বলা যেতে পারে বৃদ্ধি হলো—স্থায়ীভাবে গাছের কোন অংশ বৃদ্ধি হওয়া। বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ওজন বাড়ে। অবশ্য দুই এক জায়গায় ওজন হ্রাসও পায়।

যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকারের গাছ আছে তাদের বৃদ্ধির ফলে কয়েকটি কোষ কেবলমাত্র বৃদ্ধি পায়। তিনটি অবস্থার মধ্যে সে বৃদ্ধি পায়। (১) গঠন অবস্থা—এই অবস্থায় সংখ্যা কোষের বৃদ্ধি হয়। গাছের ডগা, শিকড়ের আগা বাড়ে। (২) দৈর্ঘ্য অবস্থা—এই অবস্থায় কোষ আকারে বাড়ে। ফলে ভ্যাকুযোলের বৃদ্ধি হয়। এইটাই হলো সকর্মক বৃদ্ধির স্থান। (৩) পরিণত অবস্থা—এই অবস্থায় কোষগুলি পরিণত হয়।

গাছের বৃদ্ধি খুব ধীরে ধীরে হয়। তবে লাউয়ের ডগা বা কুমড়া গাছের ডগা দেখলে বেশ বোঝা যায়। বাঁশ গাছ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। অক্সোনিমিটার যোগে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি ধরায়।

গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন

জলকণা—কোষএর জল যে পরিমাণ ঘনীভবন হবে সেই পরিমাণে জল প্রয়োজন হয়। এ ভিন্ন খাদ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জলের প্রযোজন। সেজন্য দেখা যায় যেখানে মাটিতে বেশী জল আছে সেখানে গাছ খুব ভালভাবে লতাপাতায় পূর্ণ হয়।

মাটি—মাটি ভিন্ন অন্য কোন স্তরে ভালভাবে গাছ বেড়ে উঠে না। যে মাটিতে বেশী গাছের খাদ্য আছে সেখানে গাছ ভালভাবে গড়ে উঠে।

অক্সিজেন—শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন অক্সিজেনের।

উত্তাপ—এর ফলে গাছের বৃদ্ধি কম বেশী হয়ে থাকে। বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত উত্তাপ। গাছের বৃদ্ধির জন্য পরিমিত উত্তাপের প্রয়োজন, যার নীচে গাছ ভালভাবে বাড়বে না। ৩০° সে. উত্তাপে গাছ ভাল বাড়ে।

আলোক—যদিও প্রাথমিক অবস্থায় আলোক প্রভাবে গাছের বৃদ্ধি না হয়ে অনেক সময় ক্ষতি হয় তবুও আলোক ব্যতিরেকে গাছ বাড়তে পারে না। ইহা শক্তির একমাত্র উৎস। আলোক-সংশ্লেষের সময় শর্করা জাতীয় পদার্থে শক্তি জমা করে রাখে। তা ভিন্ন আলোক প্রভাবে ক্লোরোফিল তৈরী হয়। আলোকের অভাবে গাছের বিশেষ বিশেষ অংশ হলদে হয়ে পড়ে। ক্রমশঃ খাদ্যের আভাবে মরে যায়।

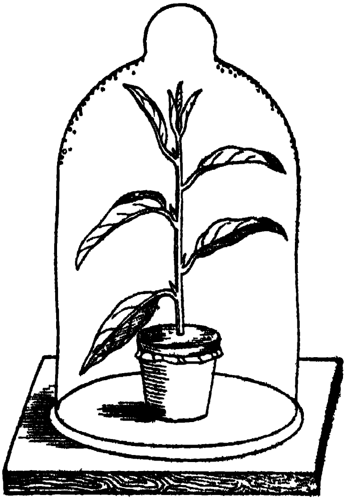
যত সময় আলো পাওয়া যায় তার উপর গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যত সময় গাছ আলোক পায়, সেই সময়টাকে বলা হয় ফটো পিরিয়ডিজম। এর উপর ফুল ফোটা নির্ভর করে। কৃত্রিম উপায়ে আলো কম বেশী করে গাছের বৃদ্ধি ও ফুল ফোটানো কম বেশী করা যাবে।

হরমোন—ইহা গঠনকারী পদার্থ। এর প্রভাবে গাছের বৃদ্ধি হয়। খাদ্য-প্রাণের মত সামান্য পরিমাণ হরমোনের প্রয়োজন হয় গাছের বৃদ্ধির জন্য। গাছের হরমোনকে অক্সিন বলা হয়।

ভার্ণালাইজেশন—বীজ জমিতে ছড়ানোর আগে একটি প্রক্রিয়া করতে হয় যার ফলে সেই বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল দেবে। এই পদ্ধতিতে বীজগুলো জলে ভিজানো হয় যখন বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে সুরু করে তখন জলকণার হ্রাস করা হয়। এইবার এই বীজগুলি পর পর আলো অন্ধকারে রাখা হয় এবং কম ও বেশী তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই বীজ মাঠে ছড়ালে তাড়াতাড়ি গাছে ফল ধরবে।

পাতায় খাদ্য তৈরি হয়। সুতরাং পাতায় যে জল থাকে সে জল একটু ঘন। কিন্তু রাতের বেলা পায়ু বন্ধ থাকে ফলে ফুটার মুখ খুলে যায় এবং এই ছিদ্র মারফৎ জল বার হয়ে যায়। জলো জায়গায় গাছের দেহের বাকল থেকে অনেক সময় জল বার হয়। গাছের দেহ থেকে যে পরিমাণ জল বার হয় তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। একটা ভুট্টা গাছ যখন বেড়ে উঠতে থাকে তখন এর থেকে প্রায় ৫৪ গ্যালন জল বার হয়ে যায়।

পদ্ধতি—একটি টবে একটি গাছ নিয়ে মাটিটা প্যারাফিন দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেওয়া হলো। তারপর এই টবশুদ্ধ ঐ গাছটিকে একটি বেলজার দিয়ে ঢেকে দেওয়া গেল। দেখা যাবে, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে বেলজারের ভিতরের দিকে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে।

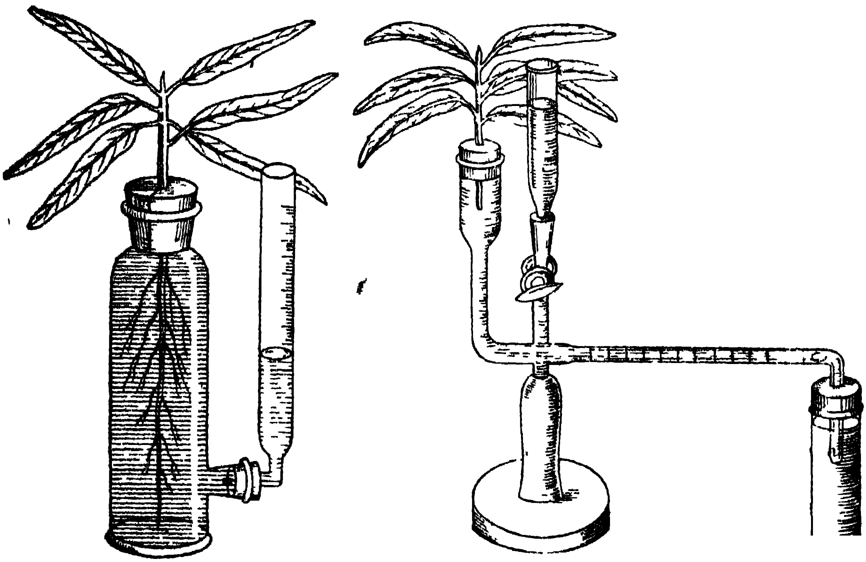


এই জল নিষ্কাশনের সময় জলের ঊর্ধ্বমুখী একটি গতি হয়।

প্রমাণ—চওড়া মুখ বিশিষ্ট একটি কাচের বোতল নেওয়া গেল। এর সঙ্গে যুক্ত আছে একটি কাঁচের নালী; কাঁচের নালীটি উপযুক্তভাবে দাগ কাটা ও মুখটি ভালভাবে ছিপি দিয়ে আঁটা। এইবার একটি শিকড় শুদ্ধ গাছ তুলে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে ছিপির মধ্যকার ফুটা দিয়ে ঐ কাঁচের নালীর মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হলো। যে সমস্ত জায়গা দিয়ে এর মধ্যে বাতাস ঢুকতে পারে সেগুলি ভাল করে এঁটে দেওয়া হলো। দেখা যাবে কিছু সময় পর পাশের দাগ কাটা নালী দিয়ে জল নীচে নেমে এসেছে। এদিয়ে জল-নিষ্কাশন ও জলগ্রহণের পরিমাণ ঠিক করা যাবে।

জল-নিষ্কাশনের পরিমাণ—জল-নিষ্কাশনে বাধা দেয় স্থানীয় বাতাসের মধ্যকার জলকণা। কুয়াশার দিনে জলকণা বাতাসে বেশী পরিমাণ থাকায় গাছ

থেকে জল-নিষ্কাশন কম হয়। আলোর প্রভাবে পাতার ছিদ্রের মুখ বন্ধ ও খোলা হয়। এর প্রভাবেও জল-নিষ্কাশন কমবেশী হয়। উত্তাপ ও বাতাসের প্রভাবেও জল-নিষ্কাশন বেশী হয়। আবহাওয়ার চাপের প্রভাবে জল-নিষ্কাশন কমবেশী হয়। হিমালয়ের উপরে আবহাওয়ার চাপ কম ফলে সেখানে জল-নিষ্কাশন বেশী। গাছ মাটি থেকে জল টানে। সুতরাং মাটির জলের পরিমাণের তারতম্যের উপর জল-নিষ্কাশন নির্ভর করে।



জল-নিষ্কাশনের গতির প্রমাণ—গ্যানঙ্গের ফটোমিটার নেওয়া হলো। ছবির আকারটি লক্ষ্য কর। সমস্ত যন্ত্রটি জলে ভর্তি করা হলো। ছোট একটি শাখা কেটে তাড়াতাড়ি ঐ ফটোমিটারের ছিপির ছোট ছিদ্র দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হলো। সরু নালীটি এমন করে হেলান হলো যেন একটা বাতাসের বুদ্বুদ ঐ নালী দিয়ে চলতে পারে। সমস্ত সংযোগগুলো ভাল করে প্যারাফিন দিয়ে এঁটে দেওয়া হলো। দেখা যাবে ঐ বাতাসের বুদ্বুদটি গাছের টানবার শক্তি অনুযায়ী চলছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্য

(Study of Botanical Character etc.)

গ্রামিনর

বাৎসরিক বা আধাবাৎসরিক, ওষধি জাতীয। খুব কম সময়ে শক্ত কাণ্ড হয কারণ এই জাতীয বাঁশ গাছের কাণ্ড শক্ত।

কাণ্ড গোলাকার নলাকৃতি, পর্বগুলি যুক্ত, পর্বমধ্যে ভিতরটা ফাঁপা।

পত্র সরল ও বিপরীতধর্মী। পত্রের গোড়া কাণ্ড জড়িয়ে থাকে, পত্রমূল ও পাতার সংযোগস্থলে থাকে একটা লম্বা শিষের মত। পাতার মাঝখানে থাকে মধ্যশিরা, আর উপশিরাগুলো মধ্যশিরার গোড়া থেকে বেরিয়ে আগা পর্যন্ত সমান্তরালভাবে বিস্তৃত।

ফুল, পুষ্প মঞ্জরী—ভুট্টার ফুলে স্প্যাডিক্স থাকে। এক একটা ছোট মঞ্জরীতে (spikelet) ২।৩টি ফুল ধরে, ফুল সাধারণতঃ উভলিঙ্গ, অনেক সময় একলিঙ্গ হতে পারে।

এণ্ড্রোসিয়াম—ষ্ট্যামেন ৩, আর এদের এন্থার বেশ লম্বা।

গাইনোসিয়াম—কারপেল ১, গর্ভাশয় বেশ বড়।

গম—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (Triticum Sativum)—ধান ঘাস পরিবারের অন্তর্গত। ধান, আখ প্রভৃতি অন্য কতকগুলি ফসল এই পরিবারের অন্তর্গত। বার্ষিক শস্য—অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে গাছ জন্মায়, ফল দান করে ও মারা যায। ভারতবর্ষে শীতকালে গম চাষ করা হয়।

২½′—৫′ পর্যন্ত লম্বা গাছ হয়। অবশ্য বৃদ্ধি নির্ভর করে বিভিন্ন জাত ও মাটির উর্বরতা শক্তির উপরে। গমের কাণ্ড গোলাকার। ভিতরটা ফাঁপা কেবল গাঁইটের কাছে শক্ত। কতকগুলি জাতের গমের কাণ্ডের ফাঁপা

নলের মধ্যে কিছু জল থাকে। গাছের শৈশবকালে গাঁইটগুলি ঘন থাকে, তারপর গাছ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গাঁইটের দূরত্বও বেড়ে যায়।

গম গাছের গোড়া থেকে ফ্যাঁকড়া (tiller) বার হয়। দুই এক জায়গায় দেখা যায় এই ফ্যাঁকড়ার সংখ্যা ৩০—৫০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এটা নির্ভর করে মাটির উর্বরতা, গাছের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব ও অবস্থার উপর। এই ফ্যাঁকড়াগুলি গজিয়ে উঠে মাটি নিম্নস্থিত গাঁইটের থেকে।

ফ্যাঁকড়াগুলি নানারকমে বেড়ে উঠে। কতকগুলি সোজাভাবে উঠে যায় আর কতকগুলি আগে একটু বেঁকা হয়ে বেড়ে উঠে, পরে সোজা হয়। আবার কতকগুলি বেঁকাভাবে বেড়ে উঠে। গমের আর একটি বিশেষত্ব, গম পেকে গেলে, গাছের মাথা ভারী হয়ে মাটিতে নুয়ে পড়ে যায় (lodging)। এটা নির্ভর করে কাণ্ডের দৃঢ়তা, মাটি থেকে নাইট্রোজেন টেনে নেওয়া ও জল টেনে নেওয়ার উপর। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে গাছের আঁশগুলি (tissue) তরলীভূত হওয়ার ফলে গাছের সিলিকার পরিমাণ কমে যায় ও গাছ পড়ে যায়।

গাছের কাণ্ড খুব দীর্ঘ হয় না। আগা থেকে শীষ বেরিয়ে আসে এবং শীষে ফল ধরে। শীষ বার হওয়ার উপর আশু ও দীর্ঘতর জাত নির্ভর করে। এইভাবে বিভিন্ন জাতের ফসল গড়ে উঠে।

পাতায় মূলতঃ ৪টি ভাগ। (১) পত্রসীমা। (২) গাত্রাবরণ পত্র অর্থাৎ যে অংশ কাণ্ডের গায় জড়িয়ে থাকে। (৩) গাত্র বর্ষাতি অর্থাৎ যে অংশ কাণ্ডের গায় জড়িয়ে থেকে জলের হাত থেকে রক্ষা করে। (৪) গাত্রাবরণের পিছনের দিক, যেটা দিয়ে পাতা কাণ্ড আঁকড়ে থাকে।

বিভিন্ন জাতের পাতার সীমারেখা বিভিন্ন রকমের। পাতার গোড়া দিয়ে প্রায় কাণ্ডের ⅔ অংশ জড়ানো থাকে। পত্রাবরণের রঙ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য যে গাত্রাবরণ থাকে সেটা বার্লি বা যইতে থাকে না।

শীষে ফুল ধরে। লম্বা একটা ডাঁটা কাণ্ডের আগা থেকে বেরিয়ে আসে। থোকা থোকা হয়ে এর গায়ে ফুল ধরে। এক একটিকে বলে স্পাইকলেট। একটি গ্লুমে ঢাকা থাকে। ডাঁটার উপর একটি গাঁইটে একটি ফুলগুচ্ছ থাকে কিন্তু বার্লিতে একটি গাঁইটে তিনটি ফুলগুচ্ছ থাকে। কাণ্ড লম্বা হয়ে যে অংশে ফুল জন্মায় সেটাকে বলে র‍্যাচি। ফুলগুচ্ছ একটি অপরটির অন্তদিকে জন্মায়। এই শীষগুলি (Rachis) যবের বেলায় একটু চ্যাপ্টা হয় কিন্তু গমের শীষ সব সময় গোলাকার। শীষে প্রতি গাঁইটে একটা পর্দা থাকে।

ফুলগুচ্ছ বিভিন্ন জাতের বেলায় বিভিন্ন রকমের হয। কারও গোড়ার দিকে ঘন হয আবার কারও বা আগার ফুল গুচ্ছ আকারের হয। শীষের গাঁইট থেকে যেখানে ফল ধরে সেটা একটা ছোট শিষের মত লম্বা থাকে, একে বলা হয় অন। এই অনগুলি গোড়া থেকে শীষের উপরের দিকে যেতে যেতে ছোট হতে থাকে। এরা মাথার কাছে এসে একেবারে ছোট হয়ে যায। বিভিন্ন জাতের উপর এই অনের দীর্ঘতা নির্ভর করে। ডুবাম জাতের অনগুলি খুব লম্বা কিন্তু রুটি-গমের অন অতটা লম্বা নয। অনবিহীন গম খুবই কম দেখা যায। যেগুলির অন এক সেন্টিমিটারের মত লম্বা তাকে বলা হয অনবিহীন আর যাদের এর থেকে বেশী লম্বা তাদেরকে বলা হয় স-অন। এদের দীর্ঘতার উপর বিভিন্ন জাত নির্ভর করে। অনের রঙ নানা রকমের হতে পারে—কাল, লাল, ধূসর ইত্যাদি। এগুলি নির্ভর করে আলো, উত্তাপ ও জলকণার প্রভাবের উপর।

ফুলের তিনটা স্ট্যামেন থাকে—লম্বা এনথার আর সূত্রবৎ আঁশ। গর্ভকোষ মাত্র একটি। দুটি লোডিকিউল থাকে, এরা ফুলটাকে খুলে ফেলে। ফুল ধরতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগে। প্রথমে মূল গাছে শীষ হয় পরে ফ্যাকড়াতে ধরে। গম স্বয়ং প্রজনিত (self fertilized) শস্য। কখনও কখনও বিভিন্ন গাছের মধ্যে প্রজনিত হয়। গরম দেশে স্বয়ং প্রজনন বেশী। দেখা গেছে ঠাণ্ডা অঞ্চলে বিভিন্ন ফুলের মধ্যেও প্রজনন চলে।

ঘাস জাতীয় ফসলের মত ফ্যাঁকড়া থাকে। অঙ্কুরোদ্গমের সাথে সাথে শিকড় মাটির নীচে চলে যায়। অস্থায়ীমূল গড়ে উঠার পর স্থায়ীমূল উৎপন্ন হয়। মাটির নীচে অন্ততঃ ২" নীচে অস্থায়ীমূল গেলে স্থায়ীমূল গড়ে উঠে। এই স্থায়ীমূলগুলি প্রথমে পাশের দিকে ছড়িয়ে যায়। পরে নীচের দিকে যায়।

ধান—ইহা ঘাস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। জলাভূমির উপযোগী বার্ষিক ফসল। ৫' ফু. পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। একটা গাছ থেকে অনেকগুলি ফ্যাঁকড়া বার হতে পারে। মাটির নীচের প্রত্যেক পাতার মূল থেকে ফ্যাঁকড়া বার হয়। একটা গাছে ৭০টা পর্যন্ত ফ্যাঁকড়া পাওযা যায়। ফ্যাঁকডাগুলি একই গাঁইট থেকে বার হয। গাঁইটেব অন্তবর্তীস্থান ফাঁপা। কেবল গাঁইটগুলি পূর্ণ ও শক্ত। গভীর জলের ধান কেবল জল বাড়ার সঙ্গে লম্বায় বেড়ে চলে।

পাতা অনেকটা গমের মত। কেবল পাতাগুলি লম্বা। মাঝখানে প্রধান শিরা থাকে। ফুল পানিফুল জাতীয়, পাশ থেকে চাপা। লেমা ও প্যালিরেণু একই আকারের, সবগুলির অন থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। ধানের ফুলের মধ্যে ৬টা স্ট্যামেন থাকে।

ধান স্বপ্রজনিত ফসল। যদিও বিভিন্ন ফুলের মধ্যে অনেক সময় প্রজনিত হয়। এর পরাগযোগের পার্থক্য দেখা যায—বাতাস, জলকণা ও আলোর প্রভাবে। অনেক সময ফুল ফুটবার আগেও পরাগযোগ সংঘটিত হয ফলে কৃত্রিম পরাগযোগ ধানের ক্ষতিকর। বন্য ধানে ফুল ফুটে, এন্থার ফেটে যাওযার কযেক মিনিট পরও পরাগযোগ সম্ভব হয না। অনযুক্ত ও অনবিহীনতার প্রকারেব উপর নির্ভর করে। দীর্ঘতা নির্ভর করে আবহাওযার উপর।

ধানের গুচ্ছমূল। গাঁইট থেকে গোলাকারে বহুমূল বার হয। মৃত পাতার গাঁইট থেকে অনেক সময শিকড় বার হয়। মাটির নীচে ৬"—১৮" ই.-এর মধ্যে ধানের শিকড় থাকে। প্রথম তিনটি গাঁইট থেকে সহায়ক শিকড় বার হতে পারে (adventitious)। এটা ঘটে মাঠের জল কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

ধানের অনেক জাত আছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর এর বৃদ্ধি নির্ভর করে। উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় ধান ভাল জন্মায। এই গাছ নাইট্রেট জাতীয নাইট্রোজেন থেকে এমোনিযাম জাতীয নাইট্রোজেন বেশী নিতে পারে।

৮ হাজার ফিট উপরে হিমালযে ধান করা যায় আবার বাংলাদেশের নীচু জমিতেও ধান হয। বিভিন্ন জাতের ধান বিভিন্ন আবহাওযা সহ্য করতে পারে। কাদামাটির জমিতে ভাল ধান জন্মায। ধান উৎপাদনের প্রধান প্রযোজন জল। ফলে যে মাটির নীচে জল অন্যান্য মাটির অপেক্ষা বেশী আছে সেখানে ভাল ধান হয।

ম্যালভেসী (Malvaceae)

গাছ—ওষধি জাতীয, ঝোপানো বা বৃক্ষ জাতীয হতে পারে। ডাটায বা কাণ্ড হুড়হুড়ে হয।

পাতা—সরল, বিপরীতমুখী, খাঁজ কাটা পত্রমূলে আকর্ষের মত থাকে (Stipule)।

ফুল—সম্পূর্ণ ও নিযমিত, উভলিঙ্গ।

বৃতি—৫টি মুক্ত।

পুষ্পদল—৫টি পাপড়ি, সব সমযই মুক্ত থাকে তবে কখনও কখনও যুক্ত হয।

এণ্ড্রোসিয়াম—ষ্ট্যামেন অনেকগুলি গর্ভদণ্ড উঁচু-নীচু আকারের আর এতে থাকে একটি লোব।

গাইনোসিয়াম—কারপেল ৩ থেকে অনেক বেশী হতে পারে। গর্ভাশয বড এবং উপরের তিনটির বেশী কক্ষ থাকে। অমরা (Placentation) একপাশ্বায়, ষ্টাইল লম্বা, ষ্টিগমা মুক্ত। কারপেলের সংখ্যানুযায়ী দল হয়ে থাকে।

বীজ—বীজ আম্বার থাকে।

সাধারণ গাছ—তুলা, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

তুলা—ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিব্যেপে তুলার চাষ হয়। এই তুলা দিয়ে কেবলমাত্র আমাদের দেশের কাপড়ের কলগুলি চলে না। পূর্বে এই তুলা বিদেশেও রপ্তানি হতো। কিন্তু আজ আমাদের দেশের চাহিদা বেড়ে যাওযার ফলে এখন আর রপ্তানি করা যায না।

জলবায়ু ও মাটি—তূলা চাষের জন্য উষ্ণ জলবায়ুর প্রযোজন। উত্তাপ যেন ৭৭° ফা.-এর কম না হয। যে সময গাছ বেড়ে উঠবে সে সমযের মধ্যে যেন অন্ততঃ ২০" ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। যে মাটিতে প্রকৃষ্ট পরিমাণে কার্বন জাতীয পদার্থ আছে সেই মাটিই বিশেষ উপযোগী। pH ৫'২ থেকে ৭-এর মধ্যে থাকলেই চলে। যেথানে একটু বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে প্রচুর পবিমাণে মিশ্র সার দেওযা যেতে পারে। কিন্তু যেথানে কম বৃষ্টি হয সেখানে খুব কম সাব দেওয়া উচিত।

তুলা—ম্যলিয জাতীয় গাছ (Malvaceae) সাধাবণতঃ দুই জাতীয গাছ দেখা যায—গসিপিযাম হিরসুটাম আর গসিপিয়াম বারবাডেন্স। অনেক সময় বৎসরের একবার কখনও দুবাব ফসল দেয। গাছের গুচ্ছ শিকড (tap) ২-৪ ফিট পর্যন্ত মাটির নীচে যায। প্রধান কাণ্ড সোজা, তার থেকে ডাল-পালা বার হয। সাধারণতঃ গাছ ২-৩ ফিট লম্বা হয়। তূলা গাছের সহকারী কুঁড়ি থেকে উদ্ভিজ্জ শাখা ও ফলের শাখা বার করা হয। পাতাগুলি গোলাকারে সাজানো। পামেট এবং ৩, ৫, ৭, এমন কি নযটি লোব থাকে।

ফলের শাখায ফুল ফোটে। শাখার আগায় তিনটি কখনও কখনও চারটি পাতার মত থাকে ; একে ব্রাকট বলে। সব্রাকট কুঁড়িকে স্কোযাব বলে। ফুল বড় এবং নানা রঙের হয। ওভারিতে ৩—৫ টা ভাগ থাকে—এক একটিকে বলে লক (lock)। প্রতিটি লকে একটি করে স্টাইল ও ষ্টিগমা থাকে। পিষ্টিলের চারিদিককার নলকৃতির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে স্ট্যামেন।

তুলাফুলে একক বা দ্বৈত প্রজনন ক্রিয়া হতে পারে। ঢাকনি আকারে ফল গড়ে উঠে। প্রতিটিতে একটি করে লক ও আঁশ থাকে। প্রতিটি

লকে থাকে ৬ থেকে ১০টি বীজ। চুলের মত আঁশ বীজের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। লম্বা আঁশগুলোকে বলে staple। আমেরিকার বীজগুলি শক্ত সুতা দিয়ে ঢাকা থাকে।

তুলাব আঁশগুলা বেড়ে উঠলে বীজটা চ্যাপ্টা হযে যায়। উঁচু জমিতে যে তুলা হয় তার আঁশের দৈর্ঘ্য ১" ই.-এর কম। কিন্তু লম্বা জাতের তুলার আঁশ ২" ই. পর্যন্ত হতে পারে।

কৃষিপদ্ধতি—এক একর জমিতে এক বুশেল বীজের প্রয়োজন। সাধারণতঃ ½ থেকে ১ বুশেল বীজ লাগে। বীজ মাটিতে এক ইঞ্চির বেশী নীচে পোঁতা উচিত নয। পাহাড়ের গাযে জমিতে ১৮" অন্তর, কিন্তু উর্বর মাটিতে গাছের অন্তর দূরে দূরে রাখা হয়। আর মাটি খুব ভাল না হলে একটু ঘনসন্নিবেশ করা হয়। তূলা সংগ্রহ আরম্ভ হয় সেপ্টেম্বর মাসে। সমস্ত তুলা পবিপুষ্টতা লাভ না করলে তোলা উচিত নয়। পরিপক্ক হলেই তুলতে হবে। তা নাহলে নষ্ট হযে যেতে পারে। ক্ষেতে তুলাগাছ করলে আগাছা বাড়তে পাবেনা। পাতাগুলি জমিতে প৲ড় মাটিকে উর্বর করে তোলে।

পোকা ও রোগ—বল পোকা। গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাছকে এই পোকা আক্রমণ করে। গাছের কচি পাতা খেযে বাঁচতে সুরু করে। গাছে ফুল ধবার সঙ্গে সঙ্গে পোকাগুলি ডিম পাড়ে। ডিম ফেটে বাচ্চা বার হতে ১০।১২ দিন সময লাগে। বাচ্চাগুলি বড হয়ে ২।৩ দিনের মধ্যে গাছের পাতা খেতে সুরু করে। এরা বলগুলিকে আক্রমণ করে। গাছের ফুল ধরবার আগে ক্যালসিযাম আরসিনেট ছড়ালে পোকা দূর হয়।

কাট পোকা—ঝোলাগুড় বা জলের সঙ্গে, সাদা আর্সেনিক বা সোডিয়াম আর্সিনেট মিশিযে আক্রান্ত স্থানে ছড়ালে পোকা ধ্বংস হয়।

তুলা ফড়িং—গন্ধক ছড়িয়ে বিনাশ করা যায়।

লাল মাকড়সা—চুণের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে ছড়ালে লাল মাকড়সা বিনাশ করা যায়।

কিউকারবিটা (Cucurbitae)

গাছ—আকর্ষ থাকে আর এর প্রভাবে আঁকড়িয়ে উপরে উঠে।

পাতা—সরল, বিপরীতমুখী, মধ্যশিরা থেকে উপশিরা বার হয়।

ফুল—অসম্পূর্ণ, নিয়মিত, একলিঙ্গ।

বৃতি—পাঁচটি সেপাল এবং যুক্ত।

পুষ্পদল—পাঁচটি পাপড়ি এবং যুক্ত। ঘণ্টাকৃতি।

এণ্ড্রোসিয়াম—পুং পুষ্পে ষ্ট্যামেন ৫টি।

গাইনোসিয়াম—কারপেল ৩টি এবং যুক্ত। গর্ভাশয় নীচে। সাধারণত একটি কক্ষ কখনও কখনও তার বেশীও হতে পারে। ষ্টাইল ১টি, ষ্টিগমা ৩টি।

সাধারণ গাছ—লাউ, কুমড়া তরমুজ ইত্যাদি।

লাউ, কুমড়া (Gourd)—পৃথিবীর সবদেশে এরা সব্জী বলে পরিগণিত। দ্বিবীজপত্রী গাছ, গাছের আয়ুকাল প্রায় ৬ মাস। বৎসরে ২টি ফসল পাওয়া যেতে পারে, বর্ষাকালীন কুমড়া ও চৈতী কুমড়া। এদের আকর্ষ থাকে। এর প্রভাবে মাটিতে ডগা এগিয়ে চলে কিম্বা কোন অবলম্বন প্রভাবে উপরে উঠতে পারে।

পাতা বিপরীত আর তার মূলে থাকে আকর্ষ। এই আকর্ষ প্রভাবে গাছ লতিয়ে চলে। প্রয়োজন হলেও এর প্রভাবে কোন উঁচু মাচায় বা ঘরের চালে উঠতে সাহায্য করে। পাতার আগা কাটা। পত্রমূল থেকে শিরা উপশিরা বার হয়ে পাতার কিনারা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। যেখান থেকে পাতার বৃতি বার হয় সেখান থেকে ফুল বার হয়। ফুলের গোড়ায় থাকে একটা আকর্ষ।

কুমড়া ফুল একলিঙ্গ। পুং-পুষ্প দূর থেকে হলদে দেখায়। দলের নীচে কোন স্ফীত অংশ থাকে না। প্রজননের জন্য এর প্রয়োজন থাকলে অনেক সময় দেখা যায় এরা শুকিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীপুষ্প প্রথম থেকে গোড়ায় স্ফীত গোল.আকার নেয়। উপরে থাকে গর্ভকোষ।

ক্রুসিফেরা (Cruciferae)

গাছ—ওষধি জাতীয়। অনেক সময় চোখ জ্বালা করে এমন রস থাকে।

পাতা—গাঁইট থেকে বার হয়।

ফুল—রেসিমোজ জাতীয়। সম্পূর্ণ, নিয়মিত, উভলিঙ্গ।

বৃতি—সেপাল ৪টি বৃত্তাকারে থাকে।

পুষ্পদল—পাপড়ি ৪টি; খাঁজ কাটা।

এণ্ড্রোসিয়াম—স্ট্যামেন ৬টি, গোড়ায় থাকে রসধারা।

গাইনোসিয়াম—কারপেল ২টি এবং যুক্ত। গর্ভাশয় উপরে।

সাধারণ গাছ—সরিষা, মূলা ইত্যাদি।

সরিষা (Cruciferae)—ভারতবর্ষে যত রকমের সরিষার ফসল হয় তার মধ্যে সারসন্, রাই, টোরিসা এবং স্কোথা জাতীয় সরিষাই প্রধান। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ইউরোপীয় দেশ থেকে আমদানী হয়েছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণের দেশ থেকে উত্তর অঞ্চলে বেশী পরিমাণ জমিতে সরিষা উৎপন্ন হয়।

রাই সরিষা ভারতে বেশী উৎপন্ন হয়। গাছগুলি ৩—৫' ফিট লম্বা হয়। সোজা এবং ঝাঁকড়া, গাছের অনেক শাখা-প্রশাখা থাকে। একই গাঁইট থেকে পাতা বার হয় না কিংবা পাতা কাণ্ড জড়িয়ে থাকে না। কাণ্ডের গাত্র থেকে বেরিয়ে আসে। পাতার বোঁটা আছে। যেখানে কাণ্ড বা প্রশাখা শেষ হয়ে যায় সেইখানে ফুল ফোটে। ফলগুলি ১"—২" লম্বা, চওড়া প্রায় ⅙"। বীজগুলি খুব ছোট—কাল বা লালচে ধূসর রঙের হয়ে থাকে।

সারসন জাতীয় সরিষার গাছ রাই সরিষার মত লম্বা হয় না, আকারে একটু ছোট। পাতার আকার ও বিভিন্ন পাতা দেখে গাছ চেনা যায়। পাতাগুলি কাণ্ড জড়িয়ে থাকে। ফলও খুব বেশী হয় ফলে ঘনাকার ধারণ করে। আকারে ছোট—বীজগুলিও খুব ছোট। বীজগুলি একটু হলদেটে কিংবা লালচে ধূসর। বীজাবরণ মসৃণ।

রাই সরিষার পাতাগুলি খাঁজ কাটা, বোঁটা আছে, কাণ্ড জড়িয়ে থাকে না। ফলগুলি লম্বা।

সেওহা জাতীয় সরিষা বাৎসরিক ফসল। গাছ ২—৪′ ফিট লম্বা হয়। কাণ্ড শক্ত। কাণ্ড ছোট ছোট লোমে ভর্তি। পাতার বোঁটা থাকে। ফুলগুলি বাসেম জাতীয়। ফুলের পাপড়ি কাটা। ফুলগুলি দ্বৈত প্রজনিত। এইটা অন্যান্য জাতীয় সরিষার সঙ্গে তফাৎ। ফলগুলি আকারে ছোট।

সরিষা শীতকালীন রবি ফসল। নানা রকমের জমিতে হয়। গাছ ৪″ ইঞ্চি লম্বা হলে ফুল হয়। তারপর তার ডালপালা গজায় এবং সেখানে ফুল ধরতে থাকে।

লেগুমিনাস (Leguminoseae)

গাছ—ওষধি জাতীয়, ঝোপানো ও বৃক্ষজাতীয় বড় হতে পারে। কখনও কখনও আকর্ষ থাকে, এরা এর প্রভাবে আঁকড়ে উঠে। শিকড়ে নডুল বীজাণু থাকে।

পাতা—সাধারণতঃ মিশ্র, বিপরীত, পত্রমূলে ষ্টিপুল থাকে।

ফুল—সম্পূর্ণ, নিয়মিত, উভলিঙ্গ, রেসিম ধরণের, প্যানিকেল।

বৃতি—পাঁচটি সেপাল, মুক্ত বা যুক্ত হতে পারে।

পুষ্পদল—পাপড়ি ৫টি কখনও কখনও ৪টি থাকতে পারে। মুক্ত।

এণ্ড্রোসিয়াম—ষ্ট্যামেন সাধারণতঃ ১০টা। যুক্ত বা মুক্ত হতে পারে।

গাইনোসিয়াম—কারপেল ১টি গর্ভাকার বড় ও উপরে।

সাধারণ গাছ—মটর, বকফুল।

ছোলা (Gram)

লেগুম জাতীয়। অনেক শাখাপ্রশাখা থাকে। এক বৎসরে ২—৩″ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছ সোজা ও লম্বা হয়। কাবুলি ছোলা জাতীয় গাছ একটু

বেশী লম্বা হয়। কাণ্ড থেকে যে শাখা বার হয় সেই শাখা থেকে একটার বেশী প্রশাখা বার হয় না। কয়েক জাতের গাছ আছে যাদের বেশী শাখা-প্রশাখা বার হয়।

পাতাগুলি পিনেট মিশ্র ধরণের, তার ডগায় থাকে একটা পাতা। বিভিন্ন জাতের ছোলায় থাকে বিভিন্ন রকমের পাতা। পাতায় রঙের পার্থক্য থাকে। কতকগুলি ফিকে সবুজ আর কতকগুলি গাঢ় সবুজ আবার কতকগুলি থাকে লাল।

ফুল নানা রঙের হয়—কোনটা সাদা, কোনটা হলদেটে, কোনটা বা ঈষৎ লালচে। একটি ফুল হয়। যেখানে পাতা বার হয় তার উল্টা দিকে ফুল ধরে। বীজাধারের দুটি খোলা থাকে। একটি ফলে ২।৩টি বীজ থাকে। ফুলগুলি একক প্রজনিত।

বীজের আকারে ও রঙে পার্থক্য থাকতে পারে। কতকগুলির বীজ সাদাটে কতকগুলি হলদেটে আর কতকগুলি ধূসর রঙের হয়ে থাকে। একই গাছের বীজের রঙের পার্থক্য থাকতে পারে কারণ ফল পাকবার সময় যদি আবহাওয়া অনুকূল না হয় তবে এই পার্থক্য বেশী দেখা যায়।

গাছের শিকড় পরিমাণে খুব বেশী। মূল শিকড় থেকে অনুশিকড় বার হয়।

অড়হর (Cajamuss Indica Spriny)—অনেক সময় একে বলা হয় "পিজেন পি"। বাংলা দেশের সীমান্তে বিহার, আসাম ও উত্তরপ্রদেশে সাধারণতঃ এগুলি ভালভাবে জন্মায়। আর আশু জাতের অড়হর ভাল জন্মায়—মধ্যভারত ও বোম্বাই প্রদেশে। গাছ প্রায় ৫'—৬' লম্বা হয়ে মাথায় ঝোপ হয়। দ্বিবাৎসরিক ফসল কিন্তু এদেশে বাৎসরিক ফসল হয়ে জন্মায় তার কারণ দ্বিতীয় বৎসরে ফসলের পরিমাণ খুব কম। গাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে মাটির উর্বরতার উপর। গাছের উপরের দিকে

অনেক ডালপালা জন্মায়। শাখা-প্রশাখাগুলি সোজাভাবে বেড়ে যায় কিংবা অনেক সময় বেঁকেও যায়।

পাতা তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ছোট পাতা সবদিকে গজায়। আর পাতার নীচের দিকটা ধূসর রেশমের মত। পাতার সবুজ রঙ নির্ভর করে বিভিন্ন জাতের উপর। ছোট পাতার ধরণ ও অন্যান্য জিনিষগুলিও নির্ভর করে বিভিন্ন জাতের উপর।

প্রশাখার ডগায় ফুল ফোটে। প্রান্তিক ফসলের গাছের ডগায় অনেকগুলি ফুল একসঙ্গে ফোটে। অনেক সময় আশু জাতের ফসলে ডালের গাঁইটে ফুল ধরে। সব থেকে নূতন এইখানে যে, এই গাছের বীজ প্লেকে গেলেও গাঁইট থেকে ফুল ধরতে থাকে। একক প্রজনিত। অনেক সময় পতঙ্গের সহায়তায় বিপরীত প্রজনন হয়ে থাকে।

ফুলের মাধ্যমে এই গাছ চেনা যায়। ফুলই এর বিশেষত্ব, কিন্তু ফুলের পরিপূর্ণতা পেযে ফল ধরবার আগেই অনেক ফুল পড়ে যায়। এটা নির্ভর করে যখন তার ফুল ধরে সেই সময়ের আবহাওযার উপর। স্যাঁত্‌সেঁতে মেঘপূর্ণ আবহাওযার জন্য এই ফুলগুলি পড়ে যায়।

বীজাধারের মধ্যে আড়াআড়িভাবে বীজগুলি সাজানো থাকে। বীজাধারগুলি নানা রঙের হযে থাকে। সবুজ থেকে ধূসর পর্যন্ত। এই দুই রকমের মাঝামাঝি হলো সবুজ রঙের। বীজাধারের মধ্যেকার বীজের সংখ্যা কম বেশী হয়ে থাকে। এক একটি শুঁটিতে ৪।৫টি বীজ থাকে। তারাও নানা রঙের হয়ে থাকে।

মূল শিকড় থেকে পাশে শিকড় বার হয়ে যায়। তারপর তার থেকেও অনেক সময় শিকড় বার হয়। এদেশে এই ফসল খুব বেশী হয়। তার কারণ লম্বা শিকড় নীচের মাটি ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

কীট ও পতঙ্গ

(External Characters and life history of insects)

চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর কীট ও পতঙ্গ ফসলের ক্ষতি করে আবার অনেক সময় মাটির উন্নতিও করে।

১। এনেলিডা—যেমন, কেঁচো।

২। নেমাটোডা—গোলাকার কীট, যেমন এলকীট।

৩। মোলুসকা—যেমন, শামুক।

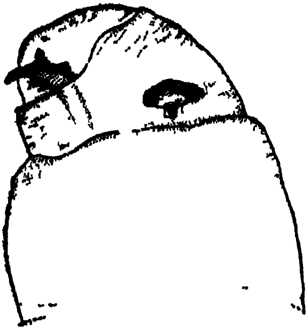
৪। এনথোপোডা—মাকড়সা, উইপোকা, বহুপদী ও শতপদী।

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়ে এনথ্রোপোডা শ্রেণী পতঙ্গের দেহ তৈরী হয়। এনথোপোডা ৪ রকমের দেখতে পাওয়া যায় (১) ক্রসটেসিয়া—যেমন, উই, চিংড়ী, কাঁকড়া, গলদাচিংড়ী। (২) এবাকনিডা—যেমন মাকড়সা, মাটির উই, বিছা ইত্যাদি। (৩) মাইরিয়াপোডা—যেমন, বহুপদী, শতপদী। (৪) হেক্সাপোডা—যেমন, পতঙ্গ।

এনথ্রোপোডা বিভাগের হেক্সাপোডা বা ছয়পদ বিশিষ্ট পতঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে পতঙ্গ বলা হয় কারণ এদের দেহের তিনটি বিশেষ অংশ জোড়া থাকে। যেমন—মাথা, গলা ও পেট। মাথায় থাকে এক জোড়া বেতারের শূন্যের তারের মত, গলায় থাকে তিন জোড়া পা, আর পেটে কোন পা বা কিছুই থাকে না।

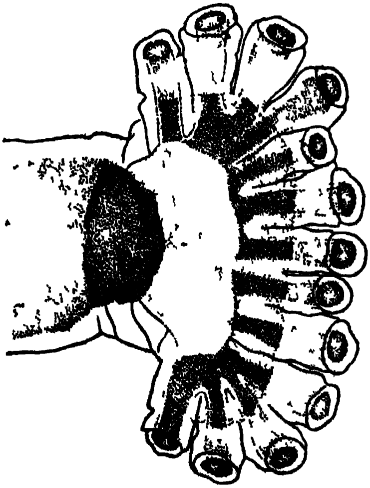
মাথা—মাথাটি দেখলে মনে হয় যেন এর বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে সারা মাথাটি তৈরী হয়েছে। পতঙ্গের দুই প্রকার চোখ আছে। সাধারণ

চোখ আর মিশ্র চোখ। অধিকাংশ পতঙ্গের মাথার উপরে ত্রিকোনা আকার নিয়ে তিনটি সাধারণ চোখ থাকে। মিশ্র চোখ থাকে সাবা মাথার উপবের অংশ জুড়ে। পতঙ্গেব মুখের দুইটি অংশ। একটি দ্বাবা কামডায় আর অপবটির দ্বারা হুল ফুটিয়ে দিযে রক্ত টেনে নেয়।



বাঁধাকপিতে যে পোকা লাগে তার মাথা

বোলতা, ফড়িং ইত্যাদি পতঙ্গের মুখ দেখে চেনা যায। উপবেব ঠোঁট দিযে এদেব মুখগহ্বব ঢাকা থাকে। এব নীচে থাকে তিন পাটি চোযাল। নীচের ঠোঁট মিশ্রিত পাটি বেশ শক্ত আর মাত্র একটি পাটি দিযে তৈবী। মাঝখানের পাটির অনুভব শক্তি খুব বেশী থাকে কিন্তু পাটিটি মিশ্র আকাবের। নীচেব পাটি দিয়ে খাদ্যের আস্বাদন করে। নীচেব থেকে চোয়ালে এনে মুখ বন্ধ করে। শুঁযাপোকা জাতীয পোকাব মুখের পাশ দিয়ে লালা বাব হয় অনেকটা বেশমেব মত।

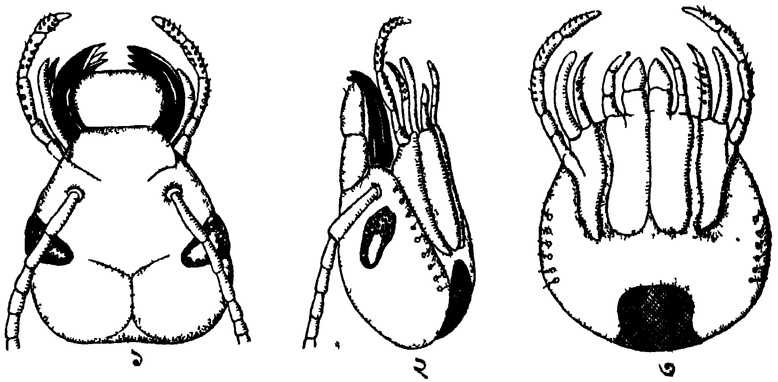


বর্দ্ধিত শ্মরাফেল

মুখ—মৌমাছি, প্রজাপতি, মশা, ছারপোকা ইত্যাদির মুখ এমনভাবে তৈরী যেন তারা তরল পদার্থ খেতে পারে। মাছির চুষে খাওযার ক্ষমতা কম। মৌমাছির চুষে খাওয়ার জন্য উপরের চোয়াল সূচাল থাকে এবং নীচের চোয়াল এমনভাবে তৈরী থাকে যেন সহজে মোম ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে পারে। প্রজাপতির

লম্বা চোষণ অংশ যখন কাজে লাগে না তখন মাথার দিকে বাঁকান থাকে। মশক, ছারপোকা ইত্যাদির হুল থাকে যেটা ফুটিয়ে দিয়ে অনায়াসে তরল পদার্থ চুষে নিতে পারে।

ক্ষতিকর পতঙ্গ চোয়াল দিয়ে পাতা ছিঁড়ে দেয়। এগুলিকে লেড আরসেনেট ও ক্যালসিযাম আরসেনেট দিয়ে মেরে ফেলা যায়। এগুলিকে



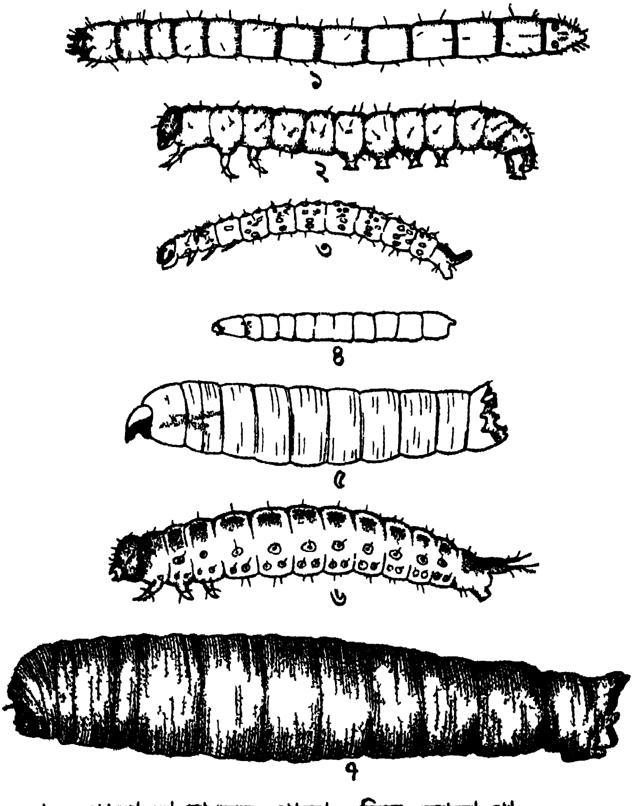
১। এয়ার উইগের মাথা ২। পাশ থেকে মাথা নীচের থেকে মাথা

নিকোটিন, রটেনন্ বা ডি, ডি, টি, দিয়ে ধ্বংস করা যায়। যে সমস্ত পতঙ্গ কামড়ায় সেগুলি গাছের রোগের জীবাণু বহন করে না। কিন্তু যারা হুল ফুটিয়ে তরল পদার্থ চুষে নেয় তাদের দ্বারা ভাইরাস রোগের বীজাণু ছড়িয়ে পড়ে।

যেটা দিয়ে মাথা ও পিছনের অংশ জোড়া থাকে সেটাকে বলে থোরাক্স বা গলদেশ। পিছনের পেটের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে বোঝাই যায় না এর শেষই বা কোথায় আর সুরুই বা কোথায়। তিনটি অংশ যুক্ত হয়ে গণ্ডদেশ সৃষ্টি করে। প্রথম সামনের অংশ, দ্বিতীয় মধ্য অংশ, আর তৃতীয় পিছনের অংশ। পা এবং ডানা ইহাতেই জোড়া থাকে। তিনটি অংশে তিন

জোড়া পা থাকে। যখন কোন পতঙ্গের ডানা থাকে তখন মাঝের ও পিছনের অংশে পাগুলি জোড়া থাকে।

পতঙ্গের পায়ের পাঁচটি অংশ। (১) কক্সা, (২) ট্রোকানটার, (৩) ফিমার, (৪) টিবিয়া ও (৫) টারসাস। ট্রোকানটাব সাধাবণতঃ তিনকোণা অংশ। ফিমার বা উরুদেশ শক্তিশালী অঙ্গ। ফড়িং-এর এগুলি বেশ শক্ত ও এমনভাবে তৈরী যেন লাফ দিতে পারে। টিবিয়া লম্বা ও সরু। অনেক সময় এর উপর চুল থাকে।



১। তার পোকা বা চালের পোকা—তিন জোড়া পা

২। ক্যাটার পিলারের মথ ও তার তিন জোড়া পা।

৩। ফ্লি পোকা ও তার সামনের তিনটা পা। পিছনের ভুয়া পা।

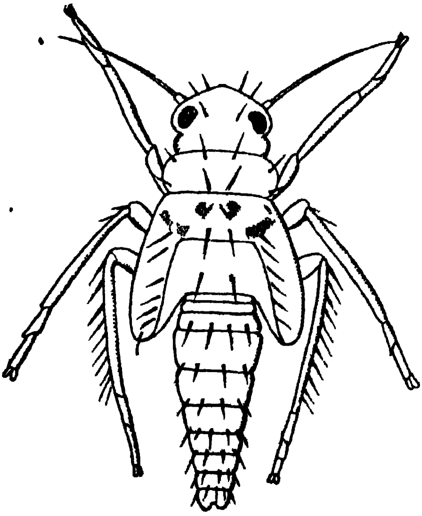
৪। ফ্রিট মাছির ম্যাগাট, মাথা ছোট এদের পা নেই।

৫। গমের শত্রু হাইনেমিয়া।

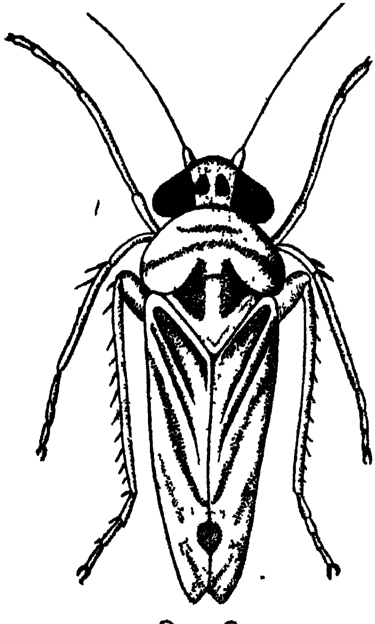
৬। গমের পোকা ও তার সামনের তিনটা পা। পিছনে ভুযা পা।

৭। চর্ম জ্যাকেট আকারে বেশ বড়।

সব পতঙ্গের ডানা থাকে না। ডানার আকার ও সংখ্যা দিয়ে শ্রেণী-বিভাগ করা হয। প্রজাপতির থাকে দুটি ডানা। পিপীলিকা, মৌমাছি, বোলতার থাকে খুব পাতলা দুটি ডানা। ডানার মাঝখানটায় একটা পুরু দাগমত থাকে। অনেক পতঙ্গ আছে যাদের ডানা দেহের সঙ্গে যুক্ত হওযার জাযগা একটু পুরু কিন্তু সীমান্তদেশ স্বচ্ছ।



বর্দ্ধিত ডানা বিশিষ্ট ফড়িং



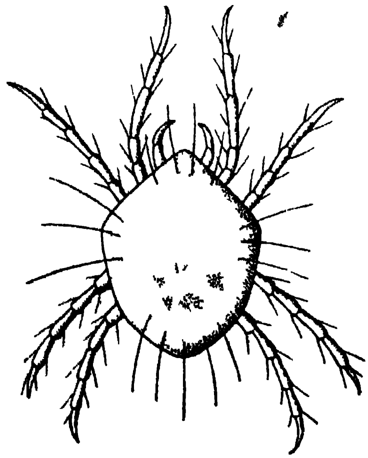
এক জাতীয় ফড়িং

১০টি বা ততোধিক গোলাকার অংশ দিয়ে সারা পেটটি তৈরী। পূর্ণ

বয়স্ক পতঙ্গের পেটে কোন পা থাকে না। কিন্তু শুঁয়াপোকা, মথ ইত্যাদির পেটে কয়েকটা পায়ের মত থাকে (false feet)। এগুলি ভুয়া পা, অনেক-গুলি পতঙ্গের পেটের শেষে অনেকটা লেজের মত থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস—অধিকাংশ পতঙ্গের শরীরের মধ্যে সর্বাঙ্গব্যাপী নালী থাকে। এই নালী দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। দেহের মধ্যে বায়ুপূর্ণ চৌবাচ্চা নালী (storage) থাকে আর ছিদ্র দিয়ে বাতাস ঢোকে। গণ্ডদেশের উপরের ও নীচের অংশে স্পিরাকেল থাকে। কিন্তু কতকগুলি থাকে গণ্ডের প্রথম অংশে আর দ্বিতীযটি থাকে পেটের শেষাংশে। স্পিরাকেলগুলি খুলে বা বন্ধ করে ভিতরের বাতাস সমান রাখা হয।

যদি জানা যায পতঙ্গের দেহ খোলা দিযে ঢাকা তবে তার আকার এবং বৈশিষ্ট্য বোঝা যায। দেহের সর্বাঙ্গ শক্ত অংশ জোড়া দিয়ে তৈরী হয। সংযোগের স্থানগুলি চ্যাপ্টা, কারও হলদে, কারও বা কাঁচা সবুজ। ডিম থেকে বার হতে তিন হতে কযেক মাস পর্যন্ত সময লেগে যায। সময অবশ্য সকলের সমান নয়। ডিম থেকে বাচ্চা বার হবার সঙ্গে সঙ্গে শাবককে খাওযাতে সুরু করে কিন্তু যে পর্যন্ত না পুরানো চামডা ছাড়তে না পারে ততদিন কোন বৃদ্ধি হয না। খোলস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরানো খোলস ও নূতন চামড়ার মধ্যে জলকণা থাকে যেন খোলস ছাড়তে কোন অসুবিধা না হয। চাপে ও আঘাতের ফলে পুরাণো খোলস খসে পড়ে। এর সঙ্গে এলিমেণ্টারী নালী, প্রধান বায়ুঘর, বহিত্বক, পা ইত্যাদি চলে



মাকড়সা পোকা

যায়। যতদিন না নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজায় ও শক্ত হয় ততদিন বাচ্চা বিশ্রাম নেয়। অনেক সময় দেখা যায় খোলস ত্যাগ করবার পর শাবক মাস কয়েক ধরে দিনে প্রায় ½" ভাগ বাড়ে।

ক্ষেতে কীট-পতঙ্গ নিবারণের উপায়

প্রতি বৎসর ক্ষেতের ফসল কিছু পরিমাণ কীট-পতঙ্গে নষ্ট করে। যখন এই ক্ষতির পরিমাণ কম থাকে তখন কৃষক গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কিন্তু যখন ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ৩০-৫০ ভাগের মধ্যে আসে তখন সেটা কৃষক ও জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। কীট-পতঙ্গের দ্বারা ফসলের ক্ষতি নিবারণের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর জন্য ত্রয়ী বিজ্ঞানীর সমাবেশ প্রয়োজন (১) উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার, (২) জীববিদ্‌গণের পরীক্ষা এবং (৩) সবার উপর চাষীকে এই গবেষণালব্ধ পদ্ধতি ক্ষেতের ফসলে কাজে লাগানো।

(ক) রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কীট-পতঙ্গ বিনাশ করা যায়। এটা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। পরীক্ষাগারে বা পরীক্ষাকেন্দ্রে এটা সম্ভব কিন্তু বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেতে এটা সম্ভব কিনা সেটা কৃষককে দেখে নিয়ে এর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল অল্প খরচে বেশী জায়গায় এর ব্যবহার চলায় এদেশের ধনী চাষীর মধ্যে বেশ চলন হয়েছে। এটা তিন রকমে ঘটে। (১) ডিমের বিনাশ—সাধারণতঃ ফলের বাগানে, ও ঝোপঝাপে রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াতে হয়। ডিম থেকে শাবক বার হওয়ার আগে এগুলি ছড়ালে ডিম নষ্ট হয়ে যায় ফলে এর থেকে আর কীট বাহির হতে পারে না। এদের মধ্যে প্রধান আলকাতরার তেল (tar oil), ডাই-নাইট্রো-অর্থোক্রেসল (N.O.C.) এবং পেট্রল। (২) পেটের মধ্যে বিষ ঢোকান—খাদ্যের সঙ্গে পোকা বিনাশী রাসায়নিক দ্রব্য কীটাদির পেটের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। যে প্রাণীর দেহে ঢোকে সে প্রাণী মারা যাবে। মানুষেরও ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে চাষীকে বেশ সতর্ক হতে হবে। (৩) সহযোগী বিষ—যে সমস্ত কীট-পতঙ্গ শস্যাদির রস

চুষে নেয় তাদের পক্ষে এই বিষ বিশেষ কার্যকরী। অনেক সময় তামাকের ধোঁয়াও কাজে লাগে। এই ঔষধগুলির মধ্যে ডি. ডি. টি. (ডাইক্লোর ডাই ফেনাইল ট্রাইক্লোরোইথিন) এবং অপরিষ্কার বি, এইচ, সি (বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড) প্রধান। এগুলি গুঁড়া করে কোন তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করে দিতে হয়। অনেকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে দিয়ে থাকেন। এতে অনেক সময় ক্ষতি করে। ছোট আকারের কীট মারতে এর প্রয়োজন খুব বেশী।

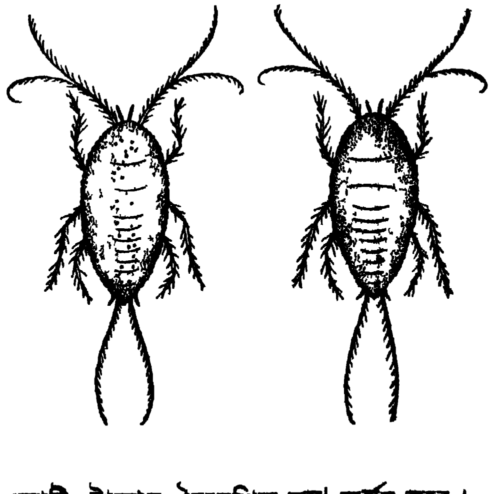
(খ) **বাষ্প সংযোগে**—আজকাল এর প্রযোগ বেশ বেড়ে গেছে। তবে এর ব্যবহারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ অনেক সময় ব্যবহারী চাষীকে ক্ষতি করতে পারে। এর মধ্যে প্রধান হাঁইড্রোসাইনিক বাষ্প ও কার্বন বাই-সালফাইড বাষ্প।

(গ) **জীববিদের প্রথা**—এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ক্ষেতের পাশে পাখী বসবার জায়গা করে দিলে সেখানে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী বসবে এবং পাশের ক্ষেত থেকে কীট পতঙ্গাদি ধরে ধরে খাবে। এটা অনেকটা স্বাভাবিক পন্থা।

(ঘ) **সহজ সরল পথ**—হাত দিয়ে আক্রান্ত পোকা বা গাছ তুলে ফেলে পুড়িয়ে দিতে হয়।

(ঙ) **আইনবলে বিনাশ**—যখন কোথাও বিস্তীর্ণ ভূভাগে এর আক্রমণ সুরু হয় তখন দেশের প্রতিষেধক আইন সেই অনুযায়ী গড়ে তুলে তার ভাল-ভাবে প্রয়োগ করতে হয়। অনেক সময় দেখা গেছে শস্য পরিবর্তন করে কীটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শস্য পর্যায় মেনে চলা বিধেয়। অনেক সময় মাঠে ঋতু পরিবর্তনে কর্ষণের ফলে অনেক পোকা-মাকড় নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ক্ষেতে যদি আগি ফসল থাকে তবে শস্য কাটবার আগেই যদি মাটি চষে দেওয়া যায় তবে ভাল হয়। কারণ কর্ষণের ফলে মাঠ থেকে শস্যের ক্ষতিকারী পোকা-মাকড় চলে যাবে।

লাক্ষা পোকা (Laifer lacca kerr)—লাক্ষা পোকার দেহ থেকে একপ্রকার রস নির্গত হয় আর এই রস থেকে তৈরী হয় রেসিন এবং লাক্ষা। তার মাধ্যমে তৈরী হয় ছোটখাটো বহু জিনিষ। সেলাক থেকে গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈরী হয়। এর থেকে একরকম পাকা রঙ তৈরী করা হয় বলে রেশমের রঙ করার সুবিধা। সেলাক আকারে লাক্ষা রপ্তানী করা হয়। টেবিল-চেয়ারের পালিশ, বার্ণিশ প্রভৃতি বহু জিনিষ আজ লাক্ষার মাধ্যমে তৈরী হইতেছে।



লাক্ষা পোকার শরীরের মধ্যকার কোন প্রান্ত থেকে এই রস নির্গত হয়। সারা শরীর ব্যেপে এই গ্লাণ্ডটা জড়িয়ে আছে। এই রস বাতাসের সংস্পর্শে আসলে শক্ত হয়ে যায়। পৃথিবীতে বৎসরে যত লাক্ষা তৈরী হয় তার শতকরা ৮০।৯০ ভাগ ভারতবর্ষে তৈরী হয় আর তাই দিয়ে ভারত প্রায় ১১৷৷০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বাংলাদেশে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় এদের চাষ হয়। তবে বিহার ও মধ্যপ্রদেশে সব থেকে বেশী লাক্ষা উৎপন্ন হয়।

লাক্ষা পোকা নানারকম গাছ ও ঝোপে জন্মিতে পারে। দেখা গেছে ১০০ থেকে বেশী বিভিন্ন জাতের গাছে এই পোকা বাড়তে পারে। কিন্তু এই পোকা লালন-পালনের জন্য কেবলমাত্র কয়টি বিভিন্ন জাতের গাছের চাষ করা হয়। এদের মধ্যে ৮টি প্রধান। (১) কুসুম, (২) পলাশ, (৩) বের, (৪) অড়হর, (৫) পোঁৎ, (৬) খয়ের, (৭) জল্লারী ও (৮) রেনট্রী। এ ভিন্ন

পাকুড়, পেঁপে, পিপ্পল, গুলার, স্কন্দন, শিরীষ ইত্যাদি গাছেও এই পোকা প্রতিপালিত হতে পারে।

উদ্ভিদবিদ্যায় এই পোকার নাম (Laufer lacca kerr) Cocidac পরিবারের সভ্য। যে সমস্ত পোকার আঁইশ আছে সেই আঁইশ বিশিষ্ট পোকাদের দলভুক্ত। কোষ থেকে শিশু লার্ভা বার হযে এলে তাব আকার খুব ছোট থাকে, প্রায়· ১/২০" লম্বা। গুড়ি দিয়ে চলতে চলতে এরা ডালের যেখানে সুবিধা পায সেখানে ঠাঁই করে বসে যায—তাবপর তাদের সেখানে জীবনযাত্রা সুরু হয়। পরবর্তী কালে এর থেকে লাক্ষা রস নির্গত হয। সেই রস থেকে লাক্ষা তৈরী হয। একটি স্ত্রী লাক্ষা পোকা গড়ে প্রায ৩০০ লার্ভা প্রসব করে, এর মধ্যে ১/৫ ভাগ পুরুষ। কিন্তু পুরুষ পোকাগুলিঁর জীবন অল্প-স্থায়ী। স্ত্রী পোকার আয়ুষ্কালেব ১/৫ ভাগ মাত্র। পুরুষ পোকা লাক্ষা তৈরী করলেও পরিমাণে খুব কম।

যখন ফসল ঠিক হয তখন এদের দেহে একটা হলদে বঙের দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে এই দাগটা বেড়ে চাবিদিকে ছড়িযে পড়ে এবং পোকার দেহের অর্ধেকখানা ঢেকে ফেলে। ঐ সময দেহ থেকে রস নিষ্ক্রান্ত হয়ে জমা হয়। যখন পরিপূর্ণতা পায তখন ঐ লাক্ষা কেটে আলাদা করে নেওযা হয। এই সময় একে বলা হয় ক্রুড ল্যাক।

লাক্ষা কীটের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। কুসুম গাছে যে লাক্ষাকীট বেড়ে উঠে তাকে বলে কুসুমি জাতের আর অন্যান্য গাছে যারা বেড়ে উঠে তাকে বলে রঙ্গিনী। উভয জাতই বৎসরে দুবার সন্তান-সন্ততি দেয। কুসমি জাতের পোকার জীবন ৬ মাসের কিন্তু রঙ্গিনী জাতের ৪ মাসের মধ্যে প্রথম পুরুষ শেষ হয়ে যায—দ্বিতীয় পুরুষ ৮ মাস বাঁচে।

বৎসরে চক্রাকারে এই ৪টি বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়ায় বৎসরে ৪ বার লাক্ষা পাওয়া যায। যে মাসে পাওয়া যায সেই অনুসারে নাম হয়। বৈশাখী, এবং কটকী। কুসমি জাতের পাওয়া যায় আঘানি ও জ্যৈষ্ঠী। বৈশাখী

পরিমাণে বেশী পাওয়া যায়। বিড়াল, নানাজাতের মাছি লার্ভা অবস্থায় খেয়ে ফেলে, ফলে কীট প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। কুসমি ও রঙ্গিনী দুই বিভিন্ন জাতের ফসল এক জায়গায় করা উচিত নয়। রোগাক্রান্ত হলে শত্রু ধ্বংস করতে হয়।

কাণ্ডভেদী (Stem borer) (Schoenobius incertelles walker)—চলতি কথায় এর নাম মাজরা পোকা। সাদা রঙের প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা। কীটগুলি কাণ্ড ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ভেতরের শাঁস খেয়ে ফেলে। ফলে তখন আর গাছের খাদ্য টানবার কোন ক্ষমতা না থাকায় গাছের ডগা শুকিয়ে যায়। আগা ধরে টানলে শীষ উঠে আসে। এই কীট থেকে পতঙ্গ বার হয়ে আসে। গায়ের রং খড়ের রঙের মত। সামনের পাখায় দুটি ফোঁটা থাকে।

এরা খুব বেশী আলোতে আকৃষ্ট হয়। ফলে মাঠের ধারে আলো জ্বালালে গুটি গুটি সবাই গিয়ে হাজির হবে ও আলোর প্রভাবে বিনষ্ট হবে।

কীটগুলি যখন লার্ভা অবস্থায় থাকে তখনই ফসলের ক্ষতি করে। যখন শুঁয়া পোকা কাণ্ডের বহিত্বক ভেদ করে ভিতরে ঢোকে তখন ঐ গাছের মাঝ শিরা কেটে যায়। ফলে গাছের মাধ্যমে মাটি থেকে কোন খাদ্য বা জল টানতে পারে না। ফলে মাঝখানের কাণ্ডটি হলদে হয়ে পড়ে।

যে গাছটি মাজরা পোকায় আক্রান্ত হয় সেই গাছ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলদে হতে শুরু করে এবং শীষে ফল না হয়ে চিটে হয়ে যায়। গাছের গোড়ার কাছে যদি আঠা থাকে তবে বলতে হবে যে সেই গাছে মাজরা পোকা লেগেছে।

ধানগাছের পাতার নীচের দিকে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে ৫-৬ দিনের মধ্যে লার্ভা বেরিয়ে আসে। লার্ভা অবস্থায় থাকে ৪।৫ সপ্তাহ। তারপর তার থেকে পিউপা বার হয়ে আসে। পিউপা অবস্থায় ১০ দিন থাকে। বোরো ধান আক্রমণ করবার প্রকৃষ্ট সময় জানুয়ারী থেকে মার্চ অবধি। আউশ ও আমন ধানকে আক্রমণ করে জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বেশী আক্রমণ করে। যে গাছ আক্রান্ত হয় তাকে তুলে ফেলে পুড়িয়ে দিতে হয়।

পামরী পোকা (Hispa armigera)—অনেক সময দেখা যায খেতের ধানের পাতা আর সবুজ নেই। দেখলে মনে হয সারা মাঠেব ধান গাছের পাতা ফুটো করে কে যেন ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। চলতি কথায এগুলিকে পামরী পোকা বলে। সকল অবস্থায—লার্ভা অবস্থাযই হোক আর বয়স্ক কীটই হোক সকল অবস্থায় ফসলের ক্ষতি করতে পারে।

বয়স্কেরা পাতায সবুজকণাগুলি খেযে ফেলে আর—লার্ভাগুলি সীমান্তের আগে যে বিন্দুগুলি থাকে সেগুলি খেয়ে ফেলে।

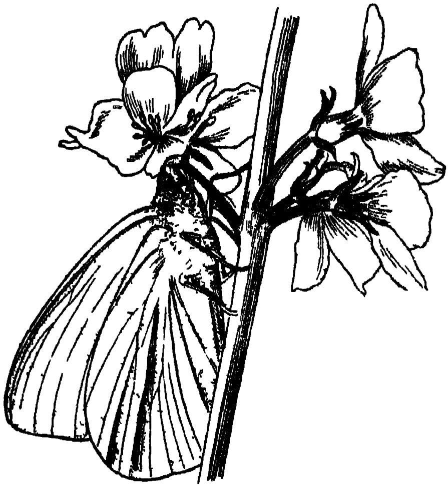
আক্রান্ত ধান গাছ সাদা হয়ে যায়। ইহারা টিস্যু ও গাছের সবুজ কণা হারিয়ে ফেলে, ফলে খাদ্য সৃষ্টি কবতে পারে না। খড়ের মত দেখতে হয়ে পড়ে সাদা। যখন সারা মাঠ আক্রান্ত হয় তখন দেখলে মনে হয সারা মাঠের ফসলকে যেন কে পুড়িয়ে দিয়েছে।

আক্রান্ত গাছের খাওয়া টিস্যুর নীচে পোকা ডিম পাড়ে। ডিম অবস্থায ৩।৪ দিন থাকে তারপর এর থেকে লার্ভা বেরিযে আসে। এই অবস্থায থাকে প্রায় ১ সপ্তাহ। এইবার পিউপা অবস্থায আসে। এই অবস্থায় থাকে ৩।৪ দিন।

বোরো ধানকে আক্রমণ করে জানুযারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। আউশ ও আমন ধানকে মে থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। জুলাই-আগষ্ট মাসে বেশী আক্রমণ করে। ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। একরে শতকরা ৫ ভাগ B.H.C. ১০ পাঃ ছিটিযে এর আক্রমণ কিছুটা নিবারণ করা যায়।

প্রজাপতি (**Butterfly—Lepidopteora**)—প্রজাপতির দুজোড়া ডানা থাকে। রঙীন আঁশ সাজিয়ে সাজিয়ে এই ডানা তৈরী হয়, মাথার উপরের হুল দুটি বেশ লম্বা। মাঝখানের পা'টি একটু লম্বা ধরণের হয় যাতে এই পা'টি দিয়ে তরল পদার্থ চোষার সুবিধা হয়। আর যখন কাজে লাগে না

তখন এগুলি মাথার নীচে লুকিয়ে রাখে। এই কীট লার্ভা ও পিউপা অবস্থা থেকে পূর্ণতা পাওয়ার আগে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। লেপিডেপটোয়ার লার্ভাগুলি শুঁয়া পোকার মত গুড়ি মেরে চলে। তাদের মুখগুলি কামড়াবার জন্য বিশেষ উপযোগী। গণ্ডদেশের তিন জোড়া পা আর পেটে ৫ জোড়া ভুয়া পা। পেটের ৩, ৪, ৫, ৬ ও ১০ সংখ্যক অংশের ক্রম্বোটর সঙ্গে সময়ে সময়ে মিশে থাকে। শীতকালীন শুঁয়া পোকার কেবলমাত্র ৬ষ্ঠ ও শেষ অংশে ভুয়া পা থাকে।



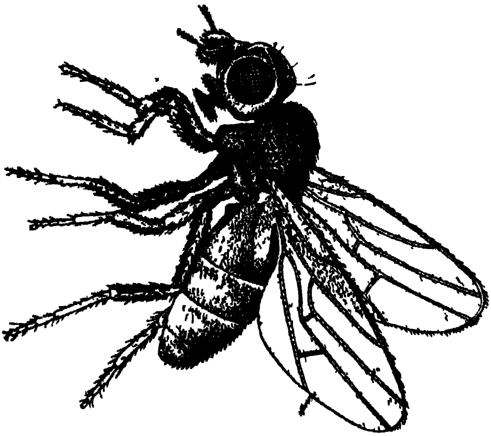
বাঁধাকপির শত্রু প্রজাপতি

সমুদয় শুঁযা পোকাগুলো গাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে কিন্তু খাদ্যের বিভিন্ন অভ্যাস থাকায়, রঙের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কতকগুলি শুঁযাপোকা রেশমের সৃষ্টি করে। অনেক শুঁয়া পোকা আছে যারা দেখতে সবুজ। কেহ বা গোলাকার কেহ বা লম্বা লাঠির মত দেখতে। কতকগুলি পতঙ্গ আছে যারা দুটি পাতার আগা জুড়ে নিয়ে তার মধ্যে ঘর বাঁধে।

প্রজাপতির পিউপা তাঁতের মাকুর মত দেখতে, আর এ সময় ডানা নীচের দিকে বোজান থাকে। প্রজাপতি ক্রাইস্তালিতে লেজের দিকে ঝোলান থাকে আর গণ্ডদেশের একটা পাখা দিয়ে ভার রাখা হয়। এদের এই পিউপা, ফুল, শ্বেতকরবী, উইলো প্রভৃতি গাছের পাতার নীচের দিকে দিনের বেলায় চুপচাপ থাকে এবং রাত্রি বেলায় চরতে বার হয়।

মৌমাছি—দেহের তুলনায় বিরাট ডানা আছে। মাথায় সামনেকার এনটেনা দুটি লম্বা। মুখে নীচেকার পাটি আছে। মাঝের পাটি অনেক

সময় এমনভাবে তৈরী থাকে যাতে চোষার সুবিধা হয়। মৌমাছির কোমরের কাছটা অর্থাৎ যেখানে গণ্ডদেশ ও পেট যুক্ত হয়েছে সেখানটা সরু। স্ত্রী মৌমাছির দেহ এমনভাবে তৈরী যেন ডিম পাড়তে পারে। তাদের দেহে



একটি অভিপোজিটায থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অভিপোজিটার বেড়ে হুলেব মত হয। এ দিযে অন্য কোন স্থানে মধুমক্ষিকা হুল ফুটিযে দেয়।

সাধাবণতঃ শীতেব শেষে মক্ষিরাণী তার ঘব ছেড়ে বার হযে আসে তখন পুরুষ মৌমাছিগুলি তাকে ঘিরে ধবে। এরই কযেকদিন পরে স্ত্রীমৌমাছি ডিম পাড়ে এবং মৌচাকেব খোপে খোপে একটি কবে ডিম জমা করে রাখে। ডিম ফুটে যে বাচ্চা বার হয় সেটা দেখতে অনেকটা কৃমির মত। জন্মের পরেই এর খাবারের প্রয়োজন হয। কর্মী মৌমাছিরা তখন তাকে খাওযায়। খেযে বড় হতে থাকে এবং এব চারিদিকে একটা শক্ত আবরণ তৈরী হতে থাকে তখন একে বলে পিউপা। কয়েকদিন পরে আববণ ফেটে পূর্ণ মৌমাছি বাব হযে আসে। ডিম থেকে পূর্ণ অবস্থায় আবরণ ফেটে বাব হতে সময় লাগে কর্মী মৌমাছির ২১ দিন, পুং মৌমাছির ২৫ দিন এবং স্ত্রীমৌমাছির সময লাগে ১৬ দিন মাত্র।

ডিম থেকে কোন্ জাতীয মৌমাছি বার হবে সেটা নির্ভর করে লার্ভার খাদ্যের উপর। কর্মী লার্ভাগুলি সাধারণ খাবার খেযে বাঁচে। স্ত্রাজাতায লার্ভাকে ভাল খাবার খেতে দিতে হয যার ফলে তারা আকারে বড় ও দীর্ঘজীবি হতে পারে। রাণী পূর্ণাঙ্গ পেয়ে আবরণ থেকে বার হয়ে আসায়

এক সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য পুরুষ মৌমাছির সহিত মিলিত হয় ও ডিম পাড়তে সুরু করে। এরা ১ থেকে ২ বৎসর ডিম পাড়ে। পুরুষেরা কোষ থেকে বার হয়ে আসার ২ সপ্তাহ পর থেকে রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়। কর্মী মৌমাছিরা কোষ থেকে বার হবার পরের দিন থেকে কাজে লেগে যায়। প্রথমে পাহারাদারের কাজ করে, চাক পরিষ্কার করে, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ করে। তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মধু ও পরাগ সংগ্রহে বার হয়ে যায়। এদের পরমায়ু দেড় থেকে তিনমাস মাত্র। মৌমাছিরা মধু খায়, বাচ্চারা পরাগ খায়। ফুলে বসে উড়ে এলে পায়ের লোমে পরাগ লেগে যায়। আঁচড়ে পরাগ জমা করে পরে এগুলি কোষের মধ্যে জমা করে। মৌমাছির চাক মোম দিয়ে তৈরী। পা থেকে বার হওয়া ঘাম পেটের তলায় জমা হয়। এরা মোম দিয়ে বাসা তৈরী করে। এক পাউণ্ড মোম তৈরী করতে মৌমাছি ১৫-২০ পাঃ মধু সংগ্রহ করে।

রেশম কীট—রেশম কীট থেকে রেশম সূতা পাওয়া যায়। সেই সূতা দিয়ে ভাল ভাল কাপড় তৈরী হয়। আমাদের বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে রেশম কীটের চাষ হয়। এভিন্ন ভারতবর্ষে মহীশূরে ও কাশ্মীরে রেশমের চাষ হয়। জাপানে সব থেকে ভাল রেশমের চাষ হয়।

রেশম কীট থেকে রেশমের সূতা তৈরী হয়। রেশম কীট দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(১) বোমবিউডা—যে কোকুন বা গুটি থেকে সূতা গোলাকারে বার করা যায়।

(২) এট্টাসিডা—যার সূতা রিলে জড়ান যায় না। এই জাতীয় রেশম কীট থেকে রেশম সূতা—তুলার মত পাকিয়ে সূতা তৈরী করতে হয়। মালবেরী ও তসর জাতীয় সিল্ক বোমবিউডা রেশম কীট থেকে পাওয়া যায়—কিন্তু এণ্ডি রেশম কীট এট্টাসিডার অন্তর্গত।

মালবেরী গাছের পাতা খেয়ে রেশমকীট বেড়ে উঠে—

(১) বোমবিক্স মোরি—ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, চীন, জাপান, পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। বৎসরে একবারমাত্র এই ফসল হয়।

(২) বোমবিক্স টেক্সটর কিম্বা বরপালু। এরা বাংলাদেশের বাৎসরিক ফসল। এর গুটিগুলা বোমবিক্স মোরির মত শক্ত নয়।

(৩) আসাম ও বর্মা অঞ্চলে যে পালু পাওযা যায সেগুলি বাংলাদেশের বোমবিক্স টেক্সটরের মত।

(৪) মহীশূরের—বোমবিক্স মোরি ডিপাবলিস্ বৎসরে ৭।৮ বার ফসল দেয়। এর গুটিগুলি ঈষৎ সবুজ। কিন্তু রেশম সূতা বড় পালুর মত শক্ত।

(৫) বোমবিক্স ক্রালসি—সোণালী হলদে গুটি—বৎরের ৮ বার ফসল পাওয়া যায়। খুব সুন্দর রেশম উৎপন্ন হয়—

(৬) বোমবিক্স ফরটুনেষাস—দেশী, হলদে গুটি, রেশম সূতা খুব শক্ত।

এ ভিন্ন আরও বুনো জাতের গাছ থেকে গুটি পাওয়া যায, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে এক জাতীয় মালবেরী গাছ পাওয়া যায়। মেদিনীপুরে এর আগে মালবেরীর চাষ হতো আজকাল হয না।

রেশমকীট মালবেরী গাছের পাতা খায়। আর তার ফলে তাদের দেহ থেকে রেশম সূতা পাওয়া যায়। হিমালয়ের সারা অঞ্চল ব্যেপে বুনো মালবেরী গাছ পাওয়া যায়। কাশ্মীর থেকে বর্মা পর্যন্ত সুদীর্ঘ হিমালয়ের অঞ্চল ব্যেপে বন্য মালবেরী গাছ দেখা যায়। কখনও কখনও এই গাছ আম-জাম গাছের মত বিরাট হয় আবার কখনও কখনও বেঁটে ঝোপের মত হয়ে থাকে। এর পাতাগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্ট—পাতায় লম্বা বোঁটা আছে। পাতাগুলি মসৃণ।

এবং পুরু, পাতার মধ্যে রসে ভর্তি থাকে। এরা বিস্তৃতি লাভ করে বীজ থেকে, ডাল কেটে আলাদা করে পুঁতে বা কলম পুঁতে। কলম নানা রকমের হতে পারে। মোঃ লেডিগাটা, মোঃ মিলিপিনেসসিন্, মোঃ আলবার ডাল পুঁতে দিলে চলে। কিন্তু জাপানী ভাল মালবেরী চারা কলম করে পুঁততে হয়।

প্রথমে শিশু বাগানে (নার্শারীতে) ৯" দূরে লাগিয়ে তারপর সময় মত বড় হলে তুলে অন্য জায়গায় পুঁততে হয়। গাছের দূরত্ব ২০" রাখতে হয়। ৮।১০'ফু. উঁচু হলে পাতা ছিঁড়তে হয়। তবে মাটি থেকে ৫' মধ্যেকার পাতা ভাল নয়।

ডিম থেকে বেরিয়ে আসা তাজা লার্ভাগুলি পাতার উপর রাখতে হয়, এই পাতাগুলি ডালায় করে নিয়ে মাচানের নিম্নস্তরে রাখা হয়। তারপর যখন লার্ভা-গুলি বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বয়স্ক হতে থাকে তাদেরকেও ধীরে-ধীরে মাচানের উপরের স্তরে নিয়ে যেতে হয়। (১ম) একটি ডালা—(২য়) তিনটি ডালা—(৩য়) ৯টি ডালা—(৪র্থ) ১৭টি ডালা—(৫) ৮১টি ডালা (৬ষ্ঠ) ১৬২টি ডালা।

গুটিগুলি পূর্ণতা পায় ৭৫° ফা উত্তাপে। সেজন্য নভেম্বর ও মার্চ মাসের যে ফসল পাওয়া যায়—সেগুলি সব থেকে ভাল। এক একটি গুটি পোকার কাছ থেকে ২০০-২৫০ গজ রেশম সুতা পাওয়া যায়।

কীট নানারকমের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আবার মালবেরী গাছের পাতা এবং গাছও রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এদের মধ্যে মালবেরীর পাতা গাছে একরকম রোগ হয়। একে বলে ফ্লাচেকী। গ্রাসিন রোগও হয়। কম রস থেকে বেশী রসের অবস্থায় পড়লে এই রোগ হতে পারে।

রেশম কীটকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ইউনিভলটাইন, (২) বাইভলটাইন ও (৩) মালটিভলটাইন। যে সমস্ত পোকা ডিম পাড়-বার পরই তা দিতে সুরু করে না তাদের বলে ইউনি ভলটাইন। এইভাবে প্রায় ১০।১২ মাস চলে যায়। এর ফলে বৎসরে একটিমাত্র ফসল পাওয়া যায়। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে তরল HCl ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের যোগে তাড়াতাড়ি ডিম থেকে লার্ভা বার করে নেওয়া হয়। এইভাবে জাপানে

বৎসরে তিনটি ফসল করা হয়। এর জন্য প্রয়োজন ৩২°—৪০° ফা উত্তাপ ও ৪ মাস সময়।

যে সমস্ত ডিমের পতঙ্গ বার হতে ৫।৬ মাস সময় লাগে তাদেরকে বলে বাইভলটাইন জাতের। সুতরাং এদের থেকে বৎসরে ২টা ফসল পাওয়া যায়। যে সমস্ত ডিম ফুটতে ৮।১০ দিন মাত্র সময় লাগে এবং যাদের কাছ থেকে বৎসরে অনেকগুলি ফসল পাওয়া যায় তাদেরকে বলে মালটিভলটাইন। আবার অনেক সময় পাতার উপরও এগুলি নির্ভর করে। বেশী কীট সংগ্রহ করলে বেশী পাতার প্রয়োজন হবে।

ইউনিভলটাইনের কোকুনগুলি বেশ বড়, এদের রেশমের পরিমাণও বেশী হয়। কিন্তু এদের জন্য প্রযোজন খুব কম উত্তাপ, ফলে, বাংলাদেশে বিশুদ্ধ এই জাতের পালু চাষ করা কষ্টকর হয়। এর পরেই আসে বাইভলটাইন শ্রেণীর রেশম। রেশম খুব ভাল পাওয়া যায় কিন্তু এই কীটগুলি বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। মালটিভলটাইন জাতের গুটিগুলি খুব ছোট ও ইহার রেশম নিকৃষ্ট শ্রেণীর, কিন্তু সকল রকম রোগ ও উত্তাপ সহ্য করে বেড়ে উঠতে পারে। তার ফলে তাদের সূতা নিকৃষ্ট জাতের ও সূতার পরিমাণ অল্প (১৫০—৩০০ গজ)। ৮০০—১২০০ গজের তুলনায় খুবই কম তবে বাংলা তথা ভারতবর্ষে এর চলন বেশী। কাশ্মীর ও কালিম্পং অঞ্চলে এক ও দ্বি-ভলটাইন জাতের চাষ হয়।

জাপান থেকে শী, নিচি ও শৈকু জাতের কোকুন আমদানী হয়েছে। বাংলার নিজস্ব বড় পালু। এ ভিন্ন দেশী নিস্তারী ও ছোট পালু চাষ হতে দেখা যায়।

এক পাউণ্ড রেশমের সূতার জন্য ২,৫০০ গুটির প্রয়োজন। প্রত্যেক গুটিতে গড়ে ৩০০ গজ সূতা থাকে। গুটি তৈরী হয়ে গেলে ১০ দিন উষ্ণ জলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। চীন, জাপান, ইটালী, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে এটা খুব অর্থকরী শিল্প।

পূর্ণ বয়স্ক বোমবিক্স মোরি প্রায় ২" চওড়া, মোটা দেহ, খুব ছোট ডানা

থাকে। কদাচিৎ উড়ে, কোন খাদ্য খায় না। ২।৩ দিন বাঁচে। প্রতিটি কীট প্রায় ৩০০—৪০০ ডিম পাড়ে। খুব সম্ভব চীনারা ২০০০ বৎসর পূর্বে রেশম কীটের চাষ করতো। উপযুক্ত তা দিবার পর ইহারা ৩।৪ সপ্তাহ মধ্যে মালবেরীর পাতা খেয়ে বেড়ে উঠে। তখন লার্ভার চারিদিকে রেশমের ঘর তৈরি হয়। এদের দেহ থেকে একরকম রস নির্গত হয়। এই রস বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায় এবং এর মধ্যে সরু রেশম সুতার সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে মিনিটে একটা কীট ৬″ সুতা তৈরী করে। যখন এই ঘর তৈরী শেষ হয়ে যায় তখন লার্ভা থেকে পিউপা বেরিয়ে আসে। পিউপা থেকে মথ তৈরী হয়। যখন মথ পূর্ণতা পায় তখন তারা এক জাতীয় ক্ষার রস নির্গত করে। ঐ ঘরের এক অংশে রসলাগায় নরম হয়ে যায় এবং সেখান থেকে পূর্ণ পতঙ্গ বেরিয়ে আসে। বোমবিক্স মোরি শরৎকালের পরেই পূর্ণতা পায়। রেশম সুতায় শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফাইব্রইন (প্রোটিন) থাকে। এর মধ্যে ৩৬ ভাগ এমাইনো অম্ল ও গ্লাইসিন।

প্রতিটি কীট গড়ে বৎসরে ৩৮০—৪০০ ডিম পাড়ে, ডিমগুলি গোলাকার, হলদে। তাপ দিবার সময় ধূসর আকার ধারণ করে। গরমকালে ১০ দিন লার্ভাবস্থায় থাকে। ৩০—৪০ দিন এই সময়ে ৪ বার মোল্ট হয়। শিশুকীট ⅛″ লম্বা। কীটের মাথার উপরটা উঁচু থাকে। একটা পিউপার ওজন গড়ে ২·২৫ গ্রাম। একটা লার্ভার দেহে থাকে শতকরা ৪ ভাগ মেদ জাতীয় পদার্থ। স্ত্রী লার্ভার বেশী মেদ থাকে।

কৃষিবিজ্ঞানের গোড়ার কথা

[জৈব রসায়ন]

প্রথম ভাগ

তৃতীয় খণ্ড

(একাদশ শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

কোষ বিভূতি ও ক্রোমোজোম

(Cell Division and Cromosomes)

কোষ—ক্ষুদ্রতম অংশ নিয়ে কোষের সৃষ্টি। কোষের তিনটি বিভিন্ন অংশ। (১) সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ চলতি কথায় বলা যেতে পারে সাধারণ কোষ সৃষ্টিকারক পদার্থ। (২) নিউক্লিয়াস। (৩) প্লাজমা মেমব্রেন (Plasma membrane) অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বহির্ভাগেব অংশ।

আধা স্বচ্ছ, চটচটে তরল পদার্থ দিয়ে কোষ ভর্তি থাকে। প্রাণীদের কোষ এই দিয়ে ভর্তি থাকে। কিন্তু গাছের কোষে এটা সামান্য স্থান গ্রহণ করে। কোষের মধ্যে আর থাকে নিউক্লিয়াস। এটা প্রোটোপ্লাজমের একটা বিশেষ অংশ ভিন্ন আর কিছু নয়। আকারে ঠিক গোলাকার নয় ঈষৎ চাপা। কোষের ঠিক কেন্দ্রের কাছাকাছি এগুলি থাকে। নিউক্লিয়াস অতিরিক্ত আলোয় নিম্নলিখিত আকারে থাকে। নিউক্লিয়াসের চারিদিকে খুব পাতলা একটা আবরণ থাকে তাকে বলা হয় কেন্দ্রাকরণ। (১) নিউক্লিয়াপ্লাজমে জলীয় কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ আছে, ইহা নিউক্লিয়াসের ছিদ্রগুলি পূর্ণ করে রাখে। (২) নিউক্লিয়াস রজ্জু। খুব সরু, ভারী সূক্ষ্ম সূত্রবৎ। ছিদ্র মধ্যে থাকে। অতি সহজে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কেরেটিন নামক পদার্থ দিয়ে তৈরী। (৩) নিউক্লিওলি নামক একটি পদার্থ এর মধ্যে থাকে।

কখনও কখনও এই নিউক্লিয়াস বিযুক্ত, ড্যাম্বেলের মত, বা অর্ধচন্দ্রাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াসের মধ্যকার পদার্থ ভাল দেখা যায় না। কিন্তু গাছের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সমস্ত অংশ অতি সহজে দেখা যায়। কিন্তু কোষ বৃদ্ধি হলে নিউক্লিয়াসের বৃদ্ধি হয় না। [illegible]

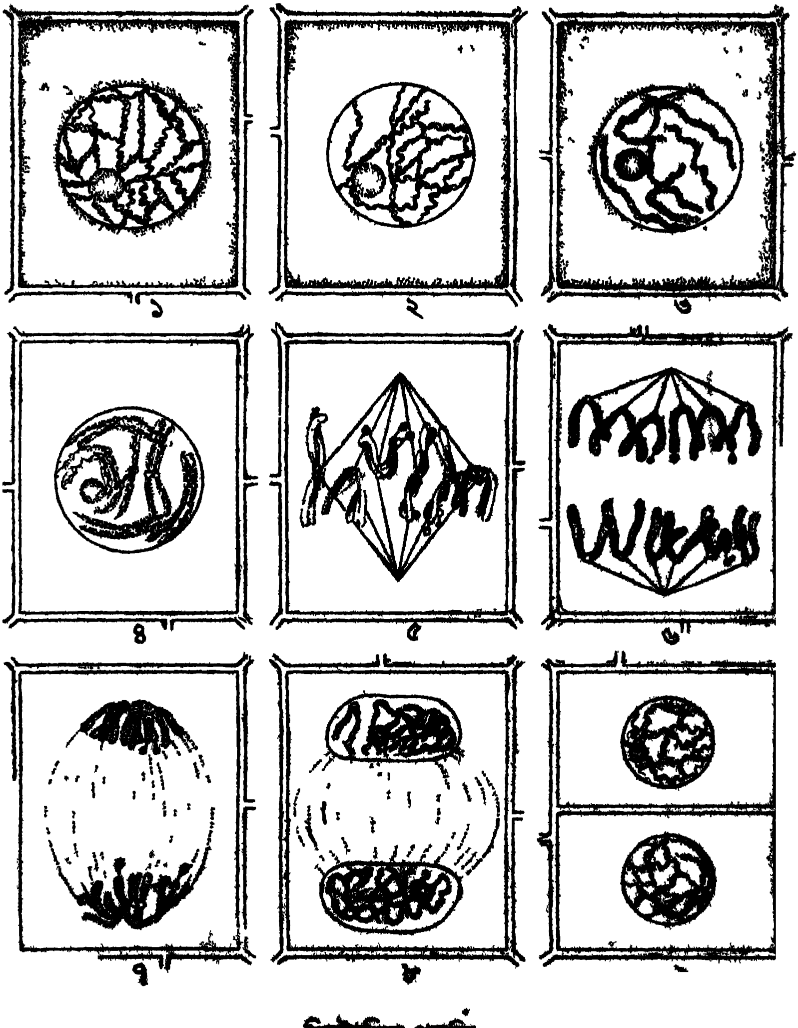
কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসকে ছোট বলে মনে হয়। একটি কোষে একটিমাত্র নিউক্লিয়াস থাকে। একে বলে এক কোষবিশিষ্ট (nucleate)। কিন্তু কতকগুলি ছোট ছোট গাছ আছে যাদের কোষের মধ্যে বেশী নিউক্লিয়াস দেখা যায় তাকে বলা হয় বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট (multi nucleate)।

নিউক্লিয়ায়োলাজ—নিউক্লিযাস কোষের মধ্যকার সাইটোপ্লাজম এর কর্মকেন্দ্র এবং নিউক্লিয়াস এই সমস্ত কর্ম পরিচালনা করে। শুধু এইরূপ কাজ করেই তারা ক্ষান্ত হয না। কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং এরা বৃক্ষজীবনের চলন শক্তি দেওয়ার কেন্দ্রস্থল কারণ যদি কোষের মধ্য থেকে নিউক্লিয়াস নিয়ে নেওযা হয় তবে কোষ বিভক্তি-করণ বন্ধ হয়ে যাবে। পিতা বা প্রজনন পদ্ধতি থেকে সন্তান-সন্ততি বংশানুক্রমিক ধারা প্রবর্তন করতে সহায়তা করে।

কোষের বিভক্তি-ভবন—প্রথমে নিউক্লিযাস বিভক্ত হযে পড়ে। নিউক্লিয়াস ২টি বিভিন্ন নিউক্লিযাসে বিভক্ত হযে পডলে সাইটোপ্লাজমও বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক একটি নিউক্লিযাসের সঙ্গে কিছু সাইটোপ্লাজম নিযে এক একটি কোষ গঠিত হয। একে বলা যেতে পাবে কন্যাকোষ। আবার ঐ দুটি কন্যাকোষ উপরি-উক্তভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায। এইভাবে ৪টি কোষ তৈরী হলো।

তিনটি বিভিন্ন পন্থায় কোষ বিভক্ত হয়ে পড়ে—(১) একটিকে বলে সোজাসুজি বা এমিটোসিস্, (২) অন্যটিকে বলে পরোক্ষ বা মিটোসিস্। এদের এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হলো বিভক্তি-ভবনের সময ক্রোমোজোমের সংখ্যা নিযে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। পিতার ও মাতার থেকে কয়টা করে ক্রোমোজোম আসলো তার উপর সন্তানের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ প্রথায় নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাজম এবং এক একটি বিভিন্ন কন্যাকোষ তৈরী হয়। কিন্তু মিটোসিস্ প্রথায় কোষের ভীষণ পরিবর্তন আসে। ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমানভাবে বিভক্ত

হয়ে নূতন লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত হয়ে নূতন কন্যাকোষের সৃষ্টি করে। এছাড়া আর একটি পন্থা আছে তাকে সাইবোসিস্ব বা ক্যারিও কাইনেসিস বলে।



মিটোসিস্ পদ্ধতি

মিটোসিস্—পরোক্ষ পদ্ধতি। গাছ ও প্রাণীদের কোষ বিভক্তি-করণ হয় এই পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে ৪টি বিভিন্ন পর্যায় আছে—(১) প্রাথমিক প্রফেজ (Prophase), (২) মেটোফেজ (Metophase), (৩) এ্যানাফেজ (Anaphase) এবং (৪) টেলোফেজ (telophase)।

প্রফেজ—এই পর্যায়টা বলা যেতে পারে প্রস্তাবনা মাত্র। যখন এই পদ্ধতিতে কাজ সুরু হয় তখন নিউক্লিযাস্ বড় হতে থাকে। তখন নিউক্লিয়াসের বহিরাবরণ থাকে মোটা সুতরাং বড় আকার ক্রোমোজোমে পরিণত হয়।

অনেক সময় নিউক্লিয়াসের এক আগা আর এক আগার সঙ্গে বৃত্তাকারে জোড়া থাকে। এগুলি শেষের দিকে বিভক্ত হয়ে এক একটি ক্রোমোজোম তৈরী করে। আস্তে আস্তে এই ক্রোমোজোমগুলি সোজা হযে পুরু হতে থাকে এবং একে অন্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করতে থাকে। প্রতিটি ক্রোমোজোম মাঝখানে বিভক্ত হয়ে পড়ে ফলে তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে এই পর্যায় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়র পর্দা (membrane) দূর হতে থাকে। দেখা যায় কোষের মধ্যে কেবলমাত্র ক্রোমোজোম আছে। এই সময়ে অনেকগুলি সরু রেখার মত দেখা যায়। এই সময়ে ক্যারি ও সিম্প একটি মাকুর মত আকার নেয় এবং ক্রোমোজোমগুলি ঐ মাকুর মাঝখানে জড়িয়ে রাখে।

মেটোফেজ—এই বিশিষ্ট পরোক্ষ পদ্ধতিতে মেটোফেজ পর্যায় খুব অল্পকাল স্থায়ী। এইখানে এসে প্রতিটি ক্রোমোজোম মাকুস্থিত সরু সূতার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ক্রোমোজোমের দুই আগা যুক্ত থাকে। মিশবার স্থান যে কোন অংশে হতে পারে।

এ্যানাফেজ—এই সময়ে ক্রোমোজোমগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, একে অন্যকে ছেড়ে পৃথক হয়ে পড়ে। লাঠির মত একটা ক্রোমোজোম থেকে U-এর মত কিম্বা V-আকারের কন্যা-ক্রোমোজোম উৎপন্ন হয়। এইবার

মাকুটা বাড়তে থাকে। এই ক্রোমোজোমগুলি আলাদা হয়ে উপরে চলতে থাকে। মনে হয় যেন মাকুর বিভিন্ন অংশে এক এক জাতীয় ক্রোমোজোমগুলিকে টানছে। কতকগুলি অর্থাৎ এক এক জাতীয় ক্রোমজোম এক প্রান্তে জমা হয়। কতকগুলি মাকুর এক আগায় যায় কতকগুলি অন্য আগায় যায়।

টেলোফেজ—এই পর্যায়ে এসে সম্পূর্ণ কন্যাকোষ সৃষ্টির শেষ হয়। বিভিন্ন মেরুতে কন্যা ক্রোমোজোমগুলি মিলিত হয়ে ছোট আকার ধারণ করে আর চারিদিকে রেটিকুলামের সৃষ্টি হয়। এইবার ধীরে ধীরে মাকু দূর হয়ে যায়। আস্তে আস্তে চারিদিকে নিউক্লিয়াস পর্দার সৃষ্টি হয়। এইভাবে ২টি কন্যাকোষের সৃষ্টি হয়।

কোষ বিভক্তি-করণ পদ্ধতির পরোক্ষ পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ সুরু হয়ে গেলে সাইটোপ্লাজম বিভক্ত হতে থাকে। বৃক্ষ কোষের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থ মাকুর মত স্থলে জমা হয়ে পর্দার মত কাজ করতে থাকে ততই সাইটোপ্লাজম-এর মধ্যে কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। মাঝখানের পর্দা দূরীভূত হলে দুটি বিভিন্ন কোষ সৃষ্টির সুবিধা হয়।

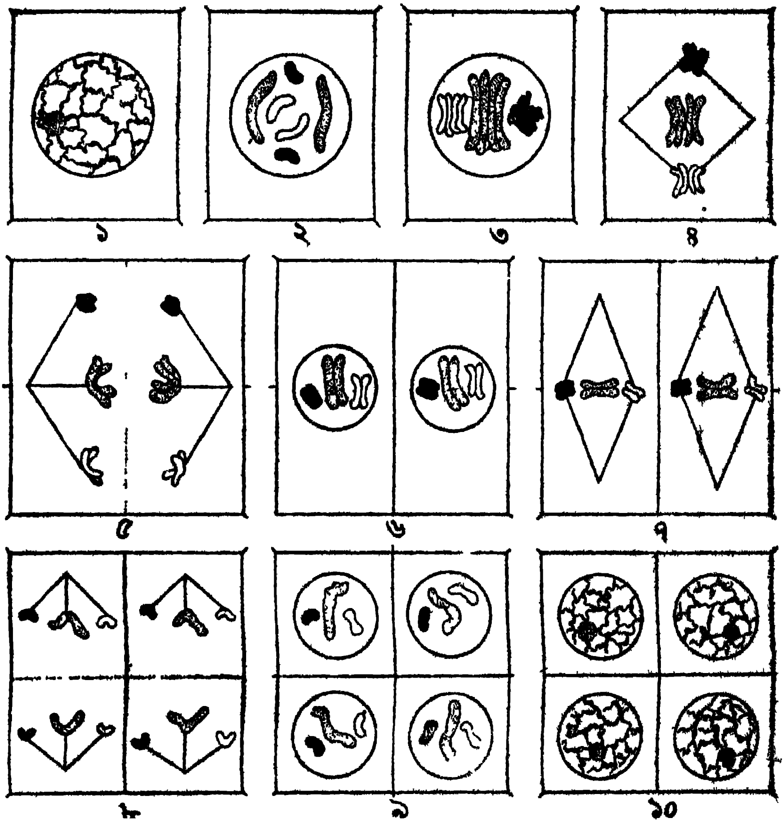
প্রাণীদের মধ্যে এইভাবে কোষ বিভক্ত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এদের কোষের মধ্যে সেণ্ট্রোজোমের অবস্থান ও সাইকোইনেসিস্ প্রথায় একটু পার্থক্য আছে মাত্র। মিটোসিস্ পদ্ধতিতে সেনট্রোজোম বিভক্ত হয়ে যায় এবং দুই বিভিন্ন দিকে চলে যায়। প্রত্যেকে আধাতরল পদার্থের মাঝখানে নিউক্লিয়াসের মত বসে থাকে এবং আলোক বিকিরণ করে। আর এই দুটির মাঝখানে থাকে মাকুর মত একটা জিনিষ। সেণ্ট্রোজোমগুলি বিভিন্ন মেরুতে গিয়ে পৌঁছিয়ে টেলোফেজ পর্যায়ের কাজ সুরু না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। মাকুতে যে সমস্ত ক্রোমোজোম থাকে তারা বিভিন্ন মেরুতে গিয়ে জমা হয়। সাইটোকাইনেসিস্ পদ্ধতিতে মাকুর মাঝখানে বিভক্ত হয়ে যায় আর আঙ্গুলের মাটি কাটার মত এটা শেষ পর্যন্ত বাড়তে থাকে।

এমিটোসিস্—খুব সহজ ও সরল পদ্ধতি। নিউক্লিয়াস কোষের মাঝখানে গোলাকার আকারে থাকে। এর দুই মেরুদেশ একটু ফুলে উঠে সেখান থেকে দুটি বিভিন্ন নিউক্লিয়াস তৈরী করে। এর পরই সাইটোপ্লাজম তৈরী হয় এবং ভাগ হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিভিন্ন কোষ তৈরী হয়ে যায়। নিম্নশ্রেণীর গাছের মধ্যে এই জাতীয় পন্থা চলে।

মিটোসিসের বৈশিষ্ট্য—ক্রোমোজোমের মাধ্যমে পিতা মাতা থেকে সন্তানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ ও ধর্ম পরিবেশিত হয। যদি কন্যাকোষকে তার পিতা ও মাতার সমধর্মী হতে হয তবে তার পিতার ক্রোমোজোম ও মাতার ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমানভাবে সন্ততিতে বর্ষিত হতে হবে। ক্রোমোজোমের সংখ্যার উপর বর্তমান উৎপত্তিতত্ত্ব (genetics) প্রতিষ্ঠিত। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে একটি সরল রেখায সাজানো জেনিস্ (genes)। যদি এই ক্রোমোজোম লম্বা হযে দুটি ভাগ হয়ে যায তখন এই জেনিস্ও সংখ্যায় দ্বিগুণ হযে পড়ে এবং সমানভাবে বিভক্ত হয়ে দুইটি বিভিন্ন নিউক্লিযাসের সৃষ্টি করে। সুতরাং মিটোসিস্ পদ্ধতিতে সমান সংখ্যক সংখ্যায জেনিস্ বিভক্ত হযে পড়ে।

মাইয়োসিস্—বীজাণু কোষের সৃষ্টির সময় বিশেষ রকমের কোষ বিভক্ত হয়। বলা যেতে পারে স্পারমেটাজোয়া ও ওভা সৃষ্টির সময এই ধরণের পদ্ধতি কাজ করে। দেখা যায যে যখন কোন জাতের প্রাণীর দেহে কোষগুলি পূর্ণাবয়ব পায় তখন নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে পড়ে। আরও সংক্ষেপে বলা যায় কোষের মধ্যকার ক্রোমোজোমের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করলে সেই জাতের নিউক্লিয়াসের সংখ্যা পাওয়া যায়। এইগুলিকে বলা হয় ডিপ্লয়েড সংখ্যা। উচ্চস্তরের প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে সন্তান-সন্ততি হয়। এদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জাতের নিউক্লিয়াসের মিলনে নূতন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়ে নূতন প্রাণের সঞ্চার করে। যদি স্ত্রী ও পুরুষ এই বিভিন্ন নিউক্লিয়াস সম্পূর্ণ ডিপ্লয়েড সংখ্যা বহন করে তবে গর্ভাশয়ে

গিয়ে এদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ কোন জাতের প্রাণীতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সকল সময় একই রয়ে যায়। সুতরাং কোন মিলনের সময় এই ডিপ্লয়েড সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়।



মাইয়োসিস্ পদ্ধতি

মাইয়োসিস্ পদ্ধতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা প্রথমে অর্ধেক হয়ে যায়। এর আগেই এদের মধ্যে নানা পরিবর্তন আসে। পরিবর্তনগুলিকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রথমে ক্রোমোজোমের ভিপ্রয়েড সংখ্যা মিটোসিস পদ্ধতির মত সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দেখলে মনে হয় না এদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে। (২) একই জাতের, একই ধরণের ক্রোমোজোমগুলি নড়ে নড়ে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলে গোলাকার স্থতাকৃতি দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর থেকে কোনো ক্রোমাটিড তৈরী হয় না। একটি ক্রোমোজোম আর একটির সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যে কেবলমাত্র হ্যাপলয়েড সংখ্যা দেখা যায়। এটাকে বলে জাইগোটিন অবস্থা। (৩) ক্রোমাটিন ঘনীভূত হওয়ায় এবং জল কমে যাওয়ায় ক্রোমোজোমগুলি আকারে ছোট হয়ে পড়ে এবং একটু পুরু হয়। এই সময়ে একই জাতের ক্রোমোজোমের মধ্যে আত্মীয়তা বেড়ে যায় এবং দেখলে মনে হয় যেন একে অন্যকে জড়িয়ে আছে। একে বলা হয় প্যাকেটিন অবস্থা। (৪) এইবার প্রতিটি মিলিত ক্রোমোজোম ছুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং একে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে চায়। এইটাকে বলা হয় ডিপ্লোটিন অবস্থা। ছুটি ভেঙ্গে যে চারটি ক্রোমাটিড তৈরী হয় তারা এক একটি ছুটির সমাবেশে তৈরী।

মেটাফেজ—এর পরই নিউক্লিয়াস মাকুর সৃষ্টি হয়। স্থতাগুলি বিষুব-রেখার উপর সমবেত হতে থাকে। এই সময়ে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দূর হয়ে যায়। ক্রোমাটিডগুলি এই সময়েও একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বিষুবরেখা অঞ্চলে একটি থালির মত হওয়ার সঙ্গে মেটাফেজের পর্যায় শেষ হয়।

এ্যানাফেজ—ছুটি একই জাতীয় ক্রোমোজোম, প্রত্যেকে ছুটিমাত্র ক্রোমাটিড বহন করে একে অন্যের থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা মাকুর মাধ্যমে ছুটি বিভিন্ন মেরুর দিকে চলতে থাকে। এক জোড়া যুক্ত ক্রোমাটিড এক মেরুর দিকে অন্য জোড়া অন্য মেরুর দিকে যেতে থাকে। এর পরই টেলোফেজের কাজ শুরু হয়।

টেলোফেজ—কোষটি দুটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে আর প্রত্যেকের মধ্যে থাকে মোট ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যা। এই সময়ে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন দেখা যেতে পারে এবং দুটি বিভিন্ন কোষ তৈরী হয়ে গেলে একটু বিশ্রাম নেয়। অনেক সময় আবার নিউক্লিয়ার মেমব্রেন মোটেই তৈবী হয় না এবং ঐ কন্যাকোষগুলি আবার বিভক্ত হযে পড়ে।

মাইযোসিসের বিশেষত্ব দুটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়া। একটা কন্যাকোষ সৃষ্টি করতে মিলিত ক্রোমোজোম থেকে একদিকে অর্ধেক চলে আসে। দ্বিতীয় বাব ভাগেব সময ক্রোমোজোম ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ক্রোমোজোম—ক্রোমোজোম কি? এর প্রয়োজন কি?

মানুষেব বা অন্য কোন প্রাণীদেব এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের যে মিলন সূত্র সেটি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বকোষের মিলন মাত্র। সরল কথায় বলা যেতে পাবে দুই পুরুষের এটা সেতু যাব উপর দিয়ে পিতাব গুণ ও ধর্ম্ম সন্ততিতে বর্তিত হয। সেতুপথে নানা বাধা আছে কারণ কোষের মধ্যবর্ত্তী নিউক্লিয়াস হলো সেই সেতুপথ। সেই সেতুপথ দিয়ে ক্রোমোজোম আকারে খুব ছোট—খালি চোখে দেখা যায় না। লম্বায় ১০০০০" ই. থেকেও ছোট। জাতি বা প্রাণিগত বৈশিষ্ট্য এই ক্রোমোজোমের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। অর্থাৎ মানুষের সন্ততি মানুষ, কুকুরের সন্ততি যে কুকুব হবে সমস্ত নির্ভর করে ক্রোমোজোমের উপর।

প্রাণীমাত্রেরই হোক বা উদ্ভিদ মাত্রেরই হোক জীবন সুরু হয় একটি মাত্র কোষের মাধ্যমে। নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘিরে থাকে সাইটোপ্লাজম। পুরুষের কোষ নিউক্লিয়াস চ্যুত হয়ে স্ত্রী সেল নিউক্লিয়াসের সাইটোপ্লাজমে ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে পুং ও স্ত্রী নিউক্লিয়াস সরু সরু লম্বা সুতাকৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে এই সুতাকৃতিগুলো ভেঙ্গে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন এই ভগ্ন সুতাকৃতিগুলিকে বলে ক্রোমোজোম।

এই সময়ে নিউক্লিয়াস দুটির কেন্দ্রবিন্দু যে রেখায় থাকে সেই রেখা

মারফৎ ক্রোমোজোম চলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি সমান সংখ্যক দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইবার স্ত্রী নিউক্লিয়াসের অর্ধেক পুরুষ নিউক্লিয়াসের অর্ধেকের সঙ্গে মিশে নূতন কোষ সৃষ্টি করে। এইগুলিকে বলা হয় হাফ ক্রোমোজোম। সীমান্তে পৌঁছিয়ে মিলিত হয়ে নূতন নিউক্লিয়াস তথা নূতন কোষ সৃষ্টি করে।

এর থেকে বোঝা যায় যে পিতা-মাতার মিলিত ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যা সন্ততিতে আসে। অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতের প্রাণীতে যে সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে সন্ততিতে সেই সংখ্যা দেখা যায়। প্রকৃতি অতি সযত্নে নিউক্লিয়ার পদার্থগুলি বিশেষতঃ ক্রোমোজোমগুলি সমান ভাগে ভাগ করে। এখানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে না। কারণ এই নিউক্লিয়ার পদার্থের সামান্য বিন্দুটি পর্যন্ত প্রয়োজন নূতন জীবনের সৃষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে এই ক্রোমাজোমগুলি পুরুষ (পরবর্তী পুরুষেব) নির্দেশনা দেয়।

ক্রোমোজোম কোষ-এর একটি বিশিষ্ট অংশ। প্রত্যেকটি ক্রেমোজোমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যখন নূতন কোষ তৈরী কবতে গিয়ে বিভক্ত হয় তখন সমানভাবে বিভক্ত হয়।

মানুষের কোষে থাকে ৪৮টি ক্রোমোজোম আর গমে আছে ৪২টী, লিলি ফুলের কোষে থাকে ২৪টি, মাছির আছে ৮টি আর গোল পোকার থাকে ৪টি।

কোষের মধ্যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকলেও তার আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতিতে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তবে তারা সব সময় জোড়ে থাকে অর্থাৎ আকারে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে ২টি ক্রোমোজোম সমান। কিন্তু অন্য জোড়ের সঙ্গে এদের তফাৎ আছে নানা বিষয়ে। কোষের মধ্যে এদের অবস্থান হিসাবে হয়ত মিল নাও থাকতে পারে তবে আকারে, গুণ ও ধর্মে সমান সব। মানুষের কোষের মধ্যে যে ৪৮টি ক্রোমোজোম থাকে তারা মূলতঃ ২৪ জোড়া। এরা থাকে জড়াজড়ি বেঁধে, সুতরাং বার থেকে বোঝা যায় না। যদি এক লাইনে এদেরকে সাজানো যায় তবে সব

পরিষ্কারভাবে জোড়াগুলি দেখা যায়। মানুষের ক্রোমোজোম যেমন পরিষ্কারভাবে দেখা যায় কারণ এর সংখ্যা বেশী, অন্য অনেক ক্ষেত্রে ঠিক এভাবে পরিষ্কার দেখা যায় না।

এইভাবে জোড়ের কারণ হলো যে এই ক্রোমোজোম এসেছে একটি পিতার থেকে অন্যটি এসেছে মাতার কাছ থেকে।

মিলনের সময় এরা নানাপ্রকার মিশ্র অবস্থায় থাকলেও কোনটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় না। তারপর যখন নিজের স্থান পায় তখন সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। সাধারণ কোষের মধ্যে এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু প্রজনন কোষ, পরবর্তী বংশধারা রক্ষায় প্রয়োজন হবে। তারা হঠাৎ তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকট করে তোলে। পুং ও স্ত্রী ক্রোমোজোম তারা পবস্পর একে অন্যে মিলবার সঙ্গী খুঁজে পায় এবং একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরে দুজনে এক হযে গিযে একটি মাত্র ক্রোমোজোমের সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রজনন কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণ ক্রোমোজোমের অর্ধেক থাকে।

পিতার সঙ্গে পুত্রের বা কোন পুরুষের সঙ্গে পরপুরুষের আকৃতি প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যের অভাব হয় না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেণ্ডেল সূত্রানুসারে বলা যায় যে যখন ক্রোমোজোম কন্যাকোষ তৈরী করতে গিযে বিভক্ত হয় তখন কোন একটি বিশেষ ক্রোমোজোম সমপর্যায়-ভুক্ত স্ত্রীকোষের ক্রোমোজোমের সঙ্গে মিলে, কিন্তু পরে কন্যাকোষে যাওয়ার সময় তারা পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে পিতার সঙ্গে পুত্রের পার্থক্য হয়।

বংশধারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নির্ভর করে ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্যের উপর।

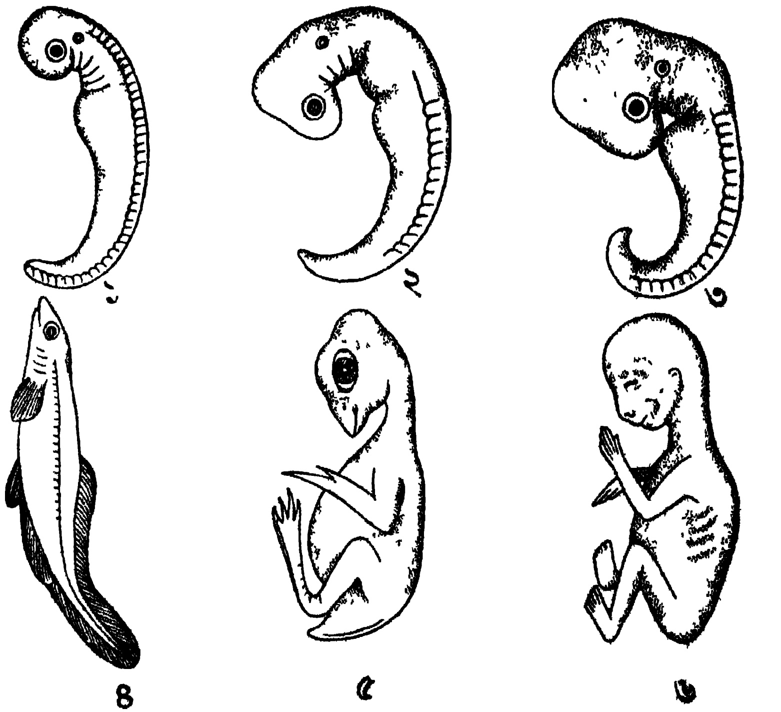
দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবর্তনবাদ ও মেণ্ডেল সূত্র

(Heredity and Mendel's Law)

বিবর্তনবাদ ও তার প্রমাণ—বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত দশ লক্ষেরও বেশী প্রাণী ও গাছের জাতের আবিষ্কার করেছেন। এর থেকে সত্যই মনে জাগে এই যে অসংখ্য সীমাহীন বৃক্ষের শ্রেণী পৃথিবীর উপরে এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এবং অসংখ্য প্রাণী স্থল, জল ও অরণ্যে বাস করছে—এদের উৎপত্তি বা কোথায় আর শেষই বা কোথায় ? এরা এলই বা কোথা থেকে ? এদের গোড়ার কথা সন্ধান করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে ৪টি উল্লেখযোগ্য সূত্র আছে। (১) আবহমানকাল পৃথিবীর এই বর্তমান অবস্থা, (২) ঐচ্ছিক সৃষ্টি, (৩) আকস্মিক ও (৪) জৈব বিবর্তন। পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী ও গাছপালা আছে তারা ঠিক এইভাবে আগে ছিল না। আজ যে গাছ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যে প্রাণী আমাদের সামনে মাঠে ঘাস খাচ্ছে এমন কি এই যে আমি আজ লিখছি, পড়ছি ও কথা বলছি কিছুদিন আগে এমনি ঠিক ছিল না। আজ যে প্রাণী ও গাছপালা দেখা যায় তারা ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রাণীদের মধ্যে দৈহিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আনে। পরিবর্তনের ফলে হয় অন্যান্য পরিবর্তন। যার ফলে অতি সামান্য সহজ দেহ থেকে প্রাণীরা আজিকার এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তন কোনো এক দিনে নয় হঠাৎ নয়, লক্ষ বর্ষ ধরে দিনের পর দিন ধীরে ধীরে। জৈব বিবর্তনবাদ আজ প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। এর স্বপক্ষে বলা যায় আবার বিপক্ষেও বলবার আছে।

বহির্দেহের প্রমাণ—(১) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য—নিঃসন্দেহে বলা যেতে পাবে যে জীবদেহ কোন সহজ সরল আকারের ক্রমবিকাশ ও বিশেষ পরিবর্তন মাত্র। এই বিশেষ সহজ ও সরল আকারের মধ্যে আছে প্রোটোপ্লাজম বা জীবের প্রাণ। পৃথিবীর সৃষ্টি পরে পৃথিবীতে প্রাণী আগমনের কালে দেখা যায় এক কোষ বিশিষ্ট সহজ সরল প্রাণী। এই প্রাণী জাইলাম। প্রোটোজোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর থেকে



১—৪ মাছের ভ্রূণ ও মাছ ২—৫ মুরগীর ভ্রূণ ও শাবক ৩—৬ মানুষের ভ্রূণ ও শিশু

উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীতে দেখা যায় ২টি কোষ স্তর। তার পরের আংশ তিনটি কোষ স্তর। যদি প্রত্যেক শ্রেণীটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সৃষ্টি

হতো তাহলে তাদের বিভিন্ন কোষের অংশও বিভিন্ন আকারের হতো। কিন্তু বাইরের থেকে দেখলে, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূলতঃ এদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এর বেশী পরিমাণ সাদৃশ্য রয়ে গেছে যা থেকে সহজেই মেনে নিতে পারা যায় যে কোন একটি বিশেষ অংশ অতি সহজ ও সরল অংশের ক্রমবিকাশ মাত্র।

(২) সংযোগী সূত্র (connecting link)—অনেক সময় দেখা যায় এক শ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীব কোন সংযোগ বা মিল নেই। ধরা যাক চতুষ্পদ প্রাণী ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়? মানুষের দুটি পা আর দুটি হাত। মানুষ দুই পাযে হাঁটে, কিন্তু চতুষ্পদ প্রাণী ৪ পাযে হাঁটে। ৪ পাযে হাঁটলেও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায সামনেব দুটি পা শুধু অপ্রধান নয আকাবেও বেশ একটু সরু। কিন্তু অস্ট্রেলিযার কাঙ্গারুব ৪টি পা থাকলেও সামনের পা দুটিকে সে প্রায় হাঁতের মতই ব্যবহাব কবে। এমনিভাবে একটার সঙ্গে অনেক সময আর একটির মিল করা কষ্টকর হযে পড়ে। এ সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ না দিতে পারলেও পাহাড়ের গায়ে বা অন্য অনেক জাযগায এর প্রমাণ রযে গেছে যে প্রস্তরীভূত সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করেন পৃথিবীতে প্রাণীসমূহেব মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। সরীসৃপ জাতীয যারা চার পাযে বুকে হেঁটে বেড়ায তার সঙ্গে পাখীর সম্বন্ধ কোথায়? অনেক দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানী ঘোরাফেরা করেছেন বিভিন্নপথে। কিন্তু জার্মানীর ব্যাভেরিযা প্রদেশে আর্কিওপটেরিক্স এর আবিষ্কার হওযার পর সমস্ত সমস্যা সমাধান হযে গেল। ঠিক এমনিভাবে সমস্যার সমাধান হযেছে স্তন্যপাযী এবং সরীসৃপের মাঝখানে অস্ট্রেলিয়ার মনোট্রিমস আবিষ্কৃত হয়ে।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—বাহিরের থেকে দেখলে মনে হয় দুইটি বিভিন্ন প্রাণীর কোন বিশেষ বিশেষ অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। মানুষের হাত আর পাখীর সামনের ডানার মধ্যে বহিরাগত সাদৃশ্য রয়ে গেছে কারণ এগুলি সবই সামনের অঙ্গ আর মূলতঃ এই অঙ্গগুলির

হাত, পেশী এবং শিরার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আবার বাদুড় পাখীরও সামনের ডানাগুলি একই শ্রেণীর ও সাদৃশ্যও বেশী। এদের কাজও একই রকমের। উড়তে সাহায্য করে। প্রজাপতির ডানা আর পাখীর ডানার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ আর উড্ডীয়মান পাখীর ডানার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। পাখীর ডানার সঙ্গে দেহের হাড়ের সংযোগ আছে কিন্তু পতঙ্গের ডানা, তাদের দেহের মাংসের একটা বর্দ্ধিত অংশ ভিন্ন আর কিছুই না। তাদের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও তাদের কাজ একই ধরণের।

(৩) নিদর্শনিক অঙ্গ (vestigal organ)—প্রাণীজগতে প্রায়ই দেখা যায় প্রাণীদের মধ্যে যে অঙ্গটি কোন একটি প্রাণীর বিশেষ প্রয়োজনীয়, অন্য প্রাণীর সেটা বিশেষ প্রযোজনীয় নয়। যেমন জিরাফের গলা লম্বা। গাছের পাতা খেতে একে সাহায্য করে। কিন্তু অন্য প্রাণী লতাপাতা খেয়ে বাঁচলেও তাদের গলা অতটা লম্বা নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে কোন বিশেষ অঙ্গ এককালে প্রযোজনীয হলেও আজ তার সেই প্রাণীটির প্রয়োজন অভাবে কেবলমাত্র নিদর্শনিক অঙ্গ হিসাবে রয়ে গেছে। সাপের পিছনের পা, নিউজিল্যাণ্ডের কিউরি পাখীর ছোট ডানা, ইত্যাদি প্রমাণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের বহুদিন পূর্বে এই সমস্ত জিনিষ বর্তমান ছিল। কিন্তু কালক্রমে পারিপার্শ্বিক আবহাওযাতে ও অবস্থায় এদের চলন রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু আজও সেগুলির ধ্বংস হয়নি বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিবর্তিত হয়নি।

ভ্রূণতাত্বিক প্রমাণ—ভ্রূণের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে তাদের ক্রমবিকাশ হতে গিয়ে এমন কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ হয় যার আপাতঃ কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু এগুলি অনেক সময় তাদের মিশ্র আকৃতির সাক্ষ্য বহন করে, যেমন ধরা যাক স্তন্যপায়ী পশুর ভ্রূণের এক অবস্থায় দেখা যায় যে মাছের মত তাদের ঝিল্লীছিদ্র ও ভিসজেরাল খিলান আছে। যেগুলিকে আমরা কানকো বলি

সেগুলি অনায়াসে মাছের মত জলে সাঁতার কাটে। এগুলি ব্যাঙের ডিমের লার্ভা অবস্থা। আর এটা কথিত আছে যে কোন প্রাণীর লার্ভা অবস্থায় তাদের পূর্ব-পুরুষের বিশেষ ছাপ পড়ে। এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে প্রথমে হেগেল তার প্রাণী উৎপত্তি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের প্রধান উপপাদ্য বিষয় হলো কোন একটা বিশেষ প্রাণীর অধস্তন পুরুষেব উৎপত্তিকালে নিজের পূর্বপুরুষের সাদৃশ্য বজায় রাখে। ভ্রূণের সাদৃশ্য নিয়ে ভ্রূণজীব এই পর্ব আলোচিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়ে গেছে। এব থেকে আমাদেব প্রমাণ করতে কোন কষ্ট হয় না যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হযেছে।

(৪) ফসিল তত্ত্ব—ফসিলের বিষয় নিযে যে শাস্ত্রে আলোচিত হয তাকে বলা হয় ফসিল তত্ত্ব। পৃথিবীতে কত প্রাণী এসেছে কত প্রাণী পৃথিবী থেকে চলে গেছে তার কোন ইযত্তা নেই। চলে গিয়েছে খুব সত্য, কারণ পৃথিবীতে কোন জিনিষই চিরস্থাযী নয়। কিন্তু চিরস্থাযী হওয়ার ইচ্ছা প্রাণীমাত্রেরই আদিম ইচ্ছা। তাই সে বেঁচে থাকতে চায় নিজের সন্তান-সন্ততির মধ্যে, কিন্তু পৃথিবীর বযস এত বেশী যে তার মধ্যে নিজের সন্তান-সন্ততিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই আদিকালে বিভিন্ন দেহবিশিষ্ট প্রাণী মরে গিযে আজ প্রস্তরীভূত হযে রয়ে গেছে। গাছই হউক আর প্রাণীর হাড়ই হউক তারা প্রস্তরীভূত হয়ে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বহুদিন পূর্বে এই ধরণের কোন প্রাণী আমাদের এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত আজও যেমন নানা প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণতঃ ৪ রকমের ফসিল দেখা যায়।

(১) মৃত ও রক্ষিত দেহ, (২) পদচিহ্ন, (৩) চিহ্ন ও (৪) প্রস্তরীভূত চিহ্ন। এই প্রস্তরীভূত ফসিল থেকে জৈব পদার্থগুলি অপসারিত হয় এবং অজৈব রাসায়নিক পদার্থ ঠাঁই করে নেয়। এইভাবে এগুলি তৈরী। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে এই ফসিল দেখা যায়। যত নিম্নস্তরে এই ফসিল পাওয়া যাবে তত বেশী বয়স হবে সেই প্রাণীর যারা একদিন আমাদের এই

পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত। এই সমস্ত ফসিল অনুধাবন করে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার মধ্যে একটা প্রধান হলো আর্কিওপট্রিক্স। এর ছিল পালক-সমন্বিত পাখার মত ডানা এবং শক্ত দাঁত আর লম্বা লেজ। আর সরীসৃপ শ্রেণীর মত হাড়-সমন্বিত আঙ্গুল। আজ আমরা যে ঘোড়ায় চড়ি সে ঘোড়ার জীবনেতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বর্তমানের এক গোড়ালি বিশিষ্ট ঘোড়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে আর এক কালের ঘোড়ার সঙ্গে অন্য কালের ঘোড়ার অনেক পার্থক্য রয়ে গেছে আবার যেমন সাদৃশ্য ও বর্তমান। উট ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী হস্তীজাতীয় প্রাণীর আলোচনা করে পণ্ডিতেরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে বিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছে।

৫। ভৌগোলিক প্রমাণ—গাছপালা আর প্রাণি দিয়ে পৃথিবীটা ভর্তি। কিন্তু প্রত্যেক দেশের প্রাণি ও গাছপালার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এক একটি বিশেষ স্থানে এক এক জাতীয় গাছ আর প্রাণী গড়ে উঠে। যেমন মেরু অঞ্চলে শীলমাছ আর এস্কিমো অনায়াসে বাঁচতে পারে। কিন্তু ঐ এস্কিমোকে যদি গ্রীষ্মমণ্ডলে নিয়ে আসা যায় তবে তারা আর বাঁচবে না। আবার যে সমস্ত গাছ ও প্রাণী উষ্ণমণ্ডলে বেড়ে উঠে তাদেরকে যদি আবার ঠাণ্ডা অঞ্চলে প্রেরণ করা যায় তবে তারাও বাঁচবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রাণী ও গাছপালা নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বংশানুক্রমিক বাস করে। যদি কোন দিন বাতাসে কোন বীজ দূরাঞ্চলে চলে যায় তবে কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া উপযোগী না হওয়ায় তাদের অঙ্কুরোদ্গম হবে না। পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন জায়গার আবহাওয়া বা জলবায়ু বিভিন্ন সুতরাং বিভিন্ন জায়গার প্রাণী ও গাছপালার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় যে প্রাণী বা গাছ দেখা যায় সেই জাতীয় গাছ আর কোথাও দেখা না গেলেও দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু অঞ্চলে সে গাছ বহু

পরিমাণে দেখা যায়। এই দুই দেশের মাঝখানে আছে দুস্তর সাগর। একে পেরিয়ে কেমন করে সম্ভব একের অন্য স্থানে যাওয়া। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রজনন প্রথায় কাজ হলেও তাদের মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ রয়ে গেছে। এইভাবে একই শ্রেণীর মধ্যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা স্বাভাবিক। এইভাবে নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ—প্রাণীর সংখ্যা পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে গাণিতিক সংখ্যায় বর্ণের ক্রমবিকাশের সঙ্গে। একটি মাছ বা একটা উইপোকা তাদের জীবনে কয়েকশত লক্ষ ডিম পাড়ে। যদি এইভাবে সব ডিমগুলি থেকে শাবক বার হয় ও তারা বাঁচে তবে দেখা যাবে পৃথিবীতে অন্য প্রাণীর স্থান নেই। প্রাণীদের মধ্যে সব থেকে কম শাবক হয় হাতীর। ৫০ বৎসরে হস্তিনী একটি মাত্র শাবক প্রসব করে। যদি কেবলমাত্র হস্তি-শাবক যতগুলি জন্মগ্রহণ করে সবগুলিই বাঁচতো তবে পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণীর ঠাঁই থাকতো না। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রাণীজগতে প্রাণীর সংখ্যা প্রায় সমান আছে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা সমান। যদি প্রাণীসংখ্যা বেড়ে চলে তবে প্রাণীদের থাকবার স্থানের ও খাদ্যের অসংকুলান হবে। কারণ পৃথিবীতে উৎপাদিত খাদ্য ও ঠাঁই সীমিত। পৃথিবীতে যে স্থান আছে এখন যে খাদ্য উৎপাদিত হয় সেগুলি একটা পরিমিত সংখ্যক প্রাণীদের খেয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে সম্ভব। যদি প্রাণীদের সংখ্যা বাড়ে তবে স্থান আর খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে। জনসংখ্যা পৃথিবীতে বেড়ে চলেছে। বিশেষতঃ পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্নভোজী অঞ্চলে অসম্ভব রকম জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করে বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলী বলেছেন—এইভাবে বৃদ্ধি গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

প্রাণীকে বেঁচে থাকতে গেলে লড়াই করে বাঁচতে হয়। এই লড়াই দুই রকমের (১) অন্তর্শ্রেণী ও বহিশ্রেণী। বাঘের সঙ্গে বাঘের লড়াই করতে হয়

স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে। আবার অন্য জাতীয় প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও লড়াই করতে হয়। লড়াই করে মানুষ বাঁচে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ লড়াই করে চলেছে অন্য প্রাণী, প্রতিকূল জলবায়ু প্রভৃতি নানা রকমের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। কিন্তু এতেও সব শেষ নয় এর উপর আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই। আছে স্বার্থের হানাহানি। এ লড়াই আরও প্রকট হয় যদি অল্প স্থানে একজাতীয় বহু প্রাণীর সন্নিবেশ হয়। সামান্য নড়তে গেলে বা চলতে গেলে যদি একপ্রাণী অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খায় তবে তাদের মধ্যে আসবে অমিল ও অসহযোগ ও মতানৈক্য এর থেকে সৃষ্টি হবে গণতন্ত্রে পরিপন্থী মনোভাব। এই লড়াইয়ে দুর্বল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কেবলমাত্র শক্তিমান যারা তারাই বেঁচে থাকবে। শক্তিমান কেবলমাত্র গায়ের শক্তিতে হয় না। কারণ দেখা যায় একটা মোটাসোটা লোক সামান্য ঠাণ্ডা লেগে দুইদিনের নিউমোনিয়া রোগে মারা গেল, কিন্তু একটা রোগা লোক সেই অবস্থায় কোন রকম অসুবিধা ভোগ করলো না।

প্রাণী নিজের সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিজের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও অন্যান্য স্থান থেকে আহরণ করে সেই স্থান-কাল-পাত্রানুযায়ী নিজের সন্তান-সন্ততির মধ্যে শক্তি রেখে যায়। কিন্তু সবাই সমান শক্তি-সম্পন্ন হয় না। একজন জীবন-সংগ্রামের লড়াইতে কৃতকার্য হয় অন্যজন সামান্য আঘাতে মারা যায়। একেই বলা হয়—“উপযুক্ত নির্বাচন”। সেই উপযুক্ত যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও জীবনের ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, যে পারে না তাকে মারা যেতে হয় এই জৈবিক লড়াইতে। পারি-পার্শ্বিক অবস্থাও পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতি ও কতকগুলি প্রাণীকে সমাদর করছে আর কতকগুলিকে সমাদর করছে না। অসমাদৃত সেই আবহাওয়ার অনুপযোগী বিবেচিত হচ্ছে।

এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকে বৈষম্য আসছে। জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্যতা লাভের জন্য এই পরিবর্তন। কিন্তু বৈষম্য খুব আস্তে ও মন্থরপদে চলে।

আর এমনভাবে চলে যে বোঝা যায় না। অনেক দিন লাগে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এক শ্রেণী প্রাণীদের মধ্য থেকে অন্য শ্রেণীর প্রাণীর উৎপত্তি হতে। বিবর্তন খুব ধীরে চলে; প্রযোজন হয অসীম সময়ের আর এর গোড়ার কথা হলো—বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। কোন একটা বিশেষ শ্রেণী প্রাণীই হোক আর গাছপালাই হোক একটা বিশেষ আবহাওযায় বেড়ে উঠেছে ও উঠছে এর যদি কোন ঠাঁই নাড়া করা যায তবে তার অস্তিত্ব লোপ পাবে।

সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করে ডারউইন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন।

(১) পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য।

(২) জীবন-সংগ্রাম।

(৩) অসম্ভব পরিমাণে প্রাণীসংখ্যা বৃদ্ধি।

(৪) স্থান ও খাদ্যের পরিমাণ সীমিত।

(৫) কেবল যারা উপযুক্ত তারাই বাঁচবে।

মেণ্ডেল সূত্র

পিতা ও পুত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক নিকট-সম্বন্ধ আছে। পুত্র পিতার মত দেখতে হয। কথিত আছে "Like begets like", কিন্তু এক পুরুষের সঙ্গে অপর পুরুষের তফাৎও আছে। পিতা ও পুত্রের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য হওয়ার কারণ—বংশধারা মাধ্যমে প্রকাশ করা যায।

দুটি প্রজনন কোষ—একটি পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী গ্যামিটএর মিশ্রণের ফলে একটা নূতন কোষের সৃষ্টি হয। আর এই নূতন কোষ মিটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হযে ২টি নূতন কোষ এবং পরে গাছের শিকড়ের আঁশ যেমন বর্দ্ধিত হয় তেমনি পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পায। কোষের মধ্যে ক্রোমোজোম থাকে। এগুলি জীবন্ত। প্রতিটি কোষ সমসংখ্যক ক্রোমোজোমসহ মিলিত হযে থাকে। মিলিত কোষে সৃষ্ট ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায। কিন্তু পরে

যখন এর থেকে ২টি কোষ হয়ে যায় তখন ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্দ্ধেক হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি প্রতিটি কোষে ১৬ সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে তবে তাহা ২টি কোষে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এক একটিতে ৮টি করে ক্রোমোজোম ধারণ করবে।

গর্ভরেণু যখন এনথার থেকে চ্যুত হয়ে কারপেলের মধ্যস্থিত স্টিগমাস্থিত গর্ভরেণুর সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন ঐ পদ্ধতিকে বলে প্রজনন।

যদি একই ফুলের গর্ভকেশরের গর্ভরেণু পুং কেশরের সঙ্গে মিলিত হয় তবে তাকে বলে স্বপ্রজনিত। একই জাতের দুটি বিভিন্ন ফুলের গর্ভকেশরের ও পুংকেশরের মিলনকে বলা যায় শঙ্কর প্রজনিত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে আমাদের চারিপাশে যে ফুল ফোটে ও ফল পাকে তাদের অধিকাংশ সঙ্কর-প্রজনিত পন্থায় মিলিত হয়। এর ফলে এদের লম্বা বীজ হয়। তাড়াতাড়ি ফুল ফোটে এবং অধিক সংখ্যক বীজ পাওয়া যায়। এই মিশ্র পন্থা স্বপ্রজনিত পন্থার চেয়ে অনেক ভাল।

(১) বিভিন্ন ফুলে বিভিন্ন কেশর থাকে। যেমন একটি ফুলে কেবলমাত্র পুং কেশর অপরটিতে কেবলমাত্র স্ত্রী কেশর।

(২) একই জাতের হলেও এদের মিশ্রণে বাধা-নিষেধ অনেক। কারণ সব ফুলে বীজ হয় না।

নিয়মের রাজত্বে কোন নিয়মই বেনিয়মী হয়। কেবলমাত্র মানুষ সে নিয়ম আবিষ্কার করতে পারে নি। কোষের ক্রোমোজোমের এই জৈবিক মিলন সব ফুলের মধ্যস্থিত অন্য রেণুর সঙ্গে মিশে বীজের সৃষ্টি করতে পারে না। আবার দেখা যায় বিভিন্ন ফুলের মধ্যেও রেণুর মিশ্রণ হয় না। যেমন আলুর সঙ্গে কচুর, গোলাপের সঙ্গে গাঁদার।

মেণ্ডেল ছিলেন একজন অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক। তিনি এই মিশ্র বীজ তৈরী বিষয় নিয়ে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম তাঁর দৃষ্ট বিষয় প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন কেহই বড় একটা এ বিষয়ে লক্ষ্য করে নাই। ১৯০০ খৃঃ হল্যাণ্ডের ডি প্রাইস

ও জার্মানীর করেণ এ বিষযে ঐ একই মতবাদ প্রকাশ করেন। তখন সকলের দৃষ্টি এ বিষযে আকৃষ্ট হয। মেণ্ডেল-এর নামানুসারে একে বলে মেণ্ডেল বংশধারার সূত্র বা "মেণ্ডেল সূত্র"।

মেণ্ডেল বাগানের মটর নিযে পরীক্ষা করেন—একই বিভিন্ন জাতের মিশ্রণে সঙ্কর জাতের মটর বীজ তৈরী করেন যাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ মিল আছে। তিনি নানাভাবে ও নানাবিধ বীজের মধ্যে সঙ্কর-প্রজনন পন্থা চালান। তিনি ফুলকে বীজ ও কোঁকডান বীজেব ফুলেব মধ্যে সঙ্কর-প্রজনন প্রথায নিম্নলিখিত বিশেষ ধ্বণেব বীজ উৎপাদন কবেন।

পৈতৃক গুণাবলী সন্তানেব দেহেতে পরিপূর্ণমাত্রায থাকলে তাকে বলা যায 'প্রধান'। আর প্রকটিত না হলে তাকে বলা যায 'লুপ্ত'। আব তিনি লক্ষ্য করেন লুপ্ত সংখ্যার থেকে প্রধান এব সংখ্যা তিনগুণ বেশী।

পিতা মাতা
গো কেকো
গক
৪টি গোলাকারের (প্রধান) ব১
১৬টি বীজ
১২ গ (প্রধান) ৪ক (লুপ্ত) ব২
৪ গ বিশুদ্ধ ৮ (অবিশুদ্ধ) শক ৪টি বিশুদ্ধ ক
১৬ ক
১৬ (গ) ২৪ গ ৮ ক
সবই বিশুদ্ধ ৬ (গ) ৮ বিশুদ্ধ ১৬ অবিশুদ্ধ সব বিশুদ্ধ সবই বিশুদ্ধ, ক

তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি একই কোষের মধ্যে সম্মিলিত হয় না। মাঠে উচ্চ সঙ্কর প্রথায় যে ধান উৎপাদন হয় তার এক একটির মধ্যে এক একটি গুণের বা বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়। এর থেকে মনে করলে অন্যায় হবে না যে এক একটি গ্যামিটে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যেটা সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়। এর থেকে মটর গাছের উচ্চতা ও বীজের আকার পরিবর্তিত হবে এবং হয়েছে। তিনি আরও সিদ্ধান্তে আসেন যে—এই গোলাকার ও কোঁকড়ানো বীজের একটি হবে গোলাকার বা ২টি হবে মিশ্র গক বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ আর একটি ক। তিনি আরও স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে গোলাকার বীজের স্ত্রী ও পুং গোলাকার বৈশিষ্ট্য কোষ—কোঁকড়ানো বীজের কোঁকড়ানো বৈশিষ্ট্যের সমান সংখ্যক কোষ বহন করে।

উচ্চ সঙ্কর প্রথায় একটি গোলাকার ও একটি কোঁকড়ানো বীজের ফুলের মিশ্রণে

পুংগ্যামিট	স্ত্রীগ্যামিট	
গো	গো	১ গগ
	=	১ গক
		১ কগ
		১ কক
কো	কো	

প্রতি পুংগ্যামিট গো অর্থাৎ গোলকত্ব বিশিষ্ট অন্য কোন স্ত্রীগ্যামিট গোলাকার বা কোঁকড়ানো মিশতে পারে। একটি গ্যামিট একটি গো স্ত্রী-গ্যামিট এর সঙ্গে মিশলে তবে একটা গোলাকার বীজ পাওয়া যাবে এবং সেটা হবে বিশুদ্ধ বীজ। যেহেতু গোল আকার প্রধান সেজন্য গক বীজও গোল আকার নেবে।

দুটি বিভিন্ন কোষ থেকে যে প্রাণী বা গাছ উৎপন্ন হয় তাকে বলে জাইগোট। মেণ্ডেল লম্বা ও ছোট জাতের গাছের মধ্যে মিশ্রণ করেন, তার ফলে যে বীজ তৈরী হয় তাকে তিনি নাম দেন ব১। এতে লম্বা ও

ছোটর অনুপাত থাকে ৩ : ১। পরে তিনি এদের বিভিন্ন বীজের মধ্যে মিশ্রণ করেন ; এখানে যে সমস্ত লম্বা ও বেঁটে অর্থাৎ ছোট গাছে বিভক্ত হয় তিনি তাদের নামকরণ করেন ব^{২}।

মেণ্ডেল হলদে মটর বীজ ও সবুজ মটর বীজের মধ্যে মিশ্রণ করেন। এখানে হলদে রঙটা প্রধান আর যে কযটি বীজ পাওযা যায সেগুলির মধ্যে তিনটি হলুদিয়া ও একটি সবুজ হয। কারণ এই জাতের মধ্যে মিশ্রণ করে ঠিক সেই আকারের ফল পাওযা যাবে না। এখানে দুটি বিভিন্ন রঙ কাজ করছে।

সঙ্কর জাতির কৃত্রিম পদ্ধতি—কৃত্রিম প্রথায মিশ্র জাতের বীজ তৈরী করতে গেলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়—

(১) পাপড়ি বিকশিত হবার আগেই ফুল চযন করা উচিত।

(২) ফুলের পাপড়ি খুলে স্ট্যামেনটাকে বার করতে হবে। খুব সরু সর্ণা (forcep) দিযে কাজ করতে হবে। অনেক সময় ক্যালিক্স (বৃতি), করোলা, এবং স্ট্যামেন সরু কাঁচি দিযে কেটে ফেলতে হয। কিন্তু সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয় যেন গর্ভকেশরের স্ট্যামেন ও স্টিগমা নষ্ট না হয। তারপর এটাকে কাগজের ঠোঙ্গা দিযে ঢেকে দিতে হয যেন বাতাস বা পতঙ্গ এর সঙ্গে এসে না মিশতে পারে। এখন স্টিগমাকে ২।৩ দিন বাড়তে দিতে হবে। যখন স্টিগমা ঠিক হয়ে যাবে তখন পাকা স্টিগমা সরিযে নিয়ে এনথার থেকে রেণু নখের আগায় নিযে খুব সতর্কতার সঙ্গে—স্টিগমাতে দিতে হবে। এই প্রকারে বীজ তৈরী করতে হলে আবার কাগজের ঠোঙ্গা করে একে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে যতদিন বীজ না ধরে। তারপর পরিপূর্ণ হলে তবে বীজ পাড়তে হয়।

রোগ প্রতিকারের সাধারণ নিয়ম—

(১) বীজ মাঠে ছডাবার আগে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের সহিত মিশিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক সময় বীজবাহী রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায।

(২) যে গাছে রোগ দেখা যায় তাকে মাঠ থেকে তুলে দূরে সরিয়ে দিতে হবে।

(৩) উচ্চ সঙ্কর গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হবে যাদের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বেশী।

(৪) মাঠে যেন কোন কীট-পতঙ্গের সমাবেশ না হয়। এর ফলে মাঠে রোগের প্রকোপ কম হবে। বিশেষতঃ ভাইরাস রোগ বাইরে থেকে আক্রমণ কবতে পারবে না।

দুরকমের রোগ দেখা যায়—বীজবাহী ও মৃত্তিকাবাহী। পরিশোধন ঘরে বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে বীজবাহী ফাঙ্গাস নষ্ট করে ভাল ফল পাওযা গেছে। গমের বণ্টে রোগ (telletiox carcs), বার্লির স্মাট রোগ (Ustilago Hordei) কিম্বা পাতাব দাগ (Pyrenemphora graminea)। এ ভিন্ন যত রকমের বীজবাহী বোগ আছে যদি বীজ মাঠে ছড়াবার আগে পবিশোধন কক্ষে এগ্রোসান জি. এন.-এব সঙ্গে মিশিযে নেওযা যায তবে ভাল ফল পাওযা যাবে। মাটিতে যে পরভোজী থাকে তারা সাধারণতঃ ৬ মাস থেকে ২ বৎসর বাঁচে। অনেক সময যদি সম্ভব হয তবে জমি ফেলে রাখতে হয নতুবা অন্য কোন জাতের ফসল করলে রোগ সেখানকার গাছকে আক্রমণ করতে পারবে না; ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। এভিন্ন উত্তাপ দিযে রোগের বীজাণু নষ্ট কবা হয।

যে সমস্ত বীজাণু বাতাসের দ্বারা চালিত হয় তাদেরকে মাটি বা বীজের মত রক্ষা করা যায না। সেজন্য পরিশোধন দ্রব্য গাছের উপর ছড়ান প্রয়োজন হয়।

ফাঙ্গাস জাতীয—

(১) ফাইলো মাইসেটিস্, (২) এস্কো মাইসেটিস, (৩) বেসিডিও মাইসেটিস্, (৪) ডিউটেরো মাইসেটিস্।

১। ফাইলো মাইসেটিস্—সাধারণতঃ ক্রুসিফেরা জাতীয় গাছের এই রোগ

হয়। যে মাটিতে চুণ কম সেখানে এই রোগের প্রকোপ বেশী। এবড়ো-খেবড়ো আকারে খানিকটা ফুলে উঠে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া কষ্টকর।

২। এস্কো মাইসেটিস্—যেখানে আক্রমণ করে সেখানে বেশ খানিকটা ফুলে উঠে আর তার মধ্যে বহু স্পোর দেখা যায়। এর মধ্যে গমের পচা রোগ প্রধান। এর প্রভাবে গাছগুলো পড়ে যায়।

৩। বর্লির পাতায় দাগ রোগ—পাতার উপর লম্বা দাগ ফুটে উঠে। প্রথমে উপর পাতায় তারপর ক্রমশ নীচের পাতা আক্রান্ত হয়। জৈব পারদ-মিশ্র দ্রব্যের প্রভাবে এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ঔষধটা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়।

৪। বেসিডিও মাইসেটিস—যেমন ছত্রাক ইত্যাদি।—বাষ্ট রোগ এদের মধ্যে প্রধান। গমের মধ্যে কালো বাষ্ট বেশী দেখা যায়। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

দুইটি বিভিন্ন জাতের মধ্যে যদি বীজ প্রজনিত হয়, তাকে বলে মিশ্র সঙ্কর (hybrid)। প্রাণীজগতের সন্তান-সন্ততি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সন্তানের মধ্যে মাতা ও পিতা উভয়ের গুণ বর্তিত হয়েছে। একে মেণ্ডেল বলেন মিশ্র সন্তান (blended inheritence)। পিতা ও মাতার মধ্যে যে সমস্ত বিপরীত গুণ থাকে তার মধ্যে কতকগুলি সন্তান-সন্ততিতে বর্ধিত হয়। অপরগুলির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মেণ্ডেল বলেন এগুলি প্রাধান্য পেয়েছে অন্যগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

মেণ্ডেল বংশপরম্পরাকে এইভাবে ভাগ করেন। প্রথমে যখন কোন সঙ্কর জাতের সৃষ্টি হয় তখন তার নাম দেওয়া হয় ব১। এদের মধ্যে কোন লুপ্ত চিহ্ন দেখা যায় না। এদের সন্তানের মধ্যে ব্যক্ত (dominant) বা লুপ্ত (recessive or latent) প্রকট হয়ে পড়ে। বি২-তে দেখা যায় যারা ছিল লুপ্ত তারা ব্যক্ত হয়েছে। এই বংশের ৪টি সন্তানের মধ্যে তিনটি ব্যক্ত আর অপরটি লুপ্ত বা (recessive) প্রাধান্য পেয়েছে।

বীজের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী লুপ্ত থাকে যেমন ফুলের রঙ, কোঁকড়ানো বীজ, বেঁটে কাণ্ড, প্রভৃতি যে সমস্ত গুণাবলী প্রপিতামহের মধ্যে ছিল সেগুলি বংশ পরম্পরায় ব১ ব২ ব-এ এসে প্রকাশ পায়।

একটি লম্বা ও একটি বেঁটে গাছের মিলনে যে গাছ পাওয়া যায় তারা সবাই লম্বা হবে। কিন্তু এদের সন্ততি হবে তিনটি লম্বা ও একটি বেঁটে।

এর পরবর্তী বংশে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়। যে ছিল ছোট সে বংশ পরম্পরায় ছোট হয়ে যাবে অন্য যে তিনটি লম্বা গাছ ছিল তাদের সন্ততি কিন্তু সব একরকম হবে না। এদের সন্ততিদের মধ্যে ⅓ হবে লম্বা এবং এদের বংশ পরম্পরায় সন্তান-সন্ততি কেবলই লম্বা হবে। আর বাকি ২টি মেণ্ডেল সূত্র অনুসারে তিনটি লম্বা ও একটি বেঁটে সন্ততি দেবে।

এই যে পরিবর্তন এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বীজে গ্যামটের অবস্থানের উপর।

বহুদিন মেণ্ডেল সূত্র নিয়ে অনেকে মাথা ঘামাচ্ছে। কারণ সেই সময় পৃথিবীতে ডারউইনের সূত্র ছিল প্রধান। ডারউইনের সূত্রের সঙ্গে মেণ্ডেলের একটু অমিল ছিল। ফলে দুটি বিভিন্ন ভাগ গড়ে উঠে ছিল কিন্তু মেণ্ডেলের মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত সবাই চুপচাপ ছিল। শেষে মৃত্যুর ৩৫ বৎসর পর প্রাইস কোরেন্স ও চাবমাক পৃথক পৃথক ভাবে মেণ্ডেলসূত্র প্রমাণ করেন ও সমর্থন করেন। সেই থেকে বৈজ্ঞানীকদের কাছে বংশ ধারার (heredity) মেণ্ডেল সূত্র একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় অধ্যায়

গাছের রোগ ও তার প্রতিকার

(The diseases of trees & their prevention and control)

সবুজ সতেজ গাছ আর রোগী-গাছের মধ্যে যে সীমারেখা আছে তাকে সহজেই চেনা যায। তবে ফসলোৎপাদন দেখে ঠিক করা হয গাছের কি অবস্থা। কিন্তু ফসলোৎপাদন তো কেবলমাত্র নীরোগ গাছের উপর নির্ভর করে না। উপযুক্ত পরিমাণ ফসল নির্ভর কবে মাটির উপর। মাটির উর্বরতা, অম্লতা বা অত্যধিক জলনিকাশ, গাছের খাদ্যেব অভাব উপযুক্ত বৃষ্টিপাত বা জল সরবরাহ। এব প্রত্যেকটি গাছ, বৃদ্ধিব অনুকূল হলে গাছ বেড়ে উঠবে। এর পরে গাছের ক্ষতি কবে কীটপতঙ্গ এবং সবাব উপব নানাবিধ বোগ।

গাছেব বোগেব প্রধান কাবণ—(১) ফাঙ্গাস জাতীয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু ও (২) ভাইরাস বীজাণুর প্রকোপ।

ফাঙ্গাস—সবুজ কণাবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক রকমের গাছ। খালি চোখে এদের দেখা যায না ফলে, তাদেব নিজেদেব জন্য তাবা খাদ্য তৈরী করতে পাবে না। সুতবাং তাদেব বেঁচে থাকতে গেলে খাদ্যেব দরকার। এই খাদ্য সংগ্রহ করে অন্য কোন গাছের কাছ থেকে কিংবা কোন মৃত পদার্থ থেকে। ফাঙ্গাস দুরকমের (১) পরভোজী, অন্য কোন গাছে যারা আশ্রয নেয। (২) স্যাপ্রোফাইট, যারা মৃত গাছের টিস্যু খেযে বাঁচে। অবশ্য এই যে ভাগ এটা সব সময ঠিক হয় না।

এই যে ফাঙ্গাস বীজাণু এর চাষ কৃষকের কাছে অতি প্রযোজনীয়। এরা যেমন রোগ হযে গাছকে আক্রমণ করে আবার তেমনি যে সমস্ত খাদ্য অগ্রবর্তী চাষ ও অন্যান্য কারণে আটকে থাকে তাদেবকে মাটিতে মিশে যেতে সাহায্য করে। এদের প্রভাবে কাঠ, লতা পাতা শীঘ্র পচে যায় এবং মাটিকে উর্বরা করে।

মাইসেলিয়াম—ইহা আকারে খুব ছোট। পাতলা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এদের হাইফা থাকে। আকারে এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। স্পোর প্রভাবে এরা বংশবৃদ্ধি করে। বাতাসের প্রভাবে এই স্পোরগুলি ছড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টির সময় ভিন্ন বাতাসে স্পোর কম থাকে। এ ভিন্ন অনেক স্পোর আছে যারা শস্যের বীজ আঁকড়ে থাকে। এর প্রভাবে বীজবাহী রোগের প্রকোপ বাড়ে। বৃষ্টির প্রভাবেও অনেক সময় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

আক্রমণ পদ্ধতি—এদের মধ্যে কতকগুলি স্পোর আছে যারা অঙ্কুরোদ্গমের সময় চারাকে আক্রমণ করে। একবার যদি গাছ চারা অবস্থা পেরিয়ে আসতে পারে তবে পরে আর এই ধরণের কোন আক্রমণ সহজে হয় না। সাধারণতঃ স্পোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় শাখার উপর কিংবা কাণ্ডে ও অন্য কোন সবুজ অংশে। যেমন ফাঙ্গাস সূতার সৃষ্টি হয় এবং সেই সূতা-রক্ষী কোষ (guard cell)কে আক্রমণ করে। সরল, সতেজ গাছকে ফাঙ্গাস আক্রমণ করতে পারে না। তখন এরা কোন ঘা খুঁজে ফেরে এবং সেখানে আক্রমণ করে গাছের দেহে ঢুকে পড়ে। একবার ঠাঁই করে নিতে পারলে তাদের বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব নয়।

প্রথম আক্রমণে গাছের দেহে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তাতে অনেক সময় গাছের গা ফুলে উঠতে পারে আর এই জায়গায় এই ফাঙ্গাস জাতীয় গাছ বৃদ্ধি পায়। আলোর তিল রোগ, ওলকপির সমষ্টি রোগ (club) প্রধান।

ফাঙ্গাস এক জাতীয় গাছকে আক্রমণ করতে পারে কিংবা ঐধরণের গাছকে আক্রমণ করে। এদের মধ্যে যে সমস্ত গম বা ঘাস জাতীয় গাছে রাষ্ট রোগ বৃদ্ধি করে তারা কেবলমাত্র এই জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে সকর্মক থাকে। গাছ বিভক্তি-করণের বিশেষ অর্ডারে যে সমস্ত গাছ আছে কেবল তাদেরকে আক্রমণ করে।

ধানঃ ধূসর দাগ (Brown Spot)—এটা কেবলমাত্র বাংলা, আসাম ও বিহারের ধানের একমাত্র রোগ নয়, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এর কবলে। এমন কি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

১৯০১ খৃঃ জাভাতে এই রোগ প্রথমে দেখা যায়। পরীক্ষকের নাম ছিল ব্রেডা-গু হান্। ১৯২৩ খৃঃ সঙ্গরমন প্রথমে মাদ্রাজে এই রোগ লক্ষ্য করেন। ১৯২৭ খৃঃ উপ্পল বোম্বাই প্রদেশে এই রোগ লক্ষ্য করেন। ১৯৩১ খৃঃ মিত্র ভারতের সর্বত্র এই রোগ লক্ষ্য করেন।

ধান গাছের যে কোন অবস্থায় এই বোগ আক্রমণ করতে পারে। যখন শিশু অবস্থায় আক্রমণ করে তখন বলা হয় সিডলিং ব্লাইট। চারা গাছ মাত্র এক ইঞ্চি হতে না হতে এই বোগ আক্রমণ করতে পারে। বীজপত্র ধূসর হয়ে যায়। তখন পাতায় যে হাইপোকটিল থাকে তাকে আক্রগণ করে। প্রথম পত্রে দাগ পড়ে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়। বাংলাদেশে অবশ্য সিডলিং ব্লাইট কম। কাবণ যদিও কেউ আক্রান্ত হয় তা হলেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ একটি স্থানে ৩।৪টা শিশু গাছ পোতা হয়। তার ২টা পর্যন্ত মরে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বোরো ধানে এই সিডলিং ব্লাইট বেশী দেখা যায় কাবণ সেই সময়ে উত্তাপ কম থাকে ফলে সিডলিং ব্লাইট রোগ প্রকট হয়ে পড়ে যদি আবহাওয়ার উত্তাপ কমে যায়।

খারিপ ধানে এই রোগ খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেহেতু ধানের চারা এক জায়গা থেকে তুলে অন্য জায়গায় পোঁতা হয় সেইহেতু পাতায় রোগ খুব বেশী হয়। এই ফাঙ্গাস্ জাতীয় রোগ এক গাছের কোষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে কিংবা অন্য কোন গাছের কোষকে আক্রমণ করতে পারে।

পাতায় ধূসর তামাটে ছিদ্র দাগ বাড়তে থাকে। প্রথমে খুব সরু পিনের আগার মত জায়গা নিয়ে বাড়ে তাবপর ধীরে ধীবে অন্য আকার নিতে থাকে। মাঝখানটা ধূসর রঙ ধারণ করে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত পাতাটা ধূসর তামাটে আকার গ্রহণ করে। পরে সমস্ত পাতাটাই পড়ে যায়।

যদি পাতায় এই দাগ খুব বেশী বৃদ্ধি পায় তবে গাছে ফুল

ধরে না। আস্তে আস্তে শস্যও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যদি ফল ধরবার পর আক্রান্ত হয় তবে শস্যে ফল আসে না। শস্যের গায়েও দাগ হতে পারে। ১৯৫২ সালে মেদিনীপুর জেলায় ধান গাছে ভীষণ রকম এই রোগ দেখা দেয়। ফলে সমস্ত শস্যেও এই রোগ জন্মে ও অখাদ্যে পরিণত হয়।

পাতার উপরে যে দাগ দেখা যায় সেগুলি মাঝখানে একটু চওড়া ও দুই আগা খুব সরু হয়। এদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় অবিরত বৃষ্টি, দিনগুলি থাকবে মেঘে ঢাকা, ফলে বাতাসে থাকে প্রচুর জলকণা। মাঠে কম পরিমাণে সার দিলে অনেকে মারা যেতে পারে।

এটা একটি বীজবাহী রোগ। সুতরাং বীজ ছড়াবার আগে বীজটি ভাল করে দেখা উচিত। সম্ভব হলে রোগদুষ্ট বীজ না ছড়ানোই ভাল। অবশ্য রোগ চিনতে পারলে ফসল তুলে নেওয়ার পর যে সমস্ত গোড়াগুলি ক্ষেতে রয়ে যায় তারা অনেক সময় এই রোগ ছড়াতে পারে।

প্রতিষেধক—যেহেতু এটি বীজবাহী রোগ এবং বীজের উপর লক্ষ্য রেখে এই রোগ ধরা না গেলে গরম জলে বীজগুলি ফেলে দিলে ধরা যাবে। এই রোগ শস্যের ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকে আক্রমণ করে। সেজন্য এগ্রোসান G.N. দিয়ে মিশিয়ে পরিশোধন করে নিতে পারলে ভাল হয়। মিশাবার নিয়ম ১ : ৩০০ অংশ বীজ অথবা ২ ছটাক বা ৪ আউন্স ঔষধ ১ মণ বীজের সঙ্গে মিশাতে হবে। বড় একটি ড্রামের মধ্যে জল ও ঔষধ মিশাতে হয় এর পরে ঐ ঔষধ মিশ্রিত জলে বীজ ঢেলে দিতে হয়। কিছু সময় যাতে ঐ জল বীজের মধ্যে যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আমন ধানের মধ্যে—ভাসামানিক, কলমা, বাদ, কলমসালি, ঘুরশাল, রূপসাল, ঝিঙ্গাশাল, লাঠিশাল, দাদখানি ; রাধুনী পাগল, বাদশাভোগ আর আউশধানের মধ্যে—কালো, ঝাঝি, আকাকাটা, সূতিকা প্রভৃতি জাতের বীজকে এই রোগ তাড়াতাড়ি আক্রমণ করতে পারে না।

পাটের কাণ্ড পচা রোগ—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম-এর পাটের প্রধান রোগ তাদের ডাঁটা পচে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কেবলমাত্র পাটের পরিমাণ কমেই যায় না পাট নিকৃষ্ট ধরণেরও হয়ে যায়। গাছের যে কোন সময় এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। প্রথমে পাট খুব ঘন করে ছড়ান হয় যেন তার ডালপালা না বার হতে পারে। লম্বা হবার আগেই ওর আঁশগুলোকে ভাল করে নেওয়া উচিত। কিন্তু যদি দুই চারার মধ্যে বেশী জায়গা থাকে তবে কাণ্ড অসমান হয় এবং আঁশ অতি সহজে কেটে যাবে। অন্তর্বর্তী বেশী স্থান থাকলে গাছের ডালপালা বার হবে।

চারা গাছের হাইপোকটিল-এর উপর প্রথম লক্ষণ ফুটে উঠে। যদি আবহাওয়ায় প্রচুর জলকণা থাকে তবে ড্যাম্পের প্রভাবে খুব অসুবিধা হবে। কিন্তু গাছ বড় হলে গাছের মাঝখানটা পচে যাবে তারপর ধীরে ধীরে গাছটা মরে যাবে। গাছের গায় লেসিয়ন দেখা যায়—নীচে কালচে তামাটে দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে এই দাগ বাড়তে থাকে। পরে ডাঁটার চারিদিকে ঘিরে ফেলে। শিকড়ে এরা আক্রমণ করে না। যখন রোগ খুব বেশী প্রকট হয় তখন বীজগুলিকে আক্রমণ করে।

এই রোগের দুটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় এই রোগ বহু শিশুগাছকে মেরে ফেলে। দ্বিতীয় অবস্থা সুরু হয় গাছ বড় হলে। তখন অবশ্য গাছকে মেরে ফেলতে পারে না, কিন্তু আঁশ অতি নিকৃষ্ট ধরণের হয়।

এই রোগ মৃত্তিকা ও বীজ উভয়বাহী, কিন্তু বীজ থেকে প্রথমে সুরু হয়। বাইরের থেকে রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে কিছু করা যায় না। একমাত্র উপায় যে বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে সে বীজ যে অঞ্চল থেকে আসছে সেখানে এই রোগ ছিল কিনা যদি জানা যায় তবেই ভাল। অনেক জাতের বীজ আছে যাদেরকে এরা আক্রমণ করে, কিছু করতে পারে না। শস্যপর্যায় অবলম্বন করে অনেক সময় ভাল কাজ হয়।

আখের পাতায় লাল-দাগ রোগ

(Colletotrichum falcatum)

আখের এই রোগ কেবলমাত্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে নয়। পৃথিবীর যে অঞ্চলে আখ জন্মায় সেই অঞ্চলে আখের গাছে এই রোগ দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে এত অধিক পরিমাণে এই রোগ আরম্ভ হয়েছিল যার ফলে এই অঞ্চলের আখের চাষ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

মাটির উপর আখের গাছের যে কোন অংশে এই রোগ জন্মাতে পারে বিশেষতঃ আখ গাছের কাণ্ডে ও পাতার মধ্যশিরায়। কাণ্ডে এই রোগ দেহের মধ্যে থাকে কিন্তু পাতায় এই রোগ থাকে বাইরে। সুতরাং বাইরে থেকে দেখে অনেক সময় কিছু বোঝা যায় না। যখন ভিতরে সমস্ত কাণ্ডটা পচে যায় তখন গায়ের রং ফিকে হয়ে আসে ও গাঁইট পচে যায়। তখন উপরের পাতা রং হারিয়ে ফেলে ও পাতা পড়ে যায়। পাতার আগার অংশ শুকিয়ে যায় এবং ধার দিয়ে দিয়ে এগুতে থাকে কিন্তু পাতার মাঝখানটা সবুজ রয়ে যায়। যখন এই রোগ মড়কের আকার নেয় তখন সারা ক্ষেতে আখ গাছ শুকিয়ে পড়ে যায়।

যদি এই রোগে আক্রান্ত আখ গাছকে দুই ভাগ করে ফেলা যায় তবে দেখা যাবে যে সমস্ত গাঁইটের মধ্যবর্তী স্থানের টিস্যু সাদা ও হলদেটে হয়ে গেছে। কিন্তু রোগের প্রকোপে গাঁইটের ধারে লম্বালম্বিভাবে লাল হয়ে গেছে। ভাসকুলার বাণ্ডেল খুব বেশী লাল হয়। মাঝে মাঝে এই লাল দাগ সাদা দাগের প্রভাবে বাড়তে পারে না। এইটাই হলো এই রোগে বহির্লক্ষণ। আখের কাণ্ডের গায়ে কোন আঘাত লাগলে লাল হয়ে উঠে। কিন্তু এই লক্ষণ দেখা যায় যেখানে আঘাত করা হয়েছে সেখানে। এই রোগে দুই গাঁইটের মধ্যবর্তী (পর্বমধ্য) বহু স্থান এই আকার ধারণ করে।

এই রোগে কেবলমাত্র ক্ষেতের উৎপাদন কমিয়ে দেয় না আখের মিষ্টত্বও

কমিয়ে দেয়। এমন কি শতকরা ৩৩ ভাগ উৎপাদন কমে যেতে পারে। মড়কের আকার নিলে সারা মাঠের ফসলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই রোগের বীজাণু মাটিতে খুব বেশী থাকে। যদি এই রোগাক্রান্ত গাছের ডালপালা ইত্যাদি মাটির তলায় যায় তবে এই রোগের বীজাণু ৬ মাস ঘুমন্ত থাকে সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে মাঠে অপর গাছ পেলে আক্রমণ করবে এটা স্বাভাবিক।

এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায়, (১) মাঠে শস্যপর্যায় (Rotation) প্রথায় ফসল করা। সুতরাং আখের পরে যখন অন্য ফসল করা হবে তখন সে আর সেখানকার গাছকে আক্রমণ করতে পারবে না। ফলে কিছুদিন পরে মারা যাবে। (২) অন্য কোন জায়গায় চারা উৎপন্ন করলে তারা সহজে রোগাক্রান্ত হবে না। সব থেকে ভাল হবে মাঠে যে আখের গাছের অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে সেগুলি মাঠ থেকে সরিয়ে কোন গর্তের মধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া। ফলে বীজাণু মাটিতে সজীব থাকবে না।

সব থেকে ভাল হয় যদি এই রোগসহ্যকারী (Resistant) কোন জাতের ফসল করা যায়। ভারতবর্ষে এর পরীক্ষা চলছে। পরভোজী জাতীয় বীজাণু সম্ভবতঃ থাকে না কিন্তু যেগুলি আখ উৎপাদন করতে গিয়ে প্রয়োজন হয় তাদের প্রকোপ খুব বেশী। এক জাতের আখ আছে যাদের ফিকে রঙের মাইসেলিয়াম থাকে। কতকগুলির আছে ঘন রঙের। এরা মনে হয় পরিমাণে প্রকট।

আলুর ব্লাইট রোগ

(Alternaria Solani—Phytophthora infestans)

আলুর এই রোগ সর্ব দেশে দেখা যায়। গাছ মাটির উপর ফুঁড়ে বার হওয়ার পর ৩ ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ আক্রমণ করে। এরও ৩।৪ সপ্তাহ পরে পরবর্তী ব্লাইট (Late Blight) আক্রমণ করে।

রোগের প্রথম লক্ষণ ফুটে উঠে ছোট, একমাত্র, মলিন তামাটে ছিদ্রের মাধ্যমে। তারপর ইতস্ততঃ পাতায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কখনও কখনও আকারে ছোট থাকে কখনও কখনও আকারে বড় হয়। শিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হযে থেমে যায়। রোগের প্রকোপ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গোলাকার ছিদ্র আকারে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম আকার নিতে থাকে আর মনে হয যে রোগাক্রান্ত স্থানে গোল চন্দ্রাকারে কয়েকটি উঁচু-নীচু স্তর রয়েছে। পাতার মৃত্যু হলে বা শুকিয়ে গেলে ঐ গোলাকার পদার্থের আকার আরও বেড়ে যায।

যে কোন অবস্থায আলুগাছ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ গাছের উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি (Vegetative growth) শেষ না হলে আক্রমণ করতে পারে না। যদি উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পায় তবে পাতায় একদিনে একের থেকে একশয়ে পরিণত হয়। এই ভাবে উপরের ২।১ পাতা ভিন্ন আর সব পাতা রোগগ্রস্ত হযে মরে যেতে থাকে। রোগের প্রকোপ আরও বেশী হলে গাছের কাণ্ড ও গাঁইটের পাব আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

জল, বায়ু ও মাটি এই রোগের বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যদি মাটিতে যথেষ্ট জল থাকে বা বৃষ্টি হয এবং তারপরই উত্তাপের পরিমাণ বাড়ে তবে রোগের প্রকোপ বাড়ে। যদি পর পর কয়েকদিন শুকনা থাকে তবে আক্রমণ বন্ধ হতে পারে। শস্যপর্যায (Rotation) অবলম্বন করা বিধেয। মরে যাওয়া গাছের ডাঁটা ও পাতা কুড়িয়ে নিয়ে গিযে পুড়িয়ে দেওয়া ভাল। বোর্দো মিকশ্চার সপ্তাহে একবার করে ছড়ালে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ধানের শত্রু কীট—

(১) **ধানের হিস্পা,** কলিওপটেরা বিভাগে, ক্রাইসোমেলিণ্ডা পরিবারের। ধানের চারা যখন ছোট থাকে তখনই এরা ধান গাছকে আক্রমণ করে। বড় পোকাগুলো ধানের পাতার সবুজ অংশগুলি খেয়ে ফেলে। ছোট সন্তান-সন্ততি (লার্ভা) পাতার নীচের ও উপরের আবরণ

(epidermis)-এ বেড়ে উঠে। ফলে পাতার গায় ছোট বা বড় নানা আকারের দাগের সৃষ্টি হয়।

জীবনপ্রথা—স্ত্রী হিস্পা ঐ পাতায় ডিম পাড়ে, ৩।৪ দিনের মধ্যে ডিম ভেঙ্গে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। সম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠার আগেই কীট পাতার সবুজ কণা খেতে সুরু করে দেয়। ৭।৮ দিনে এইভাবে সকর্মক জীবন সুরু হয়ে যাবার পরও লার্ভা পাতার মধ্যেই থেকে যায়। তারপর আরও ৪।৫ দিন পর যারা বড় হয়েছে তারা বেরিয়ে আসে ও পাতার উপর ঘর বাঁধে।

এদের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক কৃষক একে লক্ষ্মী পোকা বলেন। কারণ দেখা যায় যে বৎসর পোকায় ফসল নষ্ট করে তার পরের বৎসর প্রচুর ফসল হয় সেই ক্ষেতে।

প্রতিষেধক—(১) যাতকি জাল দিয়ে এদের সংগ্রহ করে মেরে পুড়িয়ে ফেলা।

(২) বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ৫ , একর প্রতি ৫।৬ পাঃ ছড়িয়ে দেওয়া।

(৩) গাছের পাতার আগাগুলো কেটে দেওয়া। কারণ হিস্পা সাধারণতঃ পাতার আগার দিকে আক্রমণ করে।

কাণ্ডভেদী (stem borer Schnaebius incertellus)—বাংলাদেশে ধানের ভীষণ ক্ষতিকারক।

বিভাগ—ল্যাপিডোপটেরা—পরিবার—পাইরালিডা।

যদি গাছের ছোটবেলায় বা যখন ভালভাবে না বেড়ে উঠেছে তখন যদি আক্রমণ করে তবে গাছ শুকিয়ে যায়। আর যদি পরবর্তী কালে অর্থাৎ গাছের ফুল ধরবার সময় আক্রমণ করে তবে ধানের শীষে ধানের আকার দেখা গেলেও ভিতরে কোন চাউল-কণা থাকে না। আর সমস্ত ধান সাদা হয়ে যায় ও নিজস্ব রঙ হারিয়ে ফেলে।

জীবনপ্রথা—মথ-এর রঙ ঈষৎ হলদে থেকে ধূসর। সামনের ডানা বা পায়ের কাছে দুটা কাল গোলাকার দাগ আছে, বিশেষতঃ স্ত্রী-পোকার। একটি স্ত্রী-পোকা একসঙ্গে ৬০-১০০ ডিম পাড়ে। গাছে পাতার ফলকে আগায় এবং তারপর এর উপর নিজের শরীর থেকে কিছু লালা জাতীয় পদার্থ বার করে ঢেকে দেয়। দেখা যায় যে একটি স্ত্রী-পোকা সারা জীবনে ২৫০০টির বেশী ডিম পাড়তে পারে, ৪।৫ দিনের মধ্যে ডিম ফেটে লার্ভা বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে গাছের ডাঁটার মধ্যে ঢুকে যায় এবং গাছের দেহে যে সমস্ত সরু আঁশ বা টিস্যু আছে সেগুলি খেতে থাকে। লার্ভাগুলি পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত হলে প্রায় ৩" লম্বা হয়। ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় আসে। জলবায়ুর উত্তাপ ও বাতাসে জলকণার অবস্থানুযায়ী ৭।৮ দিনের মধ্যে পিউপা থেকে বড় ও পূর্ণবয়স্ক কীট বেরিয়ে আসে। সাধারণতঃ এই অবস্থায় আসতে ৩২-৪১ দিন সময় লাগে। এ পর্যন্ত তিন রকমের ব্রুড দেখা গেছে। প্রথমটা দেখা যায় ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি মে থেকে জুলাই-এর মধ্যে। তৃতীয়টি আগষ্ট থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে।

প্রতিরক্ষা—

(১) ডিম পাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলি যদি নষ্ট করা হয় তবে খুব ভাল হয়।

(২) যে গাছগুলিকে আক্রমণ করেছে সেগুলি যদি তুলে ফেলে নষ্ট করে দেওয়া যায় তবে চলে।

(৩) ফসল উঠে গেলে মাটি ভাল করে লাঙ্গল দিতে হবে আর যে সমস্ত ফসলের গোড়া রয়ে গেছে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে, কারণ দেখা গেছে ফসল উঠে গেলেও ফসলের গোড়ায় লার্ভা বা পিউপা আকারে পোকার বংশধররা রয়ে গেছে।

(৪) ১০-২০টা পর্যন্ত কোন জাল দিয়ে ধরা যাবে।

(৫) ইদানীং জাপানে দেখা গেছে ফোলিওডল—E605 (ফসফরাস জাতীয় বিষাক্ত দ্রব্য) দিয়ে এই শত্রুকে নিপাত করা যায়।

দলবদ্ধ শুঁয়াপোকা (Swarming Caterpillar)—দলবেঁধে এরা আসে বলে এই পোকাকে অনেক সময় পোকার সৈন্যদল বলা হয়। যখন এরা মাঠে নামে তখন মাঠে কোন সবুজের চিহ্ন রাখে না। এমন কি ঘাস পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। মেদিনীপুরে দাঁতন থানা এলাকায়, রামচন্দ্রপুর ও জলপাইগুড়ি এলাকায় কয়েক বৎসর আগে এরা আক্রমণ করেছিল। কুচবিহার এলাকায় দেখা যায় বার বার দুই বৎসর এরা আক্রমণ চালায়। কখন কোথা থেকে আক্রমণ চালাবে জানা যায় না।

লক্ষণ—ধান গাছের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। শুধু যেখানে আক্রমণ করে সেখানে নয় নিকটবর্তী কোথাও সবুজ গাছ বা ঘাস থাকলে সেটাও শেষ করে দেয়।

জীবনপ্রথা—স্ত্রী-পোকা এক সঙ্গে ২০০/৩০০ ডিম পাড়ে পাতার উপরে। ডিম পেড়ে সেগুলি ধূসর রঙের খোলা দিয়ে ঢেকে রাখে। দেখা যায় একটি স্ত্রী-পোকা সারা জীবনে ৩০০টি ডিম পাড়তে পারে। অবশ্য সব ডিম একসঙ্গে পাড়ে না। ৪।৫ দিনের মধ্যে বাতাসের উত্তাপ ও জলকণার উপর নির্ভর করে ডিম থেকে লার্ভা বেরিয়ে আসে। যখন তারা পূর্ণ বয়স-প্রাপ্ত হয় তখন প্রায় ৩" লম্বা হয়। লার্ভাগুলি হয় সাধারণতঃ ঈষৎ সবুজ এবং গায়ে নানারঙের দাগ থাকে। ২১-৩২ দিনের মধ্যে লার্ভা পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত হয় এবং মাটির নীচে গিয়ে পিউপা তৈরী হয়। পিউপা থেকে ৫।১০ দিনের মধ্যে পোকা বেরিয়ে আসে।

আক্রমণ—এপ্রিল মাসে এদের আক্রমণ সুরু হয় ও জুন মাসের পর শেষ হয়। কিন্তু পরে আবার সুরু হয় জুন মাসে। অবাধে শস্য নষ্ট চলে অক্টোবর পর্যন্ত। একমাত্র প্রতিষেধক (১) ক্ষেতের কাছে কিছু ডাল রেখে দেওয়া, পোকা লক্ষ্য করে পাখী আসবে এবং ঐ ডালে বসে পোকা

লক্ষ্য করবে। (২) বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ১০% ছড়িয়ে দিতে হয় একরে ২৫–৩০ পা:।

এ ভিন্ন বাংলাদেশের আরও শত্রু আছে তার মধ্যে প্রধান—

(১) রাইস বাগ, (২) ধানের ফড়িং, (৩) শীষকাটা লেদা পোকা, (৪) ভেঁপু পোকা ও (৫) মিলিকুসী।

আখ (Sugarcane)—প্রতি বৎসর আখে পোকা লেগে বহু ক্ষতি করে। নানা রকমের পোকা আছে যারা আখের কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে রস খেয়ে নেয় বা আখের চিনি জাতীয় পদার্থ কম করে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত আখ তৈরী হয় সেই সমস্ত অঞ্চল থেকে খবর সংগ্রহ করে জানা গেছে যে কাণ্ডভেদী (stem borer) সব থেকে বেশী ক্ষতিকারক। এই কাণ্ডভেদী ও অগ্রভেদী (top borer) একত্রে বা একাকী আখের ক্ষেত আক্রমণ করে এবং ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। প্রধান শত্রুগুলির সম্বন্ধে নিম্নে বলা গেল।

(১) শিকড়ভেদী (Root borer), (২) কাণ্ডভেদী (Stem borer) ও (৩) অগ্রভেদী (Top borer) ইত্যাদি।

কাণ্ডভেদী (Stem borer : Argyria tumidicostalis)—বাংলাদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আখ চাষ অঞ্চল থেকে খবর সংগ্রহ করে জানা গেছে যে অন্ততঃ ৬টি বিভিন্ন জাতের কাণ্ডভেদী আখের ক্ষতি করছে। এদের মধ্যে এগিরিয়া সিটকটি স্কার্ডপিসা অনেকটা সাধারণ অর্থাৎ এই পোকা প্রায় সর্বত্রই আখের ক্ষেতে দেখা যায়। অন্য জাতের মধ্যে আরগিরিয়া টিউমিডিকসট্যালিস উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে প্রতি বৎসর ভীষণ ক্ষতি করে চলেছে। বলা যেতে পারে যে এই দণ্ডভোজী, দণ্ডভেদীর জীবনপ্রথা অনেকটা স্ট্রিকটিব্রাসপিস্-এর মত। কারণ এদের মত দণ্ডভেদী শত্রুকে আমরা দূর করতে পারি।

জীবনপ্রথা—স্ট্রিকটিব্রাসপিস্ মথ ঈষৎ ধুসর রঙের হয়ে থাকে। এরা আখের পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং নীচের দিককার অংশে থাকে।

দিনের বেলায় মথ লুকিয়ে থাকে। দিনের বেলা অকর্মক থাকে রাত্রিবেলায় সক্রিয় হয়ে উঠে। আখের পাতার নীচের দিকে যেখান দিয়ে প্রধান শিরা চলে গেছে তার পাশে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি লাইন দিয়ে সাজানো থাকে। ছোট ছোট ডিমগুলি হাঁসের ডিমের মত আকৃতি, দেখতে লম্বা এবং রং ফিকে অনেকটা সাদাটে। এই ডিম থেকে যে ছোট লার্ভা বেরিয়ে আসে তারা দল ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে বার হবার আগে অন্য কয়েকটির সঙ্গে মিশে বড় হয়। প্রথম খেতে শিখে পাতা খেতে সুরু করে তারপর কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। কাণ্ডের মধ্যে নরম অংশ দিয়ে পোকা আখের কাণ্ডের মধ্যে ঢোকে। আখের শিশুকালে আক্রমণ করলে বোঝা যায় যে প্রধান পাতা অর্থাৎ আগার পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। যে গাছ বেশ ভালভাবে বেড়ে উঠেছে সে গাছে কয়েকটা ছিদ্র দেখা যায়। দেখা যায় এই ছিদ্র দিয়ে পোকার দেহের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে আসছে। পর পর কয়েকটা গাঁইট-এর দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে দেখা যায়। যখন এদের আক্রমণ খুব প্রকট হয় তখন সারা গাছটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। লার্ভা প্রায় ২৫ মি.মি পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা খুব খেতে পারে এবং খায়ও বেশী। এর ফলে কৃষকের ভীষণ ক্ষতি হয়।

প্রতিরোধ পন্থা—(১) বীজ বা আখের গাঁইট, যেখান থেকে নতুন চারা বেরিয়ে আসবে সেগুলি ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে যেন এদের মধ্যে কোন রকম পোকা না থাকে।

(২) হালকা জাল পাতার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে বীজ নষ্ট হয়ে যাবে কিংবা মথগুলি ধ্বংস হবে।

(৩) ক্ষেতে কাণ্ডভোজীর ডিম দেখা গেলে পরভোজী ট্রিকোগ্যানিনা ঐ ক্ষেতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

(৪) যখন গাছ ছোট থাকে তখন গাছের সারির মাঝখানে কোদাল দিয়ে একটু কুপিয়ে দিলে চলে।

পত্রভোজী (Top shoot borer : Pyrilla perpusilla)—এগুলি আখের পরম শত্রু, কারণ শিশু অবস্থা থেকে বড় অবস্থা পর্যন্ত সকল সময় এই পোকা গাছের ক্ষতি করে, ক্ষতি সুরু হয় ৩য় ও ৪র্থ পাতা থেকে সেখানে এরা এসে বাসা বাঁধে। একটু লক্ষ্য করলে জানা যায় ঐ ৩য় ও ৪র্থ পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবে পাতায় ছিদ্র করাই হলো ওদের বৈশিষ্ট্য। সাদা রূপালী চকচকে ডানা নিয়ে মথগুলিকে আখের ক্ষেতের পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। স্ত্রী-পোকা এক সময়ে বহুসংখ্যক ডিম পাড়ে। শ্রেণীবদ্ধভাবে পাতার পাশে এরা এক রকম হলদে লোম দিয়ে ডিমগুলিকে ঢেকে রাখে। এই শস্য রঙের ডিমগুলি সহজে পাতার আড়ালে বাড়তে থাকে, ডিম থেকে পোকা বার হয়ে এসে কচি পাতায় বাসা বাঁধে। সব থেকে উপরের গাঁইটের মধ্য দিয়ে আগার পাতায় আসে।

তৃতীয় ও চতুর্থ পাতা থেকে আগার পাতায় পৌছিবার পূর্বে বহু পোকা মারা যায়। পূর্ণবয়স্ক লার্ভা ২৫ মি.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়, ধূসর হলদে রঙের হয় যখন আখের চারার শাঁসে (শাঁষের) প্রথম কাচপাতাটা খেয়ে ফেলে তখন গাছ শুকিয়ে যেতে থাকে। ফলে মধ্যের প্রধান শিরাটা নষ্ট হয়ে যায় (dead heart)। প্রধান শিরা নষ্ট হয়ে গেলেও পরে পাশ থেকে পাতা গজাতে থাকে। গুচ্ছাকৃতি দিয়ে বড় হয়।

প্রতিরোধ—(১) সরু পাতলা জাল পাতার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে অনেকে সময় কীটগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

আখের তিন শত্রু—(১) শিকড় ভেদী, (২) কাণ্ড ভেদী ও (৩) পত্র ভেদী। এই তিনটির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে। এরা সকলেই সকর্মক থাকে এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। প্রাকৃতিক জলবায়ুর তারতম্য হিসাবে এদের জীবন দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ হলেও ৪৫-৬০ দিন এরা সবাই বাঁচে। এরা প্রত্যেকে কাণ্ডের মধ্যে গিয়ে বাসা নেয়। কেবলমাত্র লার্ভা অবস্থায়

প্রতিটি বিভিন্ন জাতের পোকার পোকাগুলিকে আখের কাণ্ডের উপর থাকে। অবশ্য অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আখের কাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

রাসায়নিক প্রতিবেধক—

০·৪—০·৫% বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড ৫ পা মাঠে ছড়িয়ে সুফল পাওয়া গেছে, কিম্বা ২৫% ডি. ডি. টি. ১০ পা. এক একব জমিতে ছড়িয়ে সুফল পাওয়া যায়।

কাট পোকা (Cut worm)—**এগ্রোটিস্ ইপসিলন**

এই পোকা সন্ধ্যেবেলা সাধাবণতঃ আলু গাছকে ঠিক মাটিব উপব থেকে এমনভাবে কেটে দেয যে ওপব থেকে দেখলে মনে হবে যেন কোন লোক কাঁচি দিয়ে গাছটাকে কেটে দিযেছে।

স্ত্রী-পোকা পাতাব উপরেই ডিম পাড়ে, ৭-৮ দিনেব মধ্যে ডিম থেকে লার্ভা বেবিযে আসে। পূর্ণ ভাসাটে মত লম্বা প্রায় ২″ লম্বা। এই লার্ভাই গাছ কেটে ফেলে সেজন্য একে বলা হয কাট পোকা। লার্ভা থেকে পিউপা বার হয মাটিব নীচে। ৭।৮ দিনেব মধ্যে তামাটে বঙ চলে যায এবং শক্ত ও বলবান হয়ে পড়ে। পিউপাতে কোন কোকুণ বা শক্ত খোলা থাকে না।

প্রতিষেধক—(১) ৪ পা: ৫০% সহজদ্রব D. D. T. ১০০ গ্যালন জলে মিশিযে দুই একব জমিতে ছড়াতে হবে।

(২) মাটি খুঁড়তে হবে এবং খুঁড়বাব সময যে পোকা পাওয়া যায সেগুলিকে যতটা সম্ভব মেবে ফেলতে হবে।

পাট

পাটের প্রধান শত্রু ৫টি—

(১) ঘোড়া পোকা—(Jute semilooper : Anomis sabulifera) বিভাগ—লেপিডেপটেবা পরিবাব, জিওমেট্রিডা। (২য ভাগ—২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(২) বিছাপোকা (Hairy Caterpillar : Diacrisia obliqua) বিভাগ—লেপিডেপটেরা পরিবার অর্কিডা। (২য় ভাগ—২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য.)

(৩) কেঁড়ি পোকা (Jute Weevil) বিভাগ—কলিওপটেরা পরিবার কারকুলিয়ামিডা।

(৪) রসচোষা পোকা (Jute Mite)—বিভাগ একারিনা।

(৫) কোতরি পোকা—লেপিডোপ পরিবার নকটুইডা।

এদের মধ্যে বাংলা, বিহার ও আসামের পাটে প্রতি বৎসর লেদাড়া পোকাই খুব বেশী পরিমাণে ক্ষতি করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শস্যের পাতা খেয়ে ফেলে।

রসচোষা পোকা (Jute mite)—এরা পাতার রস খেয়ে পাটের ক্ষেতে খুবই ক্ষতি করে। এরা দুই রকম। সাদা বা হলুদ রঙের, দেখতে খুব ছোট খালি চোখে দেখাই যায় না। এদেরকে বলে সাদা মাইট। আর এক রকমের আছে খুব ছোট লাল রঙের তাদেরকে বলে লাল মাইট। এদের মধ্যে সাদা মাইট ফসলের খুব ক্ষতি করে। সাধারণতঃ উঁচু জমির ফসলের। আর লাল মাইট ক্ষতি করে নীচু জমির ফসলের। পোকাগুলি আকারে খুব ছোট হওয়ায় খালি চোখে দেখা যায় না। তা বাদে এরা থাকে পাতার নীচের দিকে।

সাদা মাইট আগার কচি পাতার দুই দিকেই আক্রমণ করে। তবে নীচের দিকে বেশী। পাতার রস খেয়ে নেওয়ার ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়। প্রথমে গাঢ় সবুজ পরে তামাটে রঙের হয়ে পড়ে।

লাল মাইটও পাতার নীচের দিক থেকে আক্রমণ করে। প্রথমে পাতার উপর সাদা বা কাল রঙের ফুটকি দেখা যায়। পাতার নীচের দিকে এরা মাকড়সার জালের মত বড় জাল তৈরী করে। কখনও কখনও এই জাল দুটা বা তিনটা পাতা আটকে কুঁকড়ে বা দুমড়ে ফেলে।

গাছ বাড়তে পারে না—ফলে ডালপালা বার হয় ও ফলন কমে যায়।

প্রতিকার—১ ভাগ গন্ধকেব সহিত ৩ ভাগ চূণ ভালভাবে মিশিযে যন্ত্রযোগে গাছের উপর ছড়িযে দিতে হয়। প্রথমে স্প্রেযার দিযে ফসলেব উপর জল ছিটিযে দিযে তার পর এই গুঁড়া ছিটাতে হয। পোকাব গাযে লাগার সঙ্গে সঙ্গে পোকা মবে যাবে। তবে ছিটাবাব পব ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে যদি বৃষ্টি হয তবে আবাব ছিটাতে হবে।

খেতের পাশে যদি কোন বড় গাছ থাকে তাব ছাযায যে গাছ পড়বে সেই গাছে পোকা বেশী দেখা দেবে। এমন কি কোন আগাছা পর্যন্ত যেন না থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

বনমহোৎসব

(Van-Mohotsav and its significance)

উৎসব অর্থাৎ আনন্দের মধ্য দিয়ে অরণ্যকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলা। ইদানিং স্বাধীনতা লাভের পর গত কয়েক বৎসর সমারোহ করে বনমহোৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে। তবে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এর সুরু হয়েছিল তার অভাব দেখা যায় প্রতি পদক্ষেপে। আর এইটাই মানুষের ধর্ম। কিন্তু যে পরিমাণ কাঠ ও বনের আমাদের প্রয়োজন ছিল তার পূর্ণতা আজও পায়নি।

বনমহোৎসব আমাদের দেশে আজ নূতন নয়। সেই আদিমকালে যখন মানুষ প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে গাছ তাদেরকে আহার্য দেয় তখন থেকে আমাদের দেশে বৃক্ষপূজার প্রচলন হয়। কেবলমাত্র প্রথা প্রচলিত হয়ে তার সমাপ্তি হয়নি। আজও গ্রামে গ্রামে বৃক্ষপূজা দেখা যায়। তখন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার রীতি আছে। আধুনিক যুগেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার শান্তিনিকেতনে নূতন করে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রচলন করেন।

মানুষের সঙ্গে গাছের সম্বন্ধ অতি নিবিড়। সভ্যতার ঊষাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র গাছ দিয়ে আসছে। এর মধ্যে এসেছে রেশম, এসেছে নাইলন কিন্তু সুতীবস্ত্রকে হটিয়ে দিতে পারেনি। নিজেরাই হয়ত ঠোক্কর খেয়ে তলিয়ে গেছে কালের কোন অতলতলে কিম্বা কোন রকমে ঠাঁই করে দাঁড়িয়ে আছে নিজের অবস্থাটুকু বজায় রেখে।

এতো গেলো খাওয়া আর পরা, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় দুটি জিনিষ। এ বাদে মানুষের বাসস্থান গড়ে উঠেছে গাছের সহায়তায়। সহরের ইমারত

হওয়ায় আর গাছের প্রয়োজন নেই কারণ কৃত্রিমতায় গাছ হার মেনেছ কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের বাসগৃহ সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয় কাঠ দিয়ে। সহরকে বাদ দিলে দেখা যায় কাঠ বিনা ঘর তৈরী হয়নি। সহরের ঘরেও জানালা দরজার প্রয়োজন আছে। আজ এই জানালা দরজা তৈরী হয় গাছের কাঠ থেকে।

সভ্য মানুষ ফসল করতে শিখেছে, ঘর বাঁধতে শিখেছে কিন্তু সেই আদিকালে যখন প্রথম মানুষ চোখ খুলে দেখেছিল, যখন ঘর বাঁধতে জানতো না, যখন ফসল করতে শেখেনি তখন বৃক্ষ ছায়া আর সুপক্ক ফল জুগিয়েছে তাদেরকে, তাদের প্রযোজনীয় চাহিদা মিটিয়েছে। তারপর চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার দ্রব্যের রূপান্তর হয়েছে। পদার্থের রূপান্তর হলেও তাদের উপাদান রয়ে গেছে এক।

এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় কাঠ, কিছু না হোক সকালে উঠে রান্না করার জন্য অন্ততঃ কাঠের প্রয়োজন। একদিন ছিল যখন সারা দেশটা বনে ভর্তি। মানুষের প্রয়োজনে তারা গাছ কেটেছে, ফসল তৈরী করছে, ভূমির সংস্কার করেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে, বাড়ছে, আরও ভবিষ্যতে বাড়বে। এখন সামান্য যেটুকু বন অবশিষ্ট আছে সেটুকু বোধকরি আর থাকবে না।

আজও এই যন্ত্রযুগেও গাছের প্রয়োজন যে কমেছে এমন মনে হয় না, কেবল রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। আজও দেখা যায় ভারতের পূর্বাঞ্চলে সেই চীন সীমান্ত থেকে মধ্য-ভারত দণ্ডকারণ্যেই হোক, ক্ষেতে ভাল ফসল হলে খেতোয়াল ক্ষেতের পূজা করতে গিয়ে তারা বৃক্ষপূজা করে। ভারতীয় হিন্দুর বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুর কাছে বৃক্ষপূজা নূতন নয়। তুলসী মঞ্চ তো তুলসী গাছকে উপলক্ষ্য করেই। এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে হিন্দুর objective দৃষ্টিভঙ্গি যাই থাক গাছকে তারা পরোক্ষভাবে পূজা করেছে সে কথা সর্বজনবিদিত।

পণ্ডিতেরা বলেন যেখানে অরণ্য বেশী অর্থাৎ যেখানে ঘন নিবিড় বন সেখানে বৃষ্টি বেশী হয়। বৃষ্টি হওয়ার জন্য নিবিড় বন হোক কি বনের জন্য

অত্যধিক বৃদ্ধি হোক, আমরা দেখতে পাই আফ্রিকার জঙ্গলে, আমাজান নদীর অববাহিকায় নিবিড় জঙ্গলে এমন কি ভারতে যেখানে ঘন নিবিড় বন আছে সেখানে বেশী বৃষ্টি হয়। দেখা গেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য গাছ যে CO_2 ব্যবহার করে তারই সহযোগে ঘন মেঘে বৃষ্টিপাত করে। যাই হোক ঐজন্য যদি বৃষ্টি হয় তো হোক, আমরা দেখি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী।

দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে বন আমাদের নিবিড় করে ধরে রেখেছে। জীবনে কৃত্রিমতা আসার সাথে তাদের পরোক্ষ কাজ শেষ হয়নি। কিন্তু তার ছায়ায় বসে গরমের দিনে আরাম উপভোগ করা সহরে নিতান্ত দুর্লভ। এই বনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে বন-মহোৎসব সুরু হয়েছিল।

অরণ্য জাতীয় সম্পদ—বিজ্ঞানীরা বলেন, কোন দেশের উন্নতির জন্য, তার অধিবাসীদের সর্ববিধ কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য দেশের অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ জমি অরণ্যের কবলে রাখা উচিত।

আমাদের দেশ বন কাটতে কাটতে তার অস্তিত্ব প্রায় শেষ করে এনেছে। শতকরা ১১% জমিতে মাত্র বন আছে। তাও যা আছে সেটা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবার নূতন করে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় মৃত্তিকা সংরক্ষণ করবার প্রধান উপায় মাঠের উপর বা জমিতে গাছ লাগিয়ে রাখা। এরা দুই দিক থেকে সাহায্য করবে। প্রথমতঃ, বৃষ্টিবিন্দু সোজাসুজি উপর থেকে এসে মাটিকে আঘাত করতে দেবে না। সুতরাং এই আঘাতে যে জমির মাটি স্থানচ্যুত হয়ে জলের ধারার সঙ্গে মাঠ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত সেটা সম্ভব হয় না। কারণ গাছের পাতায় আঘাত পেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাত্র অল্প উপর থেকে যখন জমিতে এসে পড়বে তখন আর কোন শক্তিই থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ, গাছ শিকড় দিয়ে মাটিকে আটকে রাখবে। এর ফলেও মৃত্তিকা ক্ষয় পরিমাণে হবে খুব কম।

পরোক্ষভাবে গাছের দ্বারা মানুষের বহু উপকার সাধিত হওয়ায় দেশের সরকার মনে করলেন জাতির উন্নতির জন্য বনমহোৎসবের বিশেষ প্রয়োজন। ঠিক বর্ষার সুরু হয়ে যাওয়ার পরে যখন নানাপ্রকার কলম ও চারা পাওয়া যাবে তখন এই উৎসব করে মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনমত ফলের গাছ, ফুলের গাছ বা রাস্তার ধারে কোন ফলদ্রুম পুঁতে উৎসব শেষ করেছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা বেড়া করে দিয়ে নিজেদের কর্তব্য সেরেছে।

আজও বনমহোৎসব হয়। বনবিভাগ সমস্ত জিলার অধিকর্তা মারফৎ সাধারণের মধ্যে গাছের চারা বিক্রী করে বা বিতরণ করে সাধারণ মানুষকে বনপ্রেমিক হতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ জুলাই মাসের প্রথমের দিকে কোন বিশেষ দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলে। কারণ এই সময়ে আমাদের দেশে বর্ষা সুরু হয়। বর্ষার সুরুতে গাছ রোপণ করার বিশেষ সুবিধা আছে। মানুষ সভা করে বনের দানকে স্বীকার করে আর যাতে দেশে এই বৃক্ষসম্পদ বাড়ে তার জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় ফলের গাছ বাড়ীর আশেপাশে পুঁতে দিলে ক্রমে ক্রমে ফল ধরবে। নিজের প্রয়োজনের চাহিদা মিটিয়ে দরকার হলে বিক্রী করে কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। আর সবার শেষে গাছ মরে গেলে তার থেকে যে কাঠ পাওয়া যাবে তা দিয়ে পোড়ানো কাঠের সাহায্য হবে।

পরিশিষ্ট

নাইট্রোজেন শিল্প

আমাদের এই বিশাল পৃথিবী তার বস্তুসম্ভার নিয়ে আপন কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। বস্তুময় এই পৃথিবী, কোথাও এর শূন্য নয়; অথচ এই বস্তু ভাঙ্গছে আবার গড়ছে। ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরমাণুকে ভাঙ্গলে যে শক্তি উদ্গীর্ণ হয় তার প্রভাবে পৃথিবীর একাংশ খসে পড়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু মানুষের এই যে জ্ঞান একদিনে সে লাভ করেনি। দিনের পর দিন বিজ্ঞানী সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেন।

একদিন ছিল যখন মানুষ পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে জানতো না। একে একে তারা সব জিনিষ লক্ষ্য করে প্রত্যেকটিকে নাম দিয়েছেন। সভ্যতার বিবর্তনে বোধ হয় একটা নূতন অধ্যায় সুরু হয়েছিল, যেদিন মানুষ প্রথমে জানতে পারলো পৃথিবীতে নাইট্রোজেন নামে একটি বায়বীয় পদার্থ আছে। আর পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ এই বাষ্প দিয়ে ভর্তি। বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস ও ডেভী এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। বোধ করি ১৮০১ খৃঃ ক্যাভেণ্ডিস প্রথম যেদিন সবাইকে এই বাষ্পের অবস্থিতি জানান সেদিন মানুষ শুনেই ক্ষান্ত হয়েছিল। পথ চলতে হয়ত বন্ধু-বান্ধব গল্প করেছিল এই নূতন আবিষ্কার নিয়ে, কিন্তু সেদিনের মানুষ জানতো না যে এর পিছনে কি শক্তি লুকিয়ে আছে।

১৮৮৫—১৮৯৬ খৃঃ লর্ড র‍্যালে একে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরী করতে চেয়েছিলেন। হয়েও ছিল কিন্তু স্থায়ী হয় নি।

ক্রমে ক্রমে মানুষ জানতে পারলো এর বিধ্বংসী শক্তি। পৃথিবীতে এমন একটি সময়ে এই নিয়ে কাজ সুরু হয়েছিল যখন পশ্চিম ইউরোপের শক্তিগোষ্ঠী একে অন্যের ধ্বংসের জন্যে ব্যাপৃত। তখন আর নাইট্রোজেন কেবলমাত্র বাষ্প নয়, নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রিক অম্ল তৈরী হয়, আর তার থেকে তৈরী হয় নাইট্রো গ্লিসারিণ, ট্রাই নাইট্রো টলুয়িন ও পিক্রিক অম্ল। এই সমস্ত পদার্থের ধ্বংস করবার শক্তি খুব বেশী। দেখা গেল যে-দেশ এইগুলি বেশী করে তৈরী করতে পারছে তারা শক্তির গর্বে মাটিতে আর পা ফেলে না।

সবাই আপন মনে কাজ করে চলেছে, কেমন করে আকাশ থেকে নাইট্রোজেন টেনে এনে নূতন নূতন বিধ্বংসী রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ তৈরী করা যায়। এলো পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমর। জার্মানী প্রমাদ গণলো, কারণ তার যে নাইট্রিক এসিড আছে তা পর্যাপ্ত নয়। এতদিন ধরে যেটা ছিল কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আজ সেটা হয়ে উঠলো জাতির মরা-বাঁচার উপায়স্বরূপ। এই সময়ে হেবার আবিষ্কার করলেন কেমন করে বাতাস থেকে N_2 আর জল থেকে H_2 মিলিয়ে NH_3 তৈরী করা যায়। সেদিনের সেই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল নাইট্রিক এসিড তৈরী করে নিয়ে কোন বিধ্বংসী রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করা। কিন্তু সেদিন সাধারণ জীবনে এর প্রয়োজন যে এত বেশী হবে সে সম্বন্ধে তখন বোধ হয় কেউই ভাবে নি। আজ এই হেবার পদ্ধতি হয়ে উঠেছে নাইট্রোজেনের একমাত্র উৎস। একে বাদ দিলে বোধ হয় আজকালকার শিল্পের অনেকটা বাদ পড়ে যায়।

হেবার পদ্ধতি বাদেও অন্যান্য ২টি পদ্ধতি আছে কিন্তু তাদিয়ে শক্তির অপচয় হয়।

(১) হেবার পদ্ধতি, (২) সিয়ানামাইড পদ্ধতি ও (৩) বার্কল্যাণ্ড আইড পদ্ধতি।

প্রায় সমসাময়িক বার্কল্যাণ্ড আইড নরওয়ে-সুইডেন দেশে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টানার একটা পদ্ধতি বার করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শক্তির অপচয় হয় খুব বেশী। শতকরা মাত্র ৫ ভাগ শক্তি কাজে লাগে কিন্তু হেবার পদ্ধতিতে শতকরা ৮৫ ভাগের উপর শক্তি কাজে লাগান যায়। তাই হেবার পদ্ধতি কেবলমাত্র সেই দিনে নয় আজও নাইট্রোজেন কাজে লাগানোর শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বর্ণিত হয়।

হেবারকে সাহায্য করেছিল একটি জার্মান শিল্পপ্রতিষ্ঠান তার নাম Bosch। তারই চেষ্টায় হেবার তার আবিষ্কার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীর জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। অন্য দেশে বাড়ুক আর না বাড়ুক ভারতে জনসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে সমস্ত জনসংখ্যার $\frac{1}{50}$ ভাগ বেড়ে চলেছে। আজ পৃথিবীর লোকসংখ্যা কম বেশী ২৮৮৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৮৮'৫ কোটি। এদের খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ১২০০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য। এই সমস্ত খাদ্যে আছে ২৫ মিলিযন টন নাইট্রোজেন।

গাছের বৃদ্ধির জন্য মাটি থেকে যে পরিমাণ N_2 পাওযা যায় তার পরিমাণ ৭ মিলিযন টন, নডুল বীজাণুর মাধ্যমে পাওযা যায ৫ মিলিযন টন আর বৃষ্টি ও বজ্রপাত আকাশ থেকে টেনে আনে ৩ মিলিযন টন। মোট ১৫ মিলিযন টন N_2 পাওযা যেতে পারে। কিন্তু এখনও আমাদের ঘাটতি রয়ে গেছে ১০ মিলিযন টন নাইট্রোজেন। এই ঘাটতি মিটাবাব একমাত্র উপায় শূন্য থেকে N_2 টেনে এনে রাসাযনিক প্রথায মাটিতে কোন সার যোগ করে এই ঘাটতি মেটানো।

সারা পাশ্চাত্ত্য দেশে ৭ মিলিযন টন নাইট্রোজেন শূন্য থেকে টেনে নিয়ে এসে মাটির কাজে লাগানো হয। আব আমাদের ভারতবর্ষে মাত্র ০'২৮ মিলিযন টন। সুতরাং আমাদের দেশে যত এই শিল্পের প্রসার হয ততই ভাল।

এমোনিযা মাটিতে পড়ে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে তৈবী করে এমোনিযাম কার্বনেট $(NH_4)_2CO_3$। জিপসাম্ মিশালে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে পারে। এমোনিযাম কার্বনেটকে উচ্চ চাপের ক্রিযায ইউরিযা তৈরী করা যায়।

$(NH_4)_2CO_3 + 2NaNO_3 =$ নানা প্রক্রিযায ভেঙ্গে তৈরী হয

$N_2 + H_2O + 718$ কিলো ক্যালোরি উত্তাপ।

এর মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র N_2 গাছ নিতে পারে। খাদ্যের মধ্যে থাকে ঘনীভূত গ্লুকোজ। এর থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়।

$$C_6H_{12}O_6 = 6CO_2 + 6H_2O + 676 \text{ কিলো ক্যালোরি।}$$

এই যে শক্তি বাহির হয় এই শক্তি মাটিতে N_2 গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

(কৃষি রসায়ন)

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১। বাযু কি মিশ্র বাসাযনিক পদার্থ? বাযুতে কি কি উপাদান আছে? প্রমাণ কব যে, বাযুতে ৭৭ নাইট্রোজেন আছে।

২। পবীক্ষাগারে নাইট্রোজেন তৈবী-পদ্ধতি বর্ণনা কব। নাইট্রোজেনেব ভৌতিক গুণ ও ধর্ম বর্ণনা কব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। যন্ত্রযোগে এমোনিযা প্রস্তুতকবণ বর্ণনা কব। এব প্রযোজনীযতা কি কি? এবং ব্যবস্থাব বর্ণনা কব।

২। নিম্নলিখিত বিষযগুলিব সংক্ষিপ্ত বিববণ দাও:—

(ক) এমোনিযাম ক্লোবাইড, (খ) এমোনিযাম নাইট্রেট, (গ) এমোনিযাম সালফেট নাইট্রেট।

৩। নাইট্রোজেন শিল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। নাইট্রোজেন চক্রেব বিশদ বিববণ দাও।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১। গাছেব প্রধান খাদ্য কি কি? এদেব মধ্যে কোন্‌গুলি প্রধান ও কোন্‌গুলি অপ্রধান।

২। নাইট্রোজেন কি? কৃষিতে কত বকমেব নাইট্রোজেন আছে এবং কিভাবে ব্যবহাব হয? শেষ পর্যন্ত মাটিতে নাইট্রোজেন কি অবস্থায় পর্যবসিত হয়।

৩। মাটিতে সার প্রয়োগের কারণ কি? মাটিতে সার দিলে ভাল ফসল হয় কেন? দ্বিবিধ উপায় কি (diversified farming)? বীজের খইলে কি পরিমাণ N_2 থাকে? এমোনিয়াম সালফেটের সুবিধা কি? কোন্ সময়ে ক্যালসিয়াম ছায়নামাইড দেওয়া উচিত?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:—

(ক) ব্যাকটেরিয়া, (খ) প্রোটোজোয়া, (গ) এলগি, (ঘ) ফাঙ্গাস।

২। কেমন করে মাটিতে N_2 রূপান্তরিত হয়। সিমবায়োটিক ও নন-সিমবায়োটিক পদ্ধতি কাকে বলে? নডুল বীজাণু কেমনে মাটিকে উর্বরা করে তার বিশদ বিবরণ লিখ।

৩। গাছের বৃদ্ধিতে বীজাণুর স্থান কোথায়? মাটিতে বীজাণুর কাজ কি কি?

তৃতীয় অধ্যায়

১। কেমন করে গোরুর গোবর ও গোমূত্র থেকে আমরা সার পেতে পারি বর্ণনা কর। এই থেকে তৈরী সারে গাছের কি কি খাদ্য থাকে?

২। কমপোষ্ট বলতে আমরা কি বুঝি? কেমন করে কমপোষ্ট তৈরী করতে হয়। কোন নগরের জনসংখ্যা ৪০,০০০ মানুষের মলমূত্র থেকে কমপোষ্ট তৈরী করবার একটি প্ল্যান দাও। activated sludge কি?

৩। সবুজ সার বলতে কি বুঝা যায়? এর উৎপাদনে কি কি দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজন? সবুজ সারের উপকারিতা কি? সবুজ সার হিসাবে ধনচা ও সানহেম্পের পার্থক্য দেখাও।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১। PH কি? মাটির pH কিসের উপর নির্ভর করে? মাটিতে অম্লতা বলতে আমরা কি বুঝি তার বিশদ বর্ণনা দাও। কেমন করে মাটির অম্লতা দূর করা যায়। এক একর কাঁকুরে মাটির জমিতে pH নিরপেক্ষ রেখায় আনতে কতটা চুণের প্রয়োজন।

২। কি কি কারণে গাছের ক্যালসিয়াম প্রয়োজন? ক্যালসিয়াম অভাবে গাছের কি রোগ হয়, তার চিহ্ন কি কি?

৩। কোন্ অম্ল মাটিতে কি গাছ জন্মায়? Hydrated lime কাকে বলে? মাটিতে কখন চুণ যোগ করতে হয়? আর কেমন করে ক্ষার মাটিকে নিরপেক্ষ রেখায় আনা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। লোনা মাটি বলতে আমরা কি বুঝি? কেমন করে লোনা মাটির সৃষ্টি হয়েছে? আমাদের দেশে সুন্দরবনের লোনা মাটির সৃষ্টির কারণ কি কি?

২। কেমন করে লোনা মাটিকে সফল করে তুলতে হয় তার বিশদ বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। কলিকাতায় পূর্ববর্তী লবণ হ্রদ অঞ্চল যে উপায়ে উদ্ধার করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা কর।

২। পীট মাটি সম্বন্ধে কি জান?

৩। কেমন করে মাটির লবণত্ব এড়ান যায়।

(জৈব রসায়ন)

প্রথম খণ্ড

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

১। কাণ্ড কাহাকে বলে? কাণ্ডের কাজ কি কি? মুকুল কি কাণ্ড? মুকুলের রূপান্তর বলতে কি বুঝায়? রূপান্তরিত কাণ্ডের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। একটি আদর্শ পত্রের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। আলোক সংশ্লেষ বলতে কি বুঝায়?

৩। পত্রের বিশেষ কার্য কি? রূপান্তরিত পত্রের কাজের সঙ্গে সাধারণ পত্রের তফাৎ আছে কি? সংক্ষেপে পত্রের বিশেষ কার্যের বিবরণ দাও।

৪। অভিস্রবন (osmosis) বলতে আমরা কি বুঝি?

৫। বাষ্পমোচন ও বাষ্পীভবন-এর মধ্যে তফাৎ কি?

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়

১। সম্পূর্ণ ফুল কাহাকে বলে? অসম্পূর্ণ ফুলের সহিত এর কি কি পার্থক্য আছে? উভলিঙ্গ (Hermophrodite) ফুল কাহাকে বলে?

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর :—

(ক) উদম্বর (Hypanthodium), (খ) স্বপরাগযোগ, (গ) বিপরীত পরাগযোগ, (ঘ) গর্ভাধান।

৩। পরাগযোগের বাহক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর। স্বপরাগযোগ ও বিপরীত পরাগযোগ-এর মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে বিশদরূপে বুঝাইয়া দাও।

৪। ফল কি? ফলের কি কি কাজ? এক-বীজপত্রী ও দ্বি-বীজ-পত্রী বীজের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে?

পঞ্চম অধ্যায়

১। অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাহাকে বলে? এর কাজ কি? বিভিন্ন অংশের বিবরণ লিখ।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর :—

(ক) কোষ, (খ) প্রোটোপ্লাজম, (গ) প্লাসটিড ও (ঘ) কোষপ্রাচীর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। মৃত্তিকা সৃষ্টিতে কেঁচোর কাজ কি কি? এর উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা লিখ।

২। ভেটকি বা অন্য যে কোন একটি মাছের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

৩। এনোফিলিস ও কিউলেক্স মশার মধ্যে কি কি তফাৎ আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১। গাছ কেমন করে জল গ্রহণ করে বর্ণনা কর।

২। গাছের জীবনে জলের প্রয়োজন কিসের জন্য?

৩। গাছের গঠন ও ক্ষয়সাধন আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। অঙ্গার আত্তীকরণ কাহাকে বলে? এর জন্য কি কি পদার্থের দরকার? বিশদ বর্ণনা কর।

২। অঙ্গার আত্তীকরণ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কি কি? ভালভাবে বুঝাইয়া দাও।

৩। প্রমাণ কর যে, গাছের গতি ও বৃদ্ধি আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

১। গম ও ধান কি একই জাতীয় ফসল? এদের মধ্যে তফাৎ কি? ধানের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

২। ম্যালভেসী জাতীয় ফসল আমাদের দেশের এই অঞ্চলে পাওয়া যায় কি না? যেটি পাওয়া যায় তার বর্ণনা কর।

৩। সরিষা কোন জাতীয় ফসল? তার বিশদ বর্ণনা কর?

চতুর্থ অধ্যায়

১। সাধারণতঃ কয় রকমের কীট দেখা যায়। তাদের মাথা, বুক ইত্যাদির বিষয় বর্ণনা কর।

২। ক্ষেতের কীট-পতঙ্গ নিবারণের উপায় কি কি? তার মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ উপকারী? তার বিশদ বর্ণনা কর।

৩। লাক্ষা পোকার কাছ থেকে আমরা কি কি পেতে পারি? প্রজাপতির বহিরাবরণ বর্ণনা কর। কীট-পতঙ্গ মাটির উন্নতি করে কি? রেশম কীটের জীবনেতিহাস বর্ণনা কর।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১। গাছের জীবনে ক্রোমোজোম যে অংশ গ্রহণ করে তার বিশদ আলোচনা কর। বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ক্রোমোজোম সংখ্যা কি করে তার সন্তান-সন্ততির মধ্যে অংশ সন্নিবেশ করে তার বিবরণ লিখ।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর :—

(ক) সাইটোপ্লাজম, (খ) নিউক্লিয়াস, (গ) প্লাজমা মেমব্রেন ও (ঘ) নিউক্লিয়ালোজ।

৩। মিটোসিস ও মাইয়োসিস্‌ পদ্ধতি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বিবর্তনবাদ ও বংশধারা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। ডারউইনের মত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। মেণ্ডেল সূত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। আমাদের দেশে ধানের কি কি রোগ দেখা যায়? তাদের মধ্যে কি কি প্রধান? ধানের ধূসর রোগ (brown spot)-এর যে চিহ্নগুলি ফুটে উঠে তার বিবরণ লিখ। কেমন করে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

২। নিম্নলিখিত রোগগুলির চিহ্ন কোথায় ফুটে উঠে এবং তার প্রতিষেধক কি কি?

(ক) আখের লাল-দাগ রোগ, (খ) আলুর ব্লাইট রোগ।

৩। রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়?

1960

AGRICULTURAL CHEMISTRY AND AGRICULTURAL BIOLOGY

(Agriculture Group)

FIRST PAPER

Agricultural Chemistry (Theoretical)

1. Describe the method of manufacturing ammonium sulphate industrially. Mention the different inorganic nitrogenous fertilizers which are used in our country.

2. Write short notes on any *five* of the following :

(*a*) Farm yard manure ; (*b*) Clay ; (*c*) Black cotton soil ; (*d*) Alluvial soil ; (*e*) Superphosphate ; (*f*) Green manuring ; (*g*) Azotobacter ; (*h*) Algae ; (*i*) Alkali soil.

3. What are the major elements on which the nutrition of a crop depends ? Mention briefly the role of any *three* of them in plant nutrition.

4. Write what you know of nitrogen cycle.

5. What are the different natural processes by which a soil may be enriched in nitrogen ?

6. What is soil ? Describe how a soil is formed in nature.

7. What type of manure will you choose for growing a crop in a soil which is poor in nitrogen and organic matter ? Give reasons for your answer.

AGRICULTURAL CHEMISTRY AND AGRICULTURAL BIOLOGY

(Agriculture Group)

SECOND PAPER

Agricultural Biology (Theoretical)

Group A

1. State in short the conditions required for the germination of a seed. Describe an experiment by which you can demonstrate the required conditions.

2 State the distinction between Photosynthesis and Respiration

3. Describe the plant characters of a garden crop belonging to the Family, Cucurbitaceae or Malvaceae.

4 Give a short account of the jute plant disease. *Macrophomina Phaseoli* popularly called the stem rot of jute.

Group B

5. Describe the external characters of a Bhetki fish or any other fish you have studied

6. Describe in brief the life history of the paddy stem borer, *Schoenobius incertulas*

7. Write what you know about Mendel's laws of inheritance

8. Write short notes on any *two* of the following :

(*i*) Distinction between Culex and Anopheles.

(*ii*) Mode of damage and control of the jute insect pest, ***Anomis sabulifera.***

(*iii*) Heredity.

(*iv*) Mode of damage and control of the paddy insect pest, ***Hispa armigera.***

GENERAL AGRICULTURE INCLUDING SOIL MANAGEMENT AND CROP CULTURE

(Agriculture Group)

FIRST PAPER (THEORY)

1. Describe the most important climatic factors for the successful growth of rice, jute, sugarcane and wheat.

2. Give a comparative account of the physical properties of sand and clay.

3. Define 'soil fertility'. Discuss the factors contributing to soil fertility.

4. Give a brief account of the importance of soil organic matter in crop production.

5. Make a list of the implements commonly used by farmers of West Bengal for cultivation of Aus paddy. Describe in short the functions of each implement.

6. Discuss the effects of the three most important plant nutrients on growth of crop.

7. Write short notes on any *two* of the following :

(*a*) Compost manure.

(*b*) Farm yard manure.

(*c*) Green manure.

(*d*) Gootie making.

(*e*) Seed testing.

GENERAL AGRICULTURE INCLUDING SOIL MANAGEMENT AND CROP CULTURE

(Agriculture Group)

SECOND PAPER (THEORY)

1 What do you understand by 'tillage'? What are its objectives?

2. Name the different methods of sowing seeds. Discuss their relative advantages and disadvantages

3. What are the irrigation appliances commonly used in West Bengal? Prepare a table showing their lift, discharge per hour and labour requirement for operation.

4 Describe in brief the improved method of cultivation of jute.

5. What do you understand by 'crop rotation'? Enumerate the advantages of a well planned crop rotation.

6. Describe the steps you would recommend for ensuring a good yield of Amon paddy.

7. Write what you know about weeds and their control.